‘‘টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি’’

(SOCIETY & CULTURE OF TANGAIL DISTRICT)

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ আল-আমীন পলাশ
রেজি নং-২০১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০১৯

‘‘টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি’’

(SOCIETY & CULTURE OF TANGAIL DISTRICT)

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ আল-আমীন পলাশ

রেজি নং-২০১

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-১৬

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০১৯

প্রত্যয়ন পত্র

আমি সানন্দে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের গবেষক মোঃ আল-আমীন পলাশ কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির উদ্দেশ্যে দাখিলকৃত ‘‘টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি’’ (SOCIETY AND CULTURE OF TANGAIL DISTRICT) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তার সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আমি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং তার এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জমা প্রদানের সুপারিশ করছি।

জুলাই, ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি" (SOCIETY AND CULTURE OF TANGAIL DISTRICT) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার একক ও নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমি যতদূর জানি এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন একক ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

বিনীত

জুলাই, ২০১৯

গবেষক
মোঃ আল-আমীন পলাশ
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং - ২০১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে, যাঁর অশেষ কৃপায় আমার পক্ষে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী, যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, একান্ত অনুপ্রেরণায় ও স্নেহ মিশ্রিত তাগিদেই আজকের এ গবেষণা কর্ম। দেশে-বিদেশে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণাকর্মে সময় প্রদানে তিনি ছিলেন হৃষ্টচিত্ত একনিষ্ঠ। গবেষণাকর্মের নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে তিনি যেভাবে বারংবার তাগিদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং সাহস যুগিয়েছেন তা বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সহজতর করেছে। তাঁর ঋণ অশোধ্য। আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক স্যারের সহধর্মিনী জনাব আরিফা রহমান এর প্রতি। গবেষণা কাজে স্যারের বাসায় সময়ে অসময়ে যাতায়াতের ফলে যিনি আমাকে তাঁর পরিবারের একজন মনে করতেন। তাঁর অবিরত সহযোগিতায় আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার এ গবেষণার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রায় সকল শিক্ষকই অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ড. মো: ইব্রাহিম, অধ্যাপক মো: মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো: মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া, অধ্যাপক মো: আতাউর রহমান বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক ড. মো: সিদ্দিকুর রহমান খান, সহযোগী অধ্যাপক ড. নুসরাত ফাতেমা, সহযোগী অধ্যাপক জনাব এস এম মফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক নুরুল আমীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

বিভাগীয় শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলী ছাড়াও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

সাইদুর রহমান প্রামানিক, সহকারী অধ্যাপক, বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, মোঃ শাহিন মিয়া, প্রভাষক, বি এ এফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, শেখ মোঃ আঃ জলিল, সাবেক প্রধান শিক্ষক, মধুপুর রাণী ভবানী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ ওসমান গনি, প্রধান শিক্ষক, পচিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ, মোঃ ফরিদ উদ্দিন আক্তার, প্রভাষক, হাদিরা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, মোঃ আনোয়ার হোসাইন, প্রভাষক, স্কলার্স কলেজ এবং মুহাম্মদ মাছুদুর রহমান, (বিএ অনার্স, এমএ, এমফিল, ঢা. বি.) প্রিন্সিপ্যাল অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, যারা আমাকে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, বই, এবং নানা রকম তথ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। তাদের জন্যই আমি এ গবেষণাকর্মটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমি তাদের নিকট দ্বিধাহীন চিত্তে চিরকৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরি (সুফিয়া কামাল গন গ্রন্থাগার, শাহবাগ, ঢাকা) এশিয়াটিক সোসাইটিক গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভস, টাংগাইল পাবলিক লাইব্রেরি, জেলা পরিষদ গ্রন্থাগার, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার (ঢাকা) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশবিদ্যালয় সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়া টাংগাইল জেলা শহর এবং বাইরের শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, সাংবাদিক, উকিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ আমাকে গবেষণার কাজে নানা পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু মহলকে। তাদের মধ্যে বন্ধুবর জনাব আতিকুর রহমান এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করছি। তার কাছে আমি চিরঋণী। এছাড়া বন্ধু বিশিষ্ট সাংবাদিক এইচ এম নুরে আলম (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি), মোঃ মফিজুর রহমান (গ্যাস কোম্পানীতে চাকরিরত), ইয়ামিন রহমান (প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাসি ও সংস্কৃতি), ফারুক আহম্মেদ (প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান)।

এছাড়া আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার বাল্যবন্ধু মোঃ মিজানুর রহমান সুমনের প্রতি।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের সহপাঠী জনাব ওমর ফারুক, গিয়াস উদ্দিন, সালাউদ্দিন রাজু, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, সোনিয়া, শবনম, শশী, লাবিবা, চম্পা, ইতি, শামীম, শিশির, রুবেল, শাহেদ (অকাল প্রয়াত), রুহুল আমীন, রানা, মিজু সহ অন্যান্য বন্ধুদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা।

এছাড়াও গবেষণার কাজে যারা সাহায্য করেছেন, মোঃ সুমন হোসাইন তারেক, মমিনুল ইসলাম ডালিম, আরমান হোসেন, মিলন, রায়হান, ইমন, বিপ্লব, সজিব, সুজন, শিমা, মমিন, দ্বিবেশ, মাসুদ, কাউছার, দোলা, রাশেদ, মাসুদ, আঃ রহিম, জামান, রাকিব, ইমরান, রাহাদ, সোহাগ, রাশেদ, আরিফ, জাহিদ, সনি, রুমি, প্রিন্স, তুষারসহ আরো অনেকে যাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব আব্দুস সোহবাহান, আমার স্নেহময়ী মাতা সেলিনা বেগম ওরফে রিনার প্রতি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার একমাত্র বোন শারমিন আক্তার পাপড়ির প্রতি। আমার বড় মামা মিজানুর রহমান, মেঝ মামা মনির হোসেন এবং ছোট মামা শাহ আলমের প্রতি। কৃতজ্ঞতা রইল আমার বড় খালা আমেনা বেগম ও ছোট খালা আল্পনা খাতুনের প্রতি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বড় চাচা আঃ জুব্বার এবং ছোট চাচা সুরুজ আলীর প্রতি। চাচাতো ভাই মুজিবুর, জাহিদুল, চাচাতো বোন সাবিনা ইয়াসমিন, শিল্পী, মামাতো বোন বিয়া, সিনথিয়া, মামাতো ভাই তাজবীর, তানভীর, সোহাগ, শামীম, সিহাব, সিফাত ও রকি'র প্রতি।

আমি তাদের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। পরিবারের অন্য সবার সহযোগিতাও স্মরণ করছি। আমি তাদের সাফল্যময় জীবন কামনা করছি।

জুলাই, ২০১৯

মোঃ আল-আমীন পলাশ
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং - ২০১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

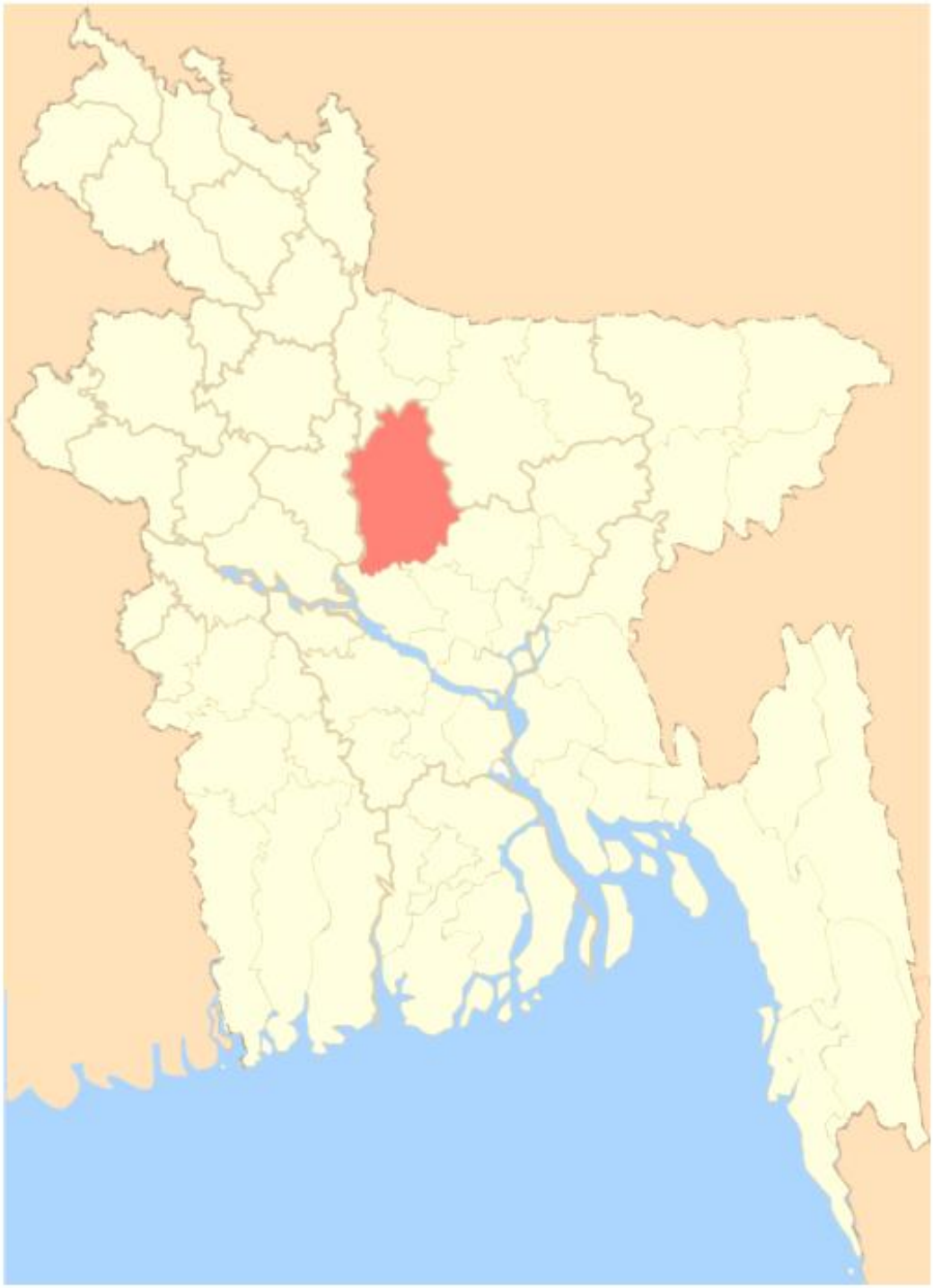

টাংগাইল জেলার মানচিত্র-১

সূত্রঃ www.Tangail.bd.com.

Dhaka University Institutional Repository

টাংগাইল জেলার মানচিত্র-২

সূত্রঃ www.Tangail.bd.com.

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	i
ঘোষণা পত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii-v
মানচিত্র ১, ২	vi-vii
সূচিপত্র	viii-x

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা

১.১ ভূমিকা	১
১.২ টাংগাইল জেলা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট	৩
১.৩ অধ্যায় বিশ্লেষণ	৫
১.৪ সমাজ	৬
১.৫ সামাজিক স্তর বিন্যাস	৮
১.৬ সংস্কৃতি	১০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ টাংগাইল জেলার ভূ-প্রকৃতি, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইতিহাস

২.১ জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভৌগোলিক অবস্থান	১৫
২.২ জেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী	১৮
২.৩ টাংগাইল জেলার নদ-নদী	৩০
২.৪ বনভূমি	৩৩
২.৫ দর্শনীয় স্থান	৩৪
২.৬ মুক্তিযুদ্ধে টাংগাইল	৩৮
২.৭ উপজেলার বিবরণ	৪০
২.৮ আদিবাসীদের পরিচয়	৪৮
২.৯ জেলার নামকরণের ইতিহাস	৫০
২.১০ টাংগাইল জেলা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও গঠন প্রণালী	৫২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: সমাজ

৩.১ অধিবাসীদের পরিচয় ৫৬
৩.২ টাংগাইলের গারো সম্প্রদায় ৫৭
৩.৩ বাসগৃহ ৫৯
৩.৪ খাদ্যাভাস ৬১
৩.৫ পোশাক-পরিচ্ছদ ৬৭
৩.৬ অলংকার ৭০
৩.৭ প্রসাধনী ৭২
৩.৮ সামাজিক উৎসব ৭৪

চতুর্থ অধ্যায়: সংস্কৃতি

৪.১ ভাষা ও সাহিত্য ৮৬
৪.২ টাংগাইল জেলার আঞ্চলিক ভাষা ৮৮
৪.৩ ভাষার পার্থক্য ৯০
৪.৪ আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন ৯৫
৪.৫ সাহিত্য ১০১
৪.৬ টাংগাইল জেলার সাহিত্যের ইতিহাস ১০৩
৪.৭ মৃৎ শিল্প ১০৯
৪.৮ লোকশিল্প ১১১
৪.৯ স্থাপত্য ১১৪
৪.১০ লোক প্রযুক্তি ১২১
৪.১১ পেশাজীবী শ্রেণি ১২৮
৪.১২ লোকক্রীড়া ১৩১
৪.১৩ লোকগীতি ১৩৯
৪.১৪ লোকবাদ্যযন্ত্র ১৫৪
৪.১৫ বিখ্যাত গায়ক ও কবিয়ালদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৫৫
৪.১৬ সংবাদপত্র ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ঃ টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা

৫.১ টাংগাইল জেলার শিক্ষার প্রেক্ষাপট ১৭০

৫.২ টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ১৭০

৫.৩ প্রাথমিক শিক্ষা ১৭১

৫.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা ১৭৩

৫.৫ উচ্চ শিক্ষা ১৮১

৫.৬ নারী শিক্ষা ১৮৯

৫.৭ মাদরাসা শিক্ষা ১৯৪

৫.৮ বিশেষ শিক্ষা ১৯৯

৫.৯ শিক্ষাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশিষ্ট জনদের অবদান ২১৭

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার ২৩৭

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ২৪৮

২. অভিসন্দর্ভ ২৫১

৩. গেজেটিয়ার, রিপোর্ট ও প্রবন্ধ ২৫২

৪. জরিপ ২৫৩

৫. পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ২৫৩

৬. আদম শুমারী ২৫৩

৭. ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম ২৫৪

৮. English Books ২৫৪

৯. Gazetter ২৫৫

১০. Survey, Report ২৫৫

১১. Encyclopedia ২৫৫

১২. Website ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ যে কোন জাতির আত্মপরিচয়কে জানতে হলে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই মানুষের সার্বিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মপরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ ও রূপায়ন ঘটে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক ইতিহাস যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে ততটা গবেষণা হয়নি। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস হলো ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস; সরকারের উত্থান-পতনের ইতিহাস। যেখানে সাধারণ মানুষের ইতিহাস অনুপস্থিত। অথচ রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়া মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে; প্রভাব ফেলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হলে এখানকার সমাজ জীবনে শুরু হলে এখানকার সমাজ জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলনের ফলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। একইভাবে বৃটিশ শাসনের প্রভাবেও এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় আমরা এসব পরিবর্তনের চিত্র খুঁজে পাই না। এজন্য প্রয়োজন মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তনের সূত্রগুলো অনুসন্ধান করা।

মানুষের জীবনাচরণের সার্বিক কর্মকাণ্ডই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে কেবল শিল্প, সাহিত্য, নাচ, গানই বুঝায় না। মানুষের আহার-বিহার, চালচলন, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, চাষবাদ, শিক্ষা ব্যবস্থা সকল কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ রূপ দান করেছে। সুতরাং জাতির আত্মপরিচয়কে জানতে হলে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়েও গবেষণার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণার দিকে ইতিহাসবিদগণের দৃষ্টি পড়েছে। এক্ষেত্রে ষাটের দশকে প্রকাশিত ড. এম এ রহিমের æ*Social and Cultural History of Bengal* (Karachi; Pakistan Publishing House, Vol. 1, 1963) গ্রন্থটি প্রথম প্রয়াস এবং নির্দিষ্টভাবে *"সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস"* শিরোনামের এ গ্রন্থটি এমন পর্যন্ত এক মাত্র প্রয়াসও বটে।[১]

(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২);
বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭) ২য় খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (অনু.)
(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২)
এ গ্রন্থটি প্রসংগে ড. রহিম প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে উল্লেখ করেন।[২]

মুসলিম আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার জন্য ১২০১ হতে ১৫৭৬ সালের ইতিহাস জানা জরুরী। এই সময়ে বাংলার ইতিহাসে নানামুখি পরিবর্তন সূচিত হয় ফলশ্রুতিতে সমাজ, সংস্কৃতিতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন।

এছাড়াও ড. আব্দুল করিম[৩]
ড. আজিজুর রহমান মল্লিক[৪]
ড. সালাউদ্দিন আহমদ[৫]
ড. সুফিয়া আহমেদ[৬]

---

[১] ডক্টর এম.এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬)।

[২] ডক্টর এম.এ রহিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. মৃখবন্ধ (ছয়)।

[৩] A Karim, Social History of the Muslims of Bengal (Down to A.D. 1538) (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1959).

[৪] A.R. Malick, British Policy and the Muslims of Bengal (1757-1856) (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961).

[৫] Salahuddin Ahmed, Social Ideas and social Change in Bengal (1818-1835) (Leiden: E.J. Brill, 1965).

[৬] Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal (1884-1912) (Dacca: Oxford University Press, 1974).

Dhaka University Institutional Repository

ড. ওয়াকিল আহমদ[৭]

প্রমুখ গবেষকগণ বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন। তবে অধিকাংশ গবেষকই তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্বাচিত করেছেন। ফলে এই গবেষণাগুলোতে বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিত্র পুর্নাঙ্গরূপে পাওয়া যায় না। এছাড়া ড. আব্দুল করিম, ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, ডা. সুফিয়া আহমেদসহ অন্যান্য গবেষকরা অভিন্ন বাংলার পটভূমিকায় কাজ করেছেন কিন্তু তাদের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এগুলো থেকে বাংলাদেশের পূর্নাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সিলেট-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের নিকট দুর্বোধ্য। অনুরূপভাবে উত্তর বাংলার মানুষের জীবন রীতিতে জেলাভেদে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আবার বড় নদীর তীরবর্তী চর অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল ও ভাওয়াল অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারায় রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃহত্তর জেলাগুলো হতে পারে গবেষণার আলাদা ক্ষেত্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশের একটি বৈচিত্রপূর্ণ জেলা টাংগাইল জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে আমার এই গবেষণা।

১.২ টাংগাইল জেলা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

আজ থেকে ৫০০০ বা ৫৫০০ বছর পূর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। শুধুমাত্র মধুপুরের ভাওয়াল বনাঞ্চলের অস্তিত্ব বিরাজ মান ছিল।[৮]

---

[৭] উনিশ শতকে বাঙ্গালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)।

[৮] খন্দকার আব্দুর রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, (টাংগাইল: যমুনা প্রকাশনী, ১৯৭৭)।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু এটি একটি প্রাচীন ভূ-ভাগ অতএব নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই অঞ্চলের মানব বসতির সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থাও প্রাচীন।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক "হিউ এন সাং" তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বঙ্গভূমিকে মোট ৬টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৯]

এর ২য় ভাগে ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল যার অধিকাংশই এখন টাংগাইল। আধুনিক ঐতিহাসিকদের দাবি, বর্তমান টাংগাইল পাল ও সেন বংশের শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে।[১০]

তারা আরো দাবি করেন, টাংগাইলের মধুপুর পাল রাজা ভবদত্তের রাজত্বে অংশ ছিল।[১১]

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর এই সমুদয় অঞ্চল মুসলমান শাসনের অধীনে চলে যায়।[১২]

শামছুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করন।[১৩]

বাংলাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত টাংগাইল শাসনতান্ত্রিকভাবে প্রাচীন আসামের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৪]

---

[৯] মুহাম্মদ বাকের, টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, (টাংগাইল: ১৯৯৭)।

[১০] খন্দকার আব্দুল রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ০৯, (টাংগাইল: যমুনা প্রকাশনী, ১৯৭৭)।

[১১] মুহাম্মদ বাকের, টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১১৭ (টাংগাইল: ১৯৯৭)।

[১২] মামুন তরফদার, টাংগাইল জেলার লোক ঐতিহ্য, (টাংগাইল: ২০০৬)।

[১৩] প্রাগুক্ত।

[১৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি: টাংগাইল, পৃ. ৩৪ (বাংলা একাডেমী, প্রধান সম্পাদক-শামছুজ্জামান খান, ২০১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

এই জনপদ ১৭৭৬ সালে বাংলার নবাব মীর কাশিমের অধীনে চলে যায়।[১৫]

প্রাচীন এই জনপদ বার বার রাজনৈতিকভাবে হাত বদল হয়েছে। প্রাচীন টাংগাইল কখনও হিন্দু শাসকদের অধীনে আবার কখনও মুসলমান শাকদের অধীনে ছিল। আমরা জানি যে, রাজনৈতিক পালাবদল মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ফলশ্রুতিতে কোন একটি অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক জীবন দারার পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু এই অঞ্চলটি প্রাচীন, মানব বসতি দীর্ঘদিনের এবং বারংবার রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে তাই রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়েছে বারংবার। বিশেষত হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিলনে টাংগাইল সমাজ ও সংস্কৃতির ঘটেছে আমুল পরিবর্তন যা বর্তমান বাংলাদেশের অন্য জেলাগুলো থেকে টাংগাইলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে দিয়েছে বৈচিত্র ও ভিন্ন মাত্রা।

সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, জীববৈচিত্র, জীবনধারা সবকিছু টাংগাইল জেলাকে করেছে স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ। কিন্তু "টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি" নিয়ে আমার জানা মতে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ কারণে বর্তমানে টাংগাইলকে নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৩ অধ্যায় বিশ্লেষণ

গবেষণার বিষয়টি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রথম অধ্যায় : গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : টাংগাইল জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ, জেলার গঠন, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায় : অধিবাসীদের পরিচয় বাসগৃহ, খাদ্যাভাস, পোশাক, অলংকার, সামাজিক উৎসব।

[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি মৃৎশিল্প, স্থাপত্য, লোক সংগীত, যাত্রা, সংবাদপত্র, লোক প্রযুক্তি।

পঞ্চম অধ্যায় : টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার যাতে নিজস্ব মতামত ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টি শেষ করার পূর্বে গবেষার মূল শিরোনামেরই দুইটি প্রধান প্রত্যয় সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১.৪ সমাজ

একটি সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি পারস্পারিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যখন কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই উদ্দেশ্যে বসবাস করে তখন তাকে আমরা সমাজ বলি। গিডিংস (Giddings) "সমজাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কতগুলো স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি সমষ্টিকে সমাজ বলেছেন।[১৬]

সুতরাং 'কোন জনসমষ্টির সংঘবদ্ধতা' ও 'নির্দিষ্ট কোন একটি উদ্দেশ্য'কে সমাজ গঠনের অন্যতম নিয়ামক বলা যেতে পারে।

---

[১৬] æSociety is a number of like-minded individuals, who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends." (উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদ বন্ধু সেনদুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ (১নং পাদটিকা)।

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ জীব হিসেবেই মানুষ একত্রে বসবাস করে না। পারস্পারিকভাবে তাদের মধ্যে চলতে থাকে অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সমাজতত্ত্ববিদগণের অনেকেই পারস্পারিক এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন।

এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং অন্যান্য আচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে।

ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and page):

সমাজ হলো আচার এবং কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পারিক সাহায্য, নানা রকম সমবায় এবং বিভাগ মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা এ সকল কিছু দ্বারা গঠিত প্রথা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই আমরা সমাজ বলি। এ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল।[১৭]

টমাস এ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas)

সমাজকে "প্রজ্ঞাশীল জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন" বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮]

সুতরাং একটি সুসংবদ্ধ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:[১৯]

ক. পারস্পারিক সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা জনসমষ্টি;

খ. যারা এই সম্বন্ধের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিতৃপ্ত এবং

গ. এই পারস্পারিক সম্বন্ধ অবশ্যই জীবনধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

---

[১৭] উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯ (পাদটীকা)।

[১৮] Society is a stable moral union of national beings co-operating to a common ends."; উদ্ধৃত, শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণীত) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯, (পাদটীকা)।

[১৯] উদ্ধৃত, মোঃ মাহবুব আলম বেগ, "বাংলাদেশের লোকসাহিত্য, নিম্নবিত্ত সমাজ" অপ্রকাশিত পিএইচডি, থিসিস, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সর্বজন সম্মত গ্রহণযোগ্য একটা সংজ্ঞায় তারা এখনও উপনীত হতে পারেনি। সে কারণেই সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে তারা এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশি আলোচনার উৎসাহ দেখিয়েছেন যার মাধ্যমে সমাজকে একটা প্রত্যয় হিসেবে বোঝা সহজ।[২০]

কোন একটি সাধারণ ভূখণ্ডে বসবাসরত, নিজেদের মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য সমষ্টিগতভাবে সহযোগিতারত, একই সাধারণ সংস্কৃতির ধারক এবং স্বতন্ত্র সামাজিক ইউনিট হিসেবে কার্যরত একটি সংগঠিত যৌথবদ্ধ জনসংখ্যাকে সমাজ বলে।[২১]

১.৫ সামাজিক স্তরবিন্যাসঃ

æNo society is classless" একটি সমাজের সকল মানুষ কখনই একই শ্রেণিভুক্ত নয় অর্থাৎ একই স্তরের নয়। কতগুলো সর্বজনগ্রাহ্য মাত্রার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। বস্তুত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর এই বিভক্তিকেই সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক স্তর বিন্যাস বলে অভিহিত করেছেন।[২২]

সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরনঃ

সমাজবিজ্ঞানীগণ সাধারণত সামাজিক স্তর বিন্যাসের ৪টি প্রধান ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

এগুলো হলো দাস প্রথা, এস্টেট, জাতি-বর্ণ প্রথা, সামাজিক শ্রেণি ও মর্যাদা।[২৩]

---

[২০] মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন, সমাজ বিজ্ঞান প্রত্যয় ও পদ্ধতি (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯১)।

[২১] উদ্ধৃত, মোঃ মাহবুব বেগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯।

[২২] রঙ্গলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ১-৯।

[২৩] ঐ. পৃ. ৩; নাজমুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দাস প্রথাঃ সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম ধরন হলো দাস প্রথা। দাস প্রথা প্রাচীন গ্রীক-রোমান সাম্রাজ্যে বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথায় দুইটি স্তর দাস ও মালিক। তারাই দাস যাদের কোন অধিকার নেই, তারা অন্যের সম্পত্তি।[২৪]

ভারতেও দাস ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সাধারণ শ্রমিক ও ভূমি দাস রূপেই তাদের কেনাবেচা করা হতো।

এস্টেটঃ মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপীয় সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি ধরন এস্টেট। সম্রাজ্যে প্রত্যক এস্টেটের নির্দিষ্ট মর্যাদা ও অধিকার ছিল। সামন্ততন্ত্রের সূচনাপর্বে সমাজে শুধুমাত্র অভিজাত ও যাজক দুই শ্রেণির এস্টেটের অস্তিত্ব থাকলেও দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে শহরবাসী নাগরিকদের নিয়ে গড়ে উঠে তৃতীয় এস্টেট। প্রতিটি এস্টেটদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, দাসদের তা না থাকায় এস্টেট বলা যায় না।[২৫]

ভারতে ইউরোপীয় এস্টেট প্রথা তেমন ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী ইউরোপীয় এস্টেটের বিভিন্ন ধরনের সাথে তুলনা করেছেন।

জাতিবর্ণ প্রথাঃ জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক অদ্বিতীয় ধরন হিসেবে ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত। ভারতের হিন্দু সমাজে প্রকট আকারে এ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ৪টি বর্ণ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল।

স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতিবর্ণ প্রথা হলো একটি শ্রেণি। যা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে জাতি বর্ণ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রূপ ধারন করেছে।[২৬]

---

[২৪] নাজমুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

[২৫] প্রাগুক্ত, রঙ্গলাল সেন, পৃ. ৫-৬।

[২৬] রঙ্গলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, পৃ. ৬-৭।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক শ্রেণি ও পদমর্যাদাঃ

বর্তমানকালে সামাজিক স্তর বিন্যাস বলতে মূলত অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাগকে বুঝায় এবং এ অর্থে সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের উচ্চ শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণি, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রথমটি সমাজের অর্থনৈতিক স্তরের ব্যাপক অংশের মালিক, দ্বিতীয়টি মূলত শিল্পের মজুরি অর্জনকারী আর তৃতীয়টি অবয়বহীন অবশিষ্ট দল যাদের ভেতরে রয়েছে ক্রেতাদুরস্থ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রমিক ও উদার নৈতিক পেশাজীবি। কোন কোন শিল্প সমাজে কৃষকদের চতুর্থ শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২৭]

১.৬ সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন পদ্ধতি (Way of life)। মানুষের জীবন পদ্ধতি। সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে তাই জীবনের কথা, জীবনাচরণের কথা চলে আসে।

জীবনের মধ্যেই সংস্কৃতির বিকাশ। তবে এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম,হলে চলে না। তাকে হতে হয় সজীব, সবাক ও সক্ষম। তাই বলা যায়, প্রাণহীন জড় পদার্থের কোন সংস্কৃতি নেই। আবার প্রাণী জগতের কোন কোন শ্রেণির জীবনস্পন্দন, কণ্ঠধ্বনি, বাসস্থান এমনকি সমাজ বা দলবদ্ধ থাকলেও এদের কোন সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি।[২৮]

তাই স্বাভাবিকভাবেই, 'সংস্কৃতি' কথাটার সঙ্গে জীবনের একটা যোগসূত্র থাকলেও, সংস্কৃতির বিকাশ প্রকৃতিজগতের সকল প্রাণীর মধ্যে ঘটেনি একমাত্র মানব জীবনাচরণের মধ্যেই ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি ও বিকাশ।

ইংরেজি 'Culture' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Cultura' থেকে এসেছে। Culture-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সংস্কৃতি'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০ সালে সংস্কৃতি কথাটি Culture অর্থে বাংলা ভাষায় চালু করেন।

---

[২৭] মুহাম্মদ মিজান উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[২৮] ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ইতোপূর্বে Culture অর্থে কিছুকালের জন্য 'কৃষ্টি' শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু করেন যদিও তা স্থায়ী হয়নি।

সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ- সংস্কার, অনুশীলন দ্বারা অর্জিত বিদ্যা, রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, সৃষ্টি।[২৯]

সংস্কৃতি শব্দটির মূল অর্থ যদিও কর্ষন, তবুও এ কর্ষণ যে উৎকর্ষপ্রবণ, তাতে সন্দেহ নেই।

মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষজাত সৃষ্টিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি একথা যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি জাতীয় জীবনেও সত্য। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস বিচার করলে এ উক্তির সত্যতা, উপলব্ধি করা যায়।[৩০]

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য-গীত-বাদ্য, চিত্রকর্ম, মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বুঝে থাকি। এগুলো সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ।

মানস ফসল; তবে সংস্কৃতির সবটা নয়। [৩১]

সংস্কৃতির গোড়ার কথা হলো সৃষ্টি; নব প্রকাশ, নব প্রয়াস। এ প্রয়াসের মূল লক্ষ্য প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে মানুষকে জয়ী করা, অগ্রগামী করা শক্তিশালী করে তোলা। সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায়, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (Sciences), সমস্ত সৃষ্টি সম্পদ (arts)।[৩২]

---

[২৯] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম, এ (সংকলিত), সংসদ বাংলা অভিধান (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭১), পৃ. ৮০০।

[৩০] অধ্যাপক মাযাহারুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতি পটভূমিকা, মাসিক মোহাম্মদী (২৯শ বর্ষ, বার্ত্তিক, ১৩৬৪ আশ্বিন, ১৩৬৫) পৃ. ৮৭০।

[৩১] আনিসুজ্জামান, "আমাদের সংস্কৃতি" মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা), বাংলাদেশ: বাঙ্গালী আত্মপচিয়ের সন্ধানে (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ৭৩।

[৩২] গোপাল হালদার, বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপরেখা (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫) পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি মানে হচ্ছে জীবনের বহুভঙ্গিম রূপ। সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।[৩৩]

সুক্ষ্ম, পরিশ্রুত ও শোভন সুন্দর অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[৩৪]

সংস্কৃতি কথাটি এত ব্যাপক যে, একে এক দৃষ্টিতে অনুধাবন করা বা এক কথায় ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। কোন একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়নই ঐ জাতি বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নামে সাধারণত অভিহিত হয়ে থাকে। যা জীবন তাই সংস্কৃতি। মানুষ যে জীবনযাপন করে অর্থাৎ জীবনযাপন করার জন্য এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যা সৃষ্টি করে সবই তার সংস্কৃতি। আর কোন একটি দেশের বা গোষ্ঠীর লোকের যা সংস্কার তাই সে দেশের সংস্কৃতি। মোটকথা দেশের অধিকাংশ লোক সাধারণভাবে যে অভ্যাস চর্চা করে; স্বতঃস্ফুর্তভাবে যা অনুশীলন করে সেটাই সে দেশের সংস্কৃতির অংশ।[৩৫]

সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটা জাতির সামগ্রিক জীবনচর্চার আদর্শ (Mode of living)। এই আদর্শের ভিতর যেমন শিল্প চিন্তার স্থান আছে। যেমন আছে বিদ্যাশিক্ষার সুনিরুপিত স্থান। তেমনি আছে আচার-আচরণের শুচিতা, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সহানভূতি, মৈত্রী, প্রকৃতি স্বধর্মের পোষকতা। সংস্কৃতি হলো বিচিত্র সদ্ গুণের একটি অখণ্ড যৌগিক রূপ, তাকে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ নির্যাসও বলতে পারি।[৩৬]

বিচিত্র সব উপকরণের সন্নিবেশনে গঠিত হয় মানুষের সংস্কৃতি। আর এ সকল উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

---

[৩৩] সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে সুফি মোতাহার হোসেন চৌধুরী এক সময় এই মূল্যবান কথাটি বলেন। আহমদ রফিক, বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬) পৃ. ৮৮।

[৩৪] আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ২৩।

[৩৫] মনসুর মুসা (সম্পা) বাংলাদেশ (ঢাকা: নওরাজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪) পৃ. ২২৫-২৩৩।

[৩৬] নারায়ণ চৌধুরী, বাংলার সংস্কৃতি (কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, বঙ্গাব্দ ১৩৬৩) পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

ক. বিশেষ জনপদের ভূগোল প্রকৃতি;

খ. সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপাদান পদ্ধতি ও উৎপাদনের বন্টন ব্যবস্থা;

গ. তার মানস ভাবনা বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্ম চেতনা।

এই সকল উপকরণের অবদানেই তো গড়ে উঠে মানুষের জীবন। অতএব, সব মিলিয়েই তার সংস্কৃতি।[৩৭]

সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে ড. নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন;[৩৮]

"নেব-দেব, রক্ষা করবো" এটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবান কথা। সংস্কৃতি স্থিতিশীল। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। যারা এটাকে বুঝতে না পেরে পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা কেবল ফসিলকে নিয়েই পড়ে থাকে, জীবনকে নয়।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞগণ সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের মৌলতত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদ, চক্রবাদ, দ্বন্দ্ববাদ, কর্মবাদ, স্বয়ংক্রিয়বাদ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন সমাজে সংস্কৃতির পুরো চিত্র নির্ভর করে মূলত.....

১. উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির উপর;

২. ভৌগোলিক অবস্থানের উপর;

৩. সামাজিক দলসমূহ (যেমন, ভাষা ভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক, ধর্মগত ইত্যাদি)[৩৯]

তবে সংস্কৃতির পরিবর্তনের যত নিয়ামকের কথাই বলি না কেন নিজেকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরতে না পারলে; নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বজনীন করতে না পারলে; গ্রহণ-বর্জনের মানুসিকতা গড়ে না তুললে; সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। তা সেটি ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেই হোক আর সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেই হোক।

---

[৩৭] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "বাংলাদেশ: প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[৩৮] মনসুর মুসা (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

[৩৯] বুলবন ওসমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

Herskovits-এর সঙ্গে একমত হয়ে সংস্কৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারি।[৪০]

১. সংস্কৃতি শিখতে হয়;

২. মানুষের জৈবিক, পরিবেশগত, মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উপাদান হতে সংযুক্তি গৃহীত;

৩. সংস্কৃতি হচ্ছে কাঠামো ভিত্তিক;

৪. সংস্কৃতি তার বিভিন্নমুখী অংশ অনুযায়ী বিভাজনযোগ্য;

৫. সংস্কৃতি পরিবর্তনযোগ্য;

৬. সংস্কৃতি নিয়মানুবর্তী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একে বিশ্লেষণ করা যায়;

৭. সংস্কৃতি একটি যন্ত্র বিশেষ।

যার দ্বারা ব্যক্তি নিজের সামগ্রিক অবস্থা পুনর্বিন্যাস করে সৃষ্টিশীল প্রকাশভঙ্গি অর্জন করে।

৮. সংস্কৃতি গতিশীল ও সর্বত্র বিরাজমান।

[৪০] মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পা), রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাজশাহী; বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৯১), পৃ. ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

টাংগাইল জেলার ভূ-প্রকৃতি, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইতিহাস

২.১ জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ

ভৌগোলিক অবস্থানঃ

টাংগাইল জেলা বাংলাদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ জনপদ। বর্তমানে ঢাকা বিভাগের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক ইউনিট হল টাংগাইল।[১]

টাংগাইল জেলা ২৩°৪৮′৫১″ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°৪৮′৫১″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°৪৮′৫১″ পূর্ব ও দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৫১′২৫″ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত অবস্থিত।[২]

সীমানা ঃ চমচম, টমটম টাংগাইলের শাড়ি এই তিনটিতে টাংগাইলের বাড়ি–প্রাচীন এই প্রবাদকে ধারণ করে ও যমুনা, লৌহজং, বংশী নদীকে বুকে ঠাঁই দেওয়া প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ টাংগাইলের পূর্বে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর আর দক্ষিণে ঢাকা ও মাকিগঞ্জ জেলা অবস্থিত।[৩]

আয়তন ঃ জেলার মোট আয়তন ৩৪১৪,৩৫ বর্গ কিমি.।[৪]

জনসংখ্যা ঃ অন্যান্য জেলার তুলনায় টাংগাইলের জনসংখ্যা ও তার ঘনত্ব একটু বেশী। টাংগাইলের মোট জনসংখ্যা ৩৬,০৫,০৮৩ জন।[৫]

পুরুষ ঃ টাংগাইলের বসবাসরত জনসংখ্যার মধ্যে মোট পুরুষ ১৭,৫৭,৩৭০ জন।[৬]

মহিলা ঃ টাংগাইল জেলায় বাসরত মহিলা মানুষের সংখ্যা ১৬,৬৯,৭৯৪ জন।[৭]

---

[১] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪) শামছুজ্জামান খান (সম্পা), পৃ. ২৩।

[২] ঐ, পৃ. ২৩।

[৩] খন্দকার আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪।

[৪] আদমশুমারি, ২০১৪ সাল।

[৫] আদমশুমারি, ২০১১।

[৬] www.Tangail.com.

[৭] www.Tangail.com

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ঃ জেলায় প্রতিবর্গ কিমিতে **১০৫৬** জন লোক বাস করে।[৮]

ভূ-প্রকৃতি ঃ খাল, বিল, বাওর, নদী নালা বেষ্টিত একটি জেলা টাংগাইল।[৯]

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে টাংগাইল কে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ[১০]

ক. উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকা

খ. নদী ও জলাভূমি বেষ্টিত মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চল

গ. পশ্চিমাঞ্চলে যমুা নদী অববাহিকা।

উপরিউক্ত ৩টি ভৌগোলিক বা ভূ-প্রকৃতি গত বিভাগকে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস নিলাম;

ক. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকা ঃ টাংগাইল জেলার মধুপুর, ঘাটাইল, সখিপুর অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকা বিদ্যমান। এখানে প্রচুর লতা, গুল্ম, শাল গাছ জন্মে। এই অঞ্চলে উঁচু-নিচু ভূমি বিদ্যমান।[১১] উঁচু ভূমিগুলো স্থানীয়ভাবে টিলা' নামে পরিচিত।[১২] যার উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ২১-৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে।[১৩]

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই পাহাড়ি এলাকায় মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশী বলে মাটি লালচে।[১৪] পাহাড়ি অঞ্চলের মাটি এঁটেল। এছাড়া মাটির গুনাগুণের কারণে এখানকার মাটিতে আনারস, কাঁঠাল, কলা, আদা, হলুদ, কুল, আম, লেবুসহ আরও অনেক ফসল জন্মে।[১৫]

---

[৮] আদমশুমারি ২০১৪, www.Tangail.com.wikipedia.

[৯] খন্দকার আ: রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

[১০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[১১] wikipedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১২] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[১৩] মোঃ আয়নাল হক, উপজাতিবেদের ইতিহাস ও জীবনধারা, (ঢাকা : কৌশিক প্রকাশনী, ২০০৬) পৃ. ৬৩।

[১৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[১৫] মামুন তরফদার, টাংগাইল জেলার লোক ঐতিহ্য, (টাংগাইল, ২০০৬), পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চল ঃ টাংগাইলের মধ্যভাগে আছে নদী, নালা, খাল-বিল দ্বারা গঠিত উর্বর সমভূমি অঞ্চল।[১৬]

এই জেলাটিট গঙ্গা-ব্রহ্মপূত্র, মেঘনা অববাহিকার মধ্যভাগ।[১৭] টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী, মধুপুরের দক্ষিণ অংশ, ঘাটাইলের পশ্চিম অংশ, বাসাইল, টাংগাইল সদর, কালিহাতি এই অঞ্চলে অন্তর্ভূক্ত। এখানকার মাটি পলিমিশ্রিত দোঁআশ। ফলে ধান, পাট, গম, সরিষা, পাটসহ অন্যান্য ফসল প্রচুর জন্মে।

গ. পশ্চিমাঞ্চলে যমুনা নদী অববাহিকা ঃ টাংগাইল জেলার পশ্চিম সীমা ঘেঁষে বয়ে গেছে বাংলাদেশের প্রশস্ত নদী যমুনা। টাংগাইলের গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতী, নাগরপুরের পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে যমুনা নদী।[১৮]

যমুনা নদী অববাহিকা তীরবর্তী অঞ্চলে বেলে মাটির আধিক্য বিদ্যমান। ফলে জন্মে তরমুজ, বাদামসহ অন্যান্য ফসল।

জলবায়ু ও আবহাওয়া

বাংলাদেশের ঋতু প্রকৃতির কারণে একে ৬ ঋতুর দেশ বলা হয়ে থাকে। এই ঋতুগুলো হলো–

গ্রীষ্মকাল (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)

বর্ষাকাল (আষাঢ়-শ্রাবণ)

শরৎকাল (ভাদ্র-আশ্বিন)

হেমন্তকাল (কার্তিক-অগ্রহায়ণ)

শীতকাল (পৌষ-মাঘ)

বসন্তকাল (ফাল্গুন-চৈত্র)

---

[১৬] www.Tangail.com, E.barta.com।

[১৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[১৮] ঐ, পৃ. ৩২।

তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, আদ্রতা, বায়ুপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশকে সমভাবাপন্ন আবহাওয়া অঞ্চল বলা হয়। সারা বছর বিরাজমান গড় তাপমাত্রা ১১.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট হতে ৩৭.০৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট পর্যন্ত উঠানামা করে। টাংগাইল জেলার আবহাওয়া অন্যান্য জেলার মতই। এক্ষেত্রে খুব বেশি তারতম্য নেই।[১৯]

মার্চের শেষভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে এই অঞ্চলে গরমের প্রার্দুভাব ঘটে। অক্টোবরের শেষ দিকে দক্ষিণ-পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে উত্তরের হাওয়া প্রবাহের সাথে সাথে এই অঞ্চলে শীতের আগমন ঘটে। তবে শীত ও গরম কোনটাই চরম নয়। এপ্রিল যে মাস হতে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে আগষ্ট, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। যেহেতু বনাঞ্চল আছে তাই অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে একটু বেশি বৃষ্টি হয়।[২০]

টাংগাইলের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৯৫ ডি. ফারেনহাইট, সর্বনিম্ন ৫৫ ডি. ফারেনহাইট, আর গড় তাপমাত্রা ৫৮ ডি. ফারেনহাইট।[২১]
বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২.৩৩ মিলিমিটার।[২২]

২.২ জেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

জেলা পরিচিতি ঃ

টাংগাইল জেলা ঢাকা হতে ৯৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত। পূর্বে টাংগাইল বৃহত্তর ময়মনসিংহের একটা মহকুমা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ ও ১৯তম জেলা ছিল টাংগাইল। বর্তমানে টাংগাইল জেলা ঢাকা বিভাগের সবচেয়ে বড় জেলা।[২৩]

জেলা প্রতিষ্ঠা ঃ ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে টাংগাইল জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪]

---

[১৯] বাংলা পিডিয়া, ৫ম খ. পৃ. ২৯।
[২০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
[২১] ঐ, পৃ. ৩২।
[২২] ঐ, পৃ. ৩৩।
[২৩] www.Tangail
[২৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ২০১৪, পৃ.-২২।

প্রথম গভর্ণর ঃ এ এন কলিমুল্লাহ টাংগাইল জেলার প্রথম প্রশাসক।[২৫]

উপজেলা ঃ টাংগাইল জেলা বর্তমানে **১২**টি উপজেলা নিয়ে গঠিত।[২৬]

এগুলো হল–

১. টাংগাইল সদর

২. মধুপুর

৩. ধনবাড়ী

৪. ঘাটাইল

৫. গোপালপুর

৬. ভূঞাপুর

৭. নাগরপুর

৮. বাসাইল

৯. কালিহাতী

১০. সখিপুর

১১. দেলদুয়ার এবং

১২. মির্জাপুর।

থানা ঃ থানা মোট **১৪**টি।[২৭]

পৌরসভা ঃ

টাংগাইলে মোট পৌরসভা **১১**টি।[২৮]

---

[২৫] খন্দকার আ: রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[২৬] wikipedia, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭

[২৭] www.Tangail.com

[২৮] E.barta.com

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় আসন ঃ

টাংগাইলে মোট ১২টি উপজেলা ৮টি সংসদীয় আসনে বিভক্ত।[২৯]

টাংগাইল-১ ঃ মধুপুর ও ধনবাড়ী উপজেলা

টাংগাইল-২ ঃ গোপালপুর, ভূঞাপুর উপজেলা

টাংগাইল-৩ ঃ ঘাটাইল উপজেলা

টাংগাইল-৪ ঃ কালিহাতী উপজেলা

টাংগাইল-৫ ঃ টাংগাইল সদর উপজেলা

টাংগাইল-৬ ঃ নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলা

টাংগাইল-৭ ঃ মির্জাপুর উপজেলা

টাংগাইল-৮ ঃ বাসাইল ও সখিপুর উপজেলা।[৩০]

ইউনিয়ন ঃ টাংগাইল ১০৩টি ইউনিয়ন রয়েছে।[৩১]

গ্রাম ঃ ২৭৪২টি গ্রাম নিয়ে টাংগাইল জেলা গঠিত।[৩২]

শিক্ষার হার ঃ

'উজ্জীবিত টাংগাইল' স্লোগানকে ধারণ করে এগিয়ে চলা টাংগাইলে বর্তমানে শিক্ষার গড় হার ২৯.৪২% যেখানে নারীদের শিক্ষার হার শতকরা ২২.০৪% আর পুরুষের গড় শিক্ষার হার ৩৬.০১%।[৩৩]

---

[২৯] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েব সাইট।

[৩০] www. Election commission.com

[৩১] www.Tangail.com।

[৩২] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

[৩৩] www.edugov.bd.com

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে,[৩৪]

বিশ্ববিদ্যালয় - ১টি

মেডিকেল কলেজ - ১টি

সরকারি কলেজ - ১২টি

পলিটেকনিক কলেজ - ১টি

টেক্সটাইল কলেজ - ১টি

আইন কলেজ - ১টি

বেসরকারী কলেজ - ৪৬টি

পিটিআই - ১টি।

সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১২টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ২৯১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৩টি মোট মাদ্‌রাসা ১৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৩৪টি।

স্বাস্থ্যখাত ঃ

স্বাস্থ্য সেবায় টাংগাইল আগে থেকেই অনেকটা অগ্রসর। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে,[৩৫]

টাংগাইল জেলায় হাসপাতাল আছে ১৫টি।

জেনারেল হাসপাতাল ১টি (সদর)

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১০টি

ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ৫৯টি

বেসরকারী হাসপাতাল ৪টি

কুষ্টরোগের হাসপাতাল ১টি

টি বি ক্লিনিক ১টি

---

[৩৪] www.edugov.bd.com

[৩৫] E.barta, www.Tangail.com

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল হেলথ্ ক্লিনিক ১টি

কারা হাসপাতাল ১টি

পুলিশ হাসপাতাল ১টি

সিমিএস হাসপাতাল ১টি

বেসরকারী হাসপাতালের মধ্যে কুমুদিনী হাসপাতাল অন্যতম।[৩৬]

যোগাযোগের ব্যবস্থাঃ

টাংগাইল জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সড়কপথ ও রেল পথই বেশী কার্যকর এবং জনপ্রিয়। ২০০৫ সালে টাংগাইল রেলপথের আওতায় আসে। এরপর টাংগাইল ষ্টেশন ও পূর্ব যমুনা স্টেশনের মাধ্যমে টাংগাইলের মানুষ চলা চল করে। যমুনা ও লৌহজন নদীর মাধ্যমে চলে সীমিত নদী যোগাযোগ ব্যবস্থা। সুচারু রূপে টাংগাইলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে–

(i) সড়ক পথ

(ii) রেলপথ

(iii) নদী পথ

সড়ক পথ ঃ দ্রুততর সময়ে যখন-তখন যেখানে ইচ্ছা যাতায়াতের জন্য সড়কপথের কোন বিকল্প নেই। জালের মত বিস্তৃত সড়ক পথ। সভ্যতার বিকাশের অন্যতম নিয়ামক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ঢাকা থেকে টাংগাইল আর সব কয়টি উপজেলা হতে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশ ভ্রমণের জন্য সড়ক পথই বেশি ব্যবহৃত হয়। টাংগাইলে মোট পাকা সড়ক ১,৩৯৯৪.৫১ কি.মি.।

আধাপাকা সড়ক ৬৭.৩৪ কিমি.

কাঁচা রাস্তা ৫,৫৯৭.৩১ কিমি.।

---

[৩৬] মুহাম্মদ বাকের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে ঢাকা-টাংগাইল, ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক সহ জাতীয়, ও আঞ্চলিক সড়ক।[৩৭]

রেলপথ ঃ

টাংগাইল জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম রেলপথ। ২০০৫ সালে টাংগাইল রেল যোগাযোগের আওতায় আসে। টাংগাইলের উপর দিয়ে ৮৫ কিমি ডুয়েলগেজের লাইন রয়েছে। আরও আছে ৬টি স্টেশন।[৩৮]

নদীপথ ঃ

যমুনা, ধলেশ্বরী, বৈরান, বংশী, লৌহজং নদীর মাধ্যমে পূর্বে যে কোন স্থানে যাওয়া যেত। তবে বর্তমানে নাব্য সংকটে এ পথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন। বর্ষা মৌসুমে হালকা চলাচল উপযোগী থাকে নৌপথ।[৩৯]

টাংগাইলের কৃষি ঃ

ভূ-প্রকৃতিগত কারণে টাংগাইলের ভূমি সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা। উর্বর মাটি টাংগাইলকে করেছে ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা। টাংগাইলে মোট আবাদী জমি ৩৬,৮০৫ হেক্টর।[৪০]

আর মোট অনাবাদী জমি ২,৩৩,৮৮৭ হেক্টর।[৪১]

টাংগাইলের মাটিতে ধান, পাট, গম, সরিষা, আনারস, কলা, কাঁঠাল, আদা, হলুদ, মরিচ, আলু, কচু, মাষকালাই, বুট কালাই, খেশারী কালাই, তিল, তিসি, লেবু, পেয়ারা, আম, কুল, জলপাই, জাম, পেপে, বেল, শসা, ফুল কপি, বাঁধা কপি, লাউ, গাজর, মুলা, শিম, কুমড়া প্রভৃতি জন্মে।[৪২]

---

[৩৭] একনজরে টাংগাইল, উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৩৮] ঐ

[৩৯] ঐ

[৪০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[৪১] ঐ, পৃ. ৩১।

[৪২] www.Tangail.com., wikipedia

Dhaka University Institutional Repository

আনারস ঃ

টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় জন্মে দেশ বিখ্যাত ফল আনারস।[৪৩] রস, স্বাদ, গন্ধে মধুপুরের আনারস দেশখ্যাত। ২ প্রজাতির আনারস মধুপুরে চাষ হয়।[৪৪]

আষাঢ় ও আর্শ্বিন মাসে আনারস পাকে। বাংলাদেশের বাজারের আনারসের চাহিদার প্রায় ৪০% পুরন করে টাংগাইলের আনারস।[৪৫]

মধুপুর ছাড়াও সখিপুর ও ঘাটাইলেও অল্প পরিসরে আনারস চাষ হয়।

টাংগাইলে উৎপাদিত পাট ও আনারস এর চাহিদা বিদেশেও প্রচুর।[৪৬]

টাংগাইলের বিল ঃ

টাংগাইল জেলায় রয়েছে অসংখ্য বিল, রাখ, বড় বড় দীঘি ও নদী।[৪৭]

বিখ্যাত বিল, দহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-নকলা বিল, আমুলা বিল, তেরিল্যা বিল, কারাইল বিল, পোয়াতি বিল, মলাদহ বিল, গুজাদহ, মানিক দহ বিল, ভগা বিল, চাপড়া বিল, ধর বিল সহ প্রায় দুই শতাধিক বিল।

টাংগাইলের মৎস সম্পদ ঃ

টাংগাইলে ৭২টি মাছ চাষ উপযোগী বড় দিঘী রয়েছে। রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে ৭টি নদী।[৪৮] প্রাকৃতিক কারণেই এখানকার প্রতিটি জলাশয়ে থাকে প্রচুর মাছ। এ জেলায় প্রাপ্ত মাছগুলোর মধ্যে- রুই, কাতল, বোয়াল, কালিবাউস, আইর, শোল, গজার, টাকি, চিতল, ফলি, কৈ, মাগুর, শিং, পাবদা, গোলশা, টেংরা, বাজিলা, ফেসা, চাপিলা, কাজুলি, ইলিশ, বেতরং, নন্দা, বাচা, কচা, পাঙ্গাস, বাটা, রাইক, রিটা, পুটি,

---

[৪৩] E.barta, টাংগাইরৈর আনারাস

[৪৪] টাংগাইল জেলা, উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৪৫] খন্দকার আ: রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

[৪৬] www.Tangail.com.

[৪৭] wikipedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৪৮] উন্নয়ন পরিকল্পনায় টাংগাইল জেলা, জেলা পরিষদ ১৯৭০-৭১, পৃ. ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মলা, গচই, বাইম, বাগাড়, খলিশা, চিংড়ি, গুজা, চেলা, এলং, টাটকিনি, চ্যালা, বাইল্যা ইত্যাদি।[৪৯]

এ জেলার মাছ জেলার চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য জেলায়ও বিক্রি হয়।

টাংগাইলের বনজ সম্পদ

বনজ সম্পদের দিক হতে টাংগাইল পূর্ব হতেই সমৃদ্ধ। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১০টি জেলায় বনায়ন করা হয়। এই ১০টি জেলার মধ্যে টাংগাইল সবচেয়ে সফল।

এছাড়া ভাওয়াল গড়ের বনাঞ্চলের অধিকাংশই টাংগাইল জেলায় অবস্থিত।[৫০]

টাংগাইলের বনাঞ্চলে মধুপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, সখিপুর, কালিহাতী, সদর জুড়ে অবস্থিত।[৫১]

তবে মধুপুর উপজেলায় সব থেকে ঘন বন অবস্থিত।[৫২]

বনাঞ্চলের প্রকৃতি ঃ টাংগাইলের বন অধিকাংশই সামাজিক বন। এছাড়া মধুপুরের গড় অঞ্চলে আছে বাংলাদেশের ৩য় বৃহত্তম প্রাকৃতিক বন।[৫৩]

যা টাংগাইলের বনজ সম্পদকে করেছে অনেক বেশী সমৃদ্ধ। টাংগাইলের বনজ সম্পদ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের মধুপুর বন ও শাল গাছ সম্পর্কে জানা দরকার। নিচে তা আলোচনার প্রয়াস পেলাম–

মধুপুরের ভাওয়াল গড় ঃ

ভাওয়াল গড়ের একটা অংশ টাংগাইল জেলায় পড়েছে যা অধিকাংশই মধুপুর উপজেলায়। মধুপুর গড়ের আয়তন-৪,২৪৪ বর্গ কিমি.[৫৪] মধুপুরের গড় গাজীপুরের ভাওয়াল গড়ের অংশ বিশেষ।[৫৫]

---

[৪৯] উন্নয়ন পরিকল্পনা, জেলা: টাংগাইল, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ২৮৪।

[৫০] সূত্র : বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

[৫১] www.Tangail.com

[৫২] wikipedia

[৫৩] বন বিভাগ, মধুপুর জাতীয় উদ্যান।

[৫৪] বাংলা পিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৫৫] wikipedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয় তাজমহল। নির্মাণের কাঠ এই মধুপুর গড় হতে নেওয়া হয়েছিল।[৫৬]

এখানকার মাটির রং হরিদ্রাভা এবং বন এলাকার সর্বত্র এমন মাটি পাওয়া যায়। এ মাটি শুকনো অবস্থায় বেশ দৃঢ় ও কঠিন কিন্তু বৃষ্টির পানি পেলে তা নরম হয়ে পড়ে।[৫৭]

এখানকার জলবায়ু মাঝারি ধরনের। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশী গরম অনুভূত হয়। তাপমাত্রা ১০০ ফারেনহাইট। কার্তিক হতে মাঘ মাস পর্যন্ত শীত। তাপমাত্রা ৫০ ফারেন হাইট।[৫৮]

মধুপুর গড়ে ৩৭.৫% গাছ শাল।[৫৯]

এখানে প্রায় ৩৩ ধরনের গাছ আছে।[৬০]

চুনিয়া, গাছাবাড়ী, পীরগাছা, পিরোজপুর, টেলকি, জয়নাতলী, রসূলপুর, শোলাকুড়ি, আউষনারা, অরনখোলা, হলুদিয়া, চাপাইদ, বেরিকাইদ, রামকৃষ্ণ বাড়ী প্রভৃতি এলাকায় মধুপুর গড়ের ঘন বনাঞ্চল অবস্থিত।[৬১]

মধুপুর গড়ের বৃক্ষ ঃ

মধুপুর গড়ের প্রধান বৃক্ষ 'শাল'। এই শাল বৃক্ষ প্রায় ৭০%।[৬২]

স্থানীয়ভাবে এই গাছগুলো 'গজারী' নামে পরিচিত।

এছাড়া, আজুলি, আমড়া, আগর, গাব, ছাতিয়ান, হিজল, কড়ই, নিম, বকাইন, সেগুন, মেহগনি, পিতরাজ, তেতুল, শেওড়া, জিগা, সোনালু, আকন্দ, কাইকা,

---

[৫৬] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৩৩।
[৫৭] ঐ, পৃ. ৩৩।
[৫৮] ঐ, পৃ. ৩৩।
[৫৯] ঐ, পৃ. ৩৩।
[৬০] ঐ, পৃ. ৩৩।
[৬১] www.Tangail.com।
[৬২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

চালতা, অশ্বত্থ, বকুল, বাবলা, শিরিষ, আওলা গোলা, শিমুলসহ অনেক ঔষধি গাছ জন্মে।[৬৩]

এই গাছ আসবাব, জালানী ও ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টাংগাইলের জামদানী শাড়ি

তাঁতের শাড়ির জন্য টাংগাইল বিখ্যাত। এ জেলার তাঁতিরা তাদের সুনিপুণ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে যে কয় ধরনের শাড়ি বুনে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও দামি হলো জামদানি। একে সফট সিল্ক শাড়ি বলে অভিহিত করা হয়। এ শাড়ি আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে তৈরী করা হয়। মিহি, মসৃণ, সুতা এ শাড়ির প্রধান উপাদান। এ শাড়ি তৈরী করতে ১০০ কাউন্টের জাপানি সুতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বড় এবং কারুকাজময় পাড়, সুদৃশ্য ও বাহাড়ি রং এর জমিন ও নিখুঁত চমতকারিত্বে মাধ্যমে এ শাড়িতে যেন ফুটিয়ে তোলা হয় নারীর কল্পনাকে। তাই রমনীদের প্রথম পছন্দ টাংগাইলের জামদানী শাড়ি। টাংগাইল সদর, নাগরপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতী ও এর আশে পাশের বেশ কিছু জায়গায় তাঁতিরা পরম যত্নে তৈরী করেন জামদানি শাড়ি। এ শাড়ির দাম একটু বেশী। শাড়ি ভেদে ২০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে জামদানি শাড়ি পাওয়া যায়। উচ্চ মূল্য ও আভিজাত্যের ছোঁয়া থাকার কারণে উচ্চ বিত্তরা এ শাড়ি বেশি কেনেন। টাংগাইলের কারখানা থেকে তাই এ শাড়ি শোভা পায় দেশি বিদেশি সপিংমলে। জামদানি শুধু টাংগাইল নয়, পুরো দেশের গর্ব।[৬৪]

টাংগাইলের তাঁতের শাড়ি

টাংগাইলের ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো টাংগাইলের তাঁতের শাড়ি। ২০,০০০ এর অধিক তাঁতের মাধ্যমে টাংগাইলে তাঁতের শাড়ি তৈরী হয়।[৬৫]

---

[৬৩] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

[৬৪] খান, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সৌরভে, গৌরবে টাংগাইল, পৃ. ১৩৫।

[৬৫] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

টাংগাইল ও এর আশপাশের উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ শাড়ি বুননের কাজ চলে। খানিক প্রাচীন পদ্ধতি আর খানি উন্নত যন্ত্রের ছোঁয়ায় গ্রাহক হাতে পান মনকড়া সব শাড়ি। টাংগাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরী করতে হাতের কাজ করা হয় খুব দরদ দিয়ে, গভীর মনোসংযোগের সাথে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুদৃশ্যভাবে। পুরুষেরা তাঁত বোনে আর চরকাকাটা, রংকরা, জরির কাজ করে বাড়ির মহিলারা। তাঁতিরা মনের রং মিশিয়ে শাড়ির জমিনে শিল্প সম্মতভাবে নানা ডিজাইন করে নকশা আঁকে, ফুল তোলে।[৬৬]

টাংগাইল শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো– পাড় বা কিনারের কারুকাজ। শাড়ি বোনার তাঁত ২ ধরনের ঃ

(১) চিত্তরঞ্জন (মিহি) তাঁত

(২) পিটলুম (খটখটি) তাঁত।[৬৭]

দুই ধরনের তাঁতেই করা হয় নানা রং, ডিজাইন ও নামের শাড়ি। যেমন–

জামদানি, হাফ সিল্ক, টাংগাইল বিটি, বালুচরি, জরিপাড় হাজার বুটি, সুতিপাড়, কটকি, স্বর্ণচুড়, ইককাত, আনারকলি, দেবদাস, কুমুকুম, সানন্দা, নীলাম্বরী, ময়ূরকণ্ঠী এবং সাধারণ মানের শাড়ি।[৬৮]

দাম শাড়ির মান ভেদে ২,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

টাংগাইলের তাঁতের শাড়ির বাজার সারাদেশে বিস্তৃত। শুধু দেশ নয় বিদেশেও সমাদৃত।[৬৯]

পোড়াবাড়ির চমচম

টাংগাইলের পোড়াবাড়ির চমচমের নাম শুনলেই জীভে জল চলে আসে। মিষ্টির রাজা বলে খ্যাত পোড়াবাড়ির চমচমের স্বাদ ও স্বাতন্ত্রে এর জুড়ি মেলাভার। এই সুস্বাদু ও

---

[৬৬] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

[৬৭] ঐ, পৃ. ১৩৬।

[৬৮] সেলিম, ইসমাইল হোসেন, শত বর্ষের শত কথা, পৃ. ৬৮।

[৬৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

লোভনীয় চমচম টাংগাইলের অন্যতম ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন।[৭০]

বৃটিশ আমল থেকে অবিভক্ত ভারত বর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পোড়াবাড়ির চমচম টাংগাইলকে ব্যাপক পরচিতি দিয়েছে।

লালচে পোড়া ইটের রং এর এই সুস্বাদু চমচমের উপরিভাগে চিনির গুড়ো কোষ থাকে। কড়া মিষ্টিতে কানায় কানায় পূর্ণ। এর ভিতরটা যেমন নরম ঠিক তেমন রসালো।[৭১]

আজ হতে ২০০ বছর আগে থেকে টাংগাইল শহর থেকে ৭ কিমি দুরে পোড়াবাড়ি নামক স্থানে এমন মনকাড়া মিষ্টি তৈরী শুরু হয়। স্থানের নাম অনুসারে এ মিষ্টির নাম রাখা হয়েছে পোড়াবাড়ির চমচম।[৭২]

তবে বর্তমানে পোড়াবাড়ির বাইরে টাংগাইলের পাঁচআনী বাজারেও তৈরী হয় টাংগাইলের সুস্বাদু চমচম।[৭৩]

প্রস্তুতপ্রণালী

প্রথমে ২০/২৫ মন দুধ অনেকক্ষণ জ্বাল দিয়ে ১০০ কেজি ছানা বানানো হয়। ১০০ কেজি ছানা থেকে ৩০০ কেজি চমচম তৈরী করা যায়। প্রথমে ছানাকে গোল গোল করে চমচমের আকৃতি দেওয়া হয়। এরপর ছানার বলকে শক্ত করার জন্য কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। আলাদা পাত্রে চিনির সিরা জ্বাল দেওয়া হয় অতঃপর ঐ শিরায় ৪৫ মিনিট ছানার বলকে জ্বাল দিয়ে কড়া করা হয়। এরপর ছানার বলগুলোকে আলাদা পাত্রে ঠান্ডা করা হয়। অন্য আরেকটি পাত্রে ৭/৮ কেজি দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে মাওয়া বা ক্ষীর তৈরী করা হয়। ঠান্ডা হয়ে আসা চমচম আকৃতির বল মাওয়ার

[৭০] তরফদার মামুন, লোক সাহিত্য, টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ৭০।
[৭১] ঐ, পৃ. ৭১।
[৭২] ঐ, পৃ. ৭১।
[৭৩] ঐ, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে গড়িয়ে অর্থাৎ মাখিয়ে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এভাবেই তৈরী হয় রসে ভরা চমচম।[৭৪]

তবে চমচমের প্রথম কাড়িগড় কে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৭৫]

একসময় পোড়াবাড়ি গ্রামের ৫০/৬০ টি দোকানে চলত জমজমাট ব্যবসা এখন জরাজীর্ণ কয়েকটি দোকানে এ ব্যবসা হয়।[৭৬]

তবে টাংগাইল ছাড়িয়ে এ মিষ্টির স্বাদে মাতোয়ারা গোটা দেশ। এমন কি বিদেশেও এর চাহিদা রয়েছে। হবে না কেন টাংগাইলের চমচম স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে এককথায় অতুলনীয়।[৭৭]

২.৩ টাংগাইল জেলার নদ নদী

টাংগাইলের বুক চিড়ে কতগুলো নদী সতত প্রবাহমান। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

যমুনা ঃ

তিব্বতের মানস সরোবর হতে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে কুড়িগ্রামের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।[৭৮]

তারপর ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করেছে। জামালপুরের নিকটবর্তী হওয়ার পর ১৮৮৭ সালের ভূমি কম্পে ব্রহ্মপুত্র নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৭৯]

এই নদীটির যে অংশ দক্ষিণ দিকে টাংগাইল-সিরাজগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তার নাম যমুনা নদী। টাংগাইল জেলার সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে যমুনা নদী। টাংগাইলের

---

[৭৪] স্বপন ঘোষ, ৪৫, কাড়িগর পাঁচ আলী বাজার, পুরাতন কাড়িগর পোড়াবাড়ি, টাংগাইল।
Banglanews 24.6 nov.14

[৭৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ এপ্রিল, ২০১৯।

[৭৬] ঐ, ৭ এপ্রিল, ২০১৯।

[৭৭] ঐ, ৭ এপ্রিল, ২০১৯।

[৭৮] বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, ভূগোল বই, নবম ও দশম শ্রেণি।

[৭৯] ভূগোল বই, নবম ও দশম শ্রেণি পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

গোপালপুর, ভূঞাপুর, কালিহাতি, নাগরপুর, টাংগাইল সদর সহ মোট ৫টি উপজেলার পাশদিয়ে বয়ে গেছে। উল্লেখ্য যমুনা নদীর পূর্ব তীর টাংগাইল জেলার পশ্চিমের শেষ সীমানা নির্দেশক।[৮০]

প্রাকৃতিক মাছের আঁধার এই নদী বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চর বিশিষ্ট প্রশস্ত নদী। এই নদীর উপর বিশ্বের ১১তম বৃহৎ ব্রীজ ও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ব্রীজ যমুনা বহুমুখি সেতু নির্মিত হয়েছে থাকে মূলত উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলা হয়। এটি প্রাকৃতিক মাছের অন্যতম আঁধার।

বৈরান ঃ

বৈরান নদী একটি খরস্রোত নদী।[৮১]

বর্ষাকালে নদীটি এত বেশি তেজদ্বীপ্ত হয় যে, দুইপাশে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই জন্য এই নদীর নাম বৈরান।[৮২]

গোপালপুরবাসীকে পলি মাটি দিয়ে শস্য সুফলা করেছে এই বৈরান নদী। এটি ব্রক্ষপূত্র নদী হতে উৎপন্ন হয়ে জামালপুরের মধ্য দিয়ে মধুপুরের পাশ দিয়ে গোপালপুর, ভুঞাপুর হয়ে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।[৮৩]

ধলেশ্বরীঃ

অদ্যাবধি বহমান প্রাচীন নদীগুলোর মধ্যে ধলেশ্বরী অন্যতম। ১৮ শতকের কিছু পূর্বে এ নদীর খাত বড় বাজু পরগনার পূর্ব পাড়ের পশ্চিম অংশ হতে উৎপন্ন হয়ে ক্রমেই দক্ষিণ পূর্বমুখী হয়েছে। দুইশত বছরের মধ্যে এ নদী একাধিকবার গতি পরিবর্তন করেছে। ধলেশ্বরী নদীটি এলাসিন দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে কেদারপুরের নিকট

---

[৮০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[৮১] খন্দকার আ: রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

[৮২] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[৮৩] ঐ, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

২ ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দক্ষিণ দিকের অংশ কালিগঙ্গা নামে মানিকগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।[৮৪]

আর পূর্ব দিকের অংশ ধলেশ্বরী নাম নিয়ে ঢাকার কাছে গিয়ে বুড়িগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।[৮৫]

বংশাইঃ

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে জামালপুরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে টাংগাইল জেলার মধুপুর পৌঁছে। তারপর বানার নদী ও ঝিনাই নদীর একটি শাখার সাথে মিলিত হয়।[৮৬]

আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে টাংগাইলের মির্জাপুরের নিকট হয়ে কালিয়াকৈরে দুভাগে হয়ে মূল ধারা তুরাগ নাম ধারণ করে।[৮৭]

তারপর মিরপুর হয়ে বুড়িগঙ্গায় পতিত হয়। দ্বিতীয় ধারাটি কালিয়াকৈর হতে দক্ষিণ মুখি হয়ে ধলেশ্বরীতে পড়েছে।

ঝিনাইঃ

জামালপুর জেলার সন্ন্যাসীগঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে বর্তমান গোপালপুর এবং ভুঞাপুর থানা সদরের উত্তরে পাচটিকরি নামক স্থানে এসে লৌহজং নদীর সাথে মিশে গিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে।[৮৮]

লৌহজংঃ

লৌহজং যমুনার শাখা নদী, ভূঞাপুর থানা সদরে গাবসারা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূঞাপুর থানা সদরের ১ কি.মি. উত্তরে পাঁচটি করিতে ঝিনাই এর সাথে মিশে দক্ষিণ

---

[৮৪] তানভীর হোসেন, বয়স ২৪ বছর, উপজেলা হরিরামপুর, জেলা-মানিকগঞ্জ।

[৮৫] ইমরান হোসেন, বয়স-৩২, সদর ঘাট, ঢাকা।।

[৮৬] মো: আ: হামিদ, বয়স-৭২, মধুপুর টাংগাইল।

[৮৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯।

[৮৮] শরীফ আহমেদ, বয়স- ২৮, মুসুদ্দি, ধনবাড়ি, টাংগাইল।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বমুখী হয়েছে। এই নদী টাংগাইল, করটিয়া, পাকুল্যা, মির্জাপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে ঢাকার কাছে বংশাই নদীর তীরে মিলিত হয়েছে।[৮৯]

২.৪ বনভূমি

টাংগাইলের বনবিভাগের অন্তর্গত বনাঞ্চল, ময়মনসিংহহ জেলার ফুল বাড়িয়া থানার অন্তর্ভুক্ত গোপীনাথপুর মৌজা বাদে টাংগাইল জেলার মধ্যে পড়েছে।[৯০]

এ বন এলাকা জেলার ২৪′-১′ এবং ২৫-২′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯-৫০′ এবং ৯১-১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[৯১]

বংশাই নদীর পূর্ব তীরের বন উত্তর দক্ষিণে ৪০ মাইল এবং পূর্ব পশ্চিমে ৫-১২ মাইল প্রশস্ত। আবার বংশাইল নদীর পশ্চিম তীরস্থ বন উত্তর-দক্ষিণে ১২ থেকে ১৪ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব পশ্চিমে এর প্রস্থ ৪-৫ মাইল।[৯২]

পুরো টাংগাইল জেলা সামাজিক বনায়নে ভরা। তবে মধুপুরের ভাওয়াল গড় টাংগাইলের বনের প্রাণ। এর আয়তন ৮,৪৩৬ হেক্টর।[৯৩]

এখানকার মাটি হলুদাভ। মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি। শুকনো মাটি অনেক শক্ত কিন্তু ভেজা মাটি অনেকটা দৈ এর মত।[৯৪]

সব কিছু মিলিয়ে টাংগাইল বন বিভাগের আয়তন ৬৭,৯৬০,২৬ একর অর্থাৎ প্রায় ১০৬.১৯ বর্গ মাইল।

মধুপুর, ঘাটাইল, ধনবাড়ি, গোপালপুর, কালিহাতি, সখিপুর এ বনের বিস্তৃতি।[৯৫]

---

[৮৯] Banglanews.24.com (টাংগাইল জেলা)

[৯০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[৯১] ঐ, পৃ. ৬২।

[৯২] ঐ, পৃ. ৬২।

[৯৩] ইউকিপিডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭

[৯৪] মো: কাবিল উদ্দিন, বয়স-৩০, চুনিয়া, মধুপুর, টাংগাইল।

[৯৫] wikipedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, মধুপুর গড়)

Dhaka University Institutional Repository

টাংগাইল বনের প্রাণ হলো শাল গাছ। বাকী ৬২.৫% হলো অন্যান্য গাছ। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আজুলি, আমড়া, আগর, গাব, ছাতিয়ান, হিজল, নিম, হড়িতকি, কাইকা, বকাইন, আওলা গোলা, শিরিষ বাবনা, শেওড়া, জিগা, পিতরাজ, অশ্বথ, শিমুল, আকন্দ ও সোনালু অন্যতম।[৯৬]

২.৫ দর্শনীয় স্থান

ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানব সৃষ্ট ময়নাভিরাম স্থাপনা এই তিনে মিলে টাংগাইল জেলাকে করেছে দেখার মত। মুসলিম ঐতিহ্য, হিন্দু ধর্মীয় স্থাপনা, রাজবাড়ী, প্রাকৃতিক নির্দশন, মাজার, আশ্রম, আধুনিক নানন্দকি সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থাপনা কি নেই এখানে। এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেলাম–

নবাব বাড়ি মসজিদ

নবাব বাড়ি মসজিদ ধনবাড়ি মসজিদ নামেই পরিচিত। মুসলিম স্থাপনার এক অনবদ্য কীর্তি। অনুমান করা হয় এটি শায়েস্তা খানের আমলে নির্মিত।[৯৭] আগ্রার তাজমহলের আদলে সিদ্দীক রাজ এটি নির্মাণ করেন। এই মসজিদে মোট ৩৪টি গম্বুজ আছে।[৯৮] নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কবর এখানেই অবস্থিত। টাংগাইল শহর হতে ৬০ কি.মি. দূরে একটি অবস্থিত। হাজারো পর্যটক এখানে ভিড় জমান।

আইলাজোলা মসজিদ

মধুপুর শহর হতে এটি অল্প দূরত্বের চালা গ্রামে এটি অবস্থিত। মসজিদটি প্রাচীন, কথিত আছে, এটি নির্মিত হয়নি বরং মাটির নিচে হতে উপরে ভেসে উঠেছে।[৯৯] অন্য কথিত আছে, জনৈক জোলা তার জোলা (তাঁতি) নাম ঢাকতে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।[১০০]

---

[৯৬] মো: সাইফুল ইসলাম, ৩০, নরকোনা মধুপুর, টাংগাইল।

[৯৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[৯৮] মো: শরীফ আহমেদ, ৩০, মুসুদ্দি, ধনবাড়ি, টাংগাইল।

[৯৯] মো: ইব্রাহিম, বয়স, ৪৫, হলুদিয়া, মধুপুর, টাংগাইল।

[১০০] মো: আলহাজ উদ্দিন, ৪০, ধলপুর, মধুপুর, টাংগাইল।

Dhaka University Institutional Repository

এটি অনেক প্রাচীন ও নানান জনশ্রুতির কারণে মানুষের আগ্রহের তুংগে।

আটিয়া মসজিদ

করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পুত্র সাইদ খান পন্নী এটি ১৬০৯ সালে নির্মাণ করেন।[১০১] মসজিদটি একটি গম্বুজ বিশিষ্ট্য বর্গক্ষেত্রাকার কক্ষ এবং তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দা নিয়ে গঠিত। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।[১০২]

টাংগাইলের প্রাচীন নির্দশন হিসেবে মসজিদটি দর্শনার্থীদের পছন্দের শীর্ষে।

২০১ গম্বুজ মসজিদ

টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার নগদাশিমলা ইউনিয়নের দক্ষিণ পাথালিয়া গ্রামে এটি অবস্থিত। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল ইসলাম এটি নির্মাণ করেন।[১০৩]

এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।[১০৪]

মদন গোপালের মন্দির

মধুপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এটি অবস্থিত। এটি একটি কৃষ্ণ মন্দির।[১০৫]

পুটিয়ার জমিদার রানী হেমন্তকুমারী দেবী এটি নির্মাণ করেন।[১০৬]

আনন্দ মঠ

মধুপুর উপজেলা সদরের বংশাই নদীর পূর্বতীর ঘেষে এটি অবস্থিত। সন্ন্যাস বিদ্রোহের নেতা আনন্দগীর এই মঠ নির্মাণ করেন। তার নাম অনুসারে এটি আনন্দমঠ নামে পরিচিত হয়। এটি একই সাথে শিব উপাসনালয় ও দুর্গ।[১০৭]

---

[১০১] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

[১০২] মো: ফারুক আহমেদ, ৩৪, তক্তার চালা, সখিপুর, টাংগাইল।

[১০৩] মো: আনোয়ার হোসাই, ৩০, ঝাওয়াইল।

[১০৪] www.Tangail.com

[১০৫] রাজীব কুমার ঘোষ, বয়স-৩০, ষোশপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল।

[১০৬] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

[১০৭] জহুরুল ইসলাম, প্রভাষক, মধুপুর, কলেজ, ৪৫, মধুপুর, টাংগাইল।

Dhaka University Institutional Repository

আম্বারিয়া জমিদার বাড়ি

টাংগাইল হতে ৪০ কিমি. দুরে মধুপুর উপজেলার মির্জাপুর ধানাধীন আম্বারিয়া গ্রামে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি। তিনি প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। বাড়িটি এখন শুধুই ধ্বংসস্তুপ।[১০৮]

হেমনগর জমিদার বাড়ি

হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৮৮০ সালে মধুপুরের আম্বাড়িয়ার বাড়ি ত্যাগ করে গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল ইউনিয়নের সুবর্ণখালি গ্রামে নতুন রাজবাড়ি নির্মাণ করেন।[১০৯] সুবর্ণখালি যমুনা নদীর তীরে হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল। এই জমিদার বাড়ি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ধনবাড়ি নবাব বাড়ি

এটি ধনবাড়ি উপজেলা শহরেই অবস্থিত। শোনা যায়, সম্রাট আকবরের আমলে ইসপন্দিয়া খাঁ ও মনোয়ার খাঁ নামক দুই ব্যক্তি নির্মাণ করেন।[১১০]

ধারণা করা হয় এই দুজন পির বাগদাদ থেকে এই অঞ্চলে আসেন। পরবর্তীতে এটি এক নওয়াব আলী চৌধুরীর পূর্ব পুরুষদের হস্তগত হয় এবং তারা পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার সাধন করেন। এখন উত্তর টাংগাইলের সব থেকে পর্যটকের পছন্দে আছে এই বাড়ি।

করটিয়া জমিদার বাড়ি

করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী– এই বাড়িটি নির্মাণ করেন। এটি নান্দনিক সৌন্দর্য্যের একটি বাড়ি। পর্যটকের পছন্দের শীর্ষে আছে।

---

[১০৮] মিজানুর রহমান, ৩০, বেলচুঙ্গি, মধুপুর, টাংগাইল।

[১০৯] জাযার আলম, স্মরনীয় বরণীয়, (ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং, ২০০৩) পৃ. ৮৩।

[১১০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

মহেড়া জমিদার বাড়ি

টাংগাইলের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মহেড়া জমিদার বাড়ি। এটির নান্দনিক সৌন্দর্য সবাইকে কাছে টানে।[১১১]

মধুপুর জাতীয় উদ্যান

মধুপুর জাতীয় উদ্যান অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এটি মূলত ভাওয়াল গড়ের একটা অংশ। যেটিকে উদ্যান হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দোখলা, লহড়িয়া ও রসুলপুর হল তিনটি অভয়ারণ্য। শালগাছ, হরিণ, বানর, সজারু হলো এখানকার মূল আকর্ষণ। এছাড়া আছে নানান জাতের পাখি। যা সবাইকে মুগ্ধ করে।[১১২]

টাংগাইল জেলা শহর থেকে ৩০ কি.মি. দূরে ঘাটাল উপজেলার সাগর দিঘী একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এখানে দিঘী ও জমিদার বাড়ি রয়েছে।[১১৩]

যমুনা ব্রীজ

১৯৯৮ সালে কাজ শেষ হওয়া ৪.৮ কিমি. দীর্ঘ যমুনা ব্রীজ টাংগাইলের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এটি যমুনা নদীর উপর নির্মিত। যা টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জকে যুক্ত করেছে।[১১৪]

উপেন্দ সরোবর, যাদব বাবুর বাড়ি এছাড়া খোকা সাধুর আশ্রম, বাবা আদম কাশ্মিরীর মাজার, ভাসানীর মাজার।

ভারতেশ্বরী হোমস

নাগরপুর জমিদার বাড়ি

দোঘলা রেস্ট হাউজ

এলেংগা রিসোর্ট

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ

পাকুটিয়া জমিদার বাড়ি হলো অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

---

[১১১] সোহাগ হোসেন, ২২, মধুপুর, টাংগাইল।

[১১২] সুমন মিয়া, ৩২, গোপীনাথপুর, মধুর, টাংগাইল।

[১১৩] মো: শাহ আলম, ৩২, কাজিপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল।

[১১৪] Bangladesh.24.com (যমুনা সেতু)

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ মুক্তিযুদ্ধে টাংগাইল

রক্তের দামে কেনা আমাদের এ বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে মহান যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে শত্রু মুক্ত করেছি। আর অঞ্চল হিসেবে এই প্রিয়ভূমি টাংগাইলকে মুক্ত করতে এখানকার মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। শহীদ হয়েছেন হাজারো প্রাণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় টাংগাইল ১১ নং সেক্টরের অধিনে ছিল।[১১৫]

এ এন হামিদুল্লাহ ও কর্ণেল তাহের ১১ নং সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন। তাদের অসামান্য নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধে পাকবাহিনীকে পরাজিত করেছে।[১১৬]

মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের মধুপুর বন, মধুপুর, গোপালপুর, পাকুঠিয়া, ঘাটাইল, কালিহাতি, টাংগাইল সখিপুর, মির্জাপুর, সখিপুরের বন প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হয়েছে।[১১৭]

পাকবাহিনীর সাথে সন্মুখ যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শাহাদৎ বরন করে। এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর হত্যা কান্ডের সাক্ষী বহন করে মধুপুর, ঘাটাইল, টাংগাইল, গোপালপুর এর গণকবর।[১১৮]

কাদেরিয়া বাহিনী, বাতেন বাহিনী ও সর্ব সাধারণ পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর টাংগাইল শত্রু মুক্ত হয়।[১১৯]

---

[১১৫] সূত্র : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

[১১৬] দে তপন কুমার, মুক্তিযুদ্ধে টাংগাইল, পৃ. ১০৯।

[১১৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

[১১৮] হায়দার, জুলফিকার রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ, পৃ. ১৬১।

[১১৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

কাদেরিয়া বাহিনী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। অর্থাৎ এটি বিশেষ কোন বাহিনীর সাথে কোন বাহিনীর যুদ্ধ নয়। বরং এটি পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ ছিল। ব্যক্তি পর্যায় থেকেও এ যুদ্ধে অনেক অংশ গ্রহণ করেছেন। এদের পুরোধা ব্যক্তি হলেন বঙ্গবীর আ: কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। তিনি ব্যক্তি পর্যায় থেকে যুদ্ধ করার মুল অনুপ্রেরণা ও পুরোধা ব্যক্তি।[১২০]
এজন্য তিনি 'বাঘা কাদের' নামেও পরিচিত।[১২১]

তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে টাংগাইল হতে প্রায় ৫০,০০০ হাজার মানুষকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণ দেন পরে গ্রামীণ অস্ত্র দ্বারা পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। অসামান্য কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনী প্রতিবারই জয় লাভ করে। মুলত গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করার কারণেই পাক বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হতো। ময়মনসিংহ হতে শুরু করে ঢাকার উত্তরভাগ পর্যন্ত ছিল তার যুদ্ধ ক্ষেত্র।[১২২]

যুদ্ধ করতে গিয়ে কাদের সিদ্দিকী কালিহাতির 'বাল্লা' গ্রামের কাছে 'মাকরার' যুদ্ধে আহত হন।[১২৩] যুদ্ধে তিনি পাকবাহিনীর একটি জাহাজ প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ আটক করেন ভূঞাপুরের সিরাজকান্দি গ্রামের নিকট হতে। এছাড়া তিনি কিছু সাজোয়া যান ও বুলেট প্রতিরোধী যুদ্ধ যান ও আটক করেন।[১২৪]

যুদ্ধের সময় তার বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল সখিপুর উপজেলার মহানন্দপুর গ্রামে যেখানে বর্তমানে "বিজয় স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়" অবস্থিত।[১২৫]

---

[১২০] হোসেন, আবু মো: দেলোয়ার মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ২য় খন্ড, পৃ. ৩৮৪।
[১২১] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৩৮৪।
[১২২] ঐ, পৃ. ৩৮৫।
[১২৩] সখিপুর ও মুক্তিযুদ্ধ, Bangla pedia
[১২৪] ঐ।
[১২৫] www.kakrajanup.Tangail.gov.bd/node/710733

Dhaka University Institutional Repository

১৬ই ডিসেম্বর এর আগেই এই বাহিনী টাংগাইলকে শত্রুমুক্ত করে ঢাকায় যায়। এবং ভারতীয় মিত্রদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১২৬] সখিপুর ও কাদেরিয়া বাহিনী।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কাদের সিদ্দিকী তার বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[১২৭]

২.৭ উপজেলাসমূহ

আলোচনার স্বার্থে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে টাংগাইলে মোট উপজেলা ১২টি। টাংগাইলের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে জানার আগে আমাদের এর উপজেলাসমূহ ও এদের সংক্ষেপে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া ভাল। তাই টাংগাইল জেলার উপজেলাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পেলাম–

১. মধুপুর*

মধুপুর টাংগাইল জেলার একটি উপজেলা টাংগাইল শহর হতে এর দূরত্ব ৫০ কি.মি.। উত্তরে জামালপুর, পূর্বে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে ঘাটাইল আর পশ্চিমে গোপালপুর ও ধনবাড়ি উপজেলা।[১২৮] মধুপুরের আয়তন ৩৭০.৪৭ বর্গ কি.মি.।[১২৯] উপজেলায় উন্নীত হয় ১৯৮৩ সালে। মধুপুর পৌরসভা ছাড়াও মোট ইউনিয়ন ১১টি। মৌজা ১৩১, গ্রামের সংখ্যা ২৬৬টি। মধুপুরের মোট জনসংখ্যা ২,৯৬,৭২৯ জন।[১৩০]

ভাওয়ালের গড় একটা অংশ মধুপুর অবস্থিত। ৮ হাজার হেক্টরের অধিক আয়তনের গড় অঞ্চল মধুপুরকে দিয়েছে বিশেষত্ব। রয়েছে শাল গাছ সহ নানান গাছ ও লতা

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

---

[১২৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

[১২৭] হোসেন আবু মো: দেলোয়ার মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, ২য় খন্ড পৃ. ৩৮৪।

[১২৮] www.g.Tangail.gov.com

[১২৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ১৫।

[১৩০] আদমশুমারী, ২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

গুল্মের বন। সুস্বাদু আনারস মধুপুরে জন্মে। মধুপুরের শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো। রয়েছে ১টি সরকারি কলেজ, ১টি সরকারি হাই স্কুল। এছাড়া মহিলা কলেজ ও স্কুল রয়েছে[১৩১] কলেজ ৬টি, স্কুল ২৪টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৬টি, আলিম ১টি সহ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১০৩টি। বংশী নদী মধুপুরের বুক চিড়ে বহমান।[১৩২]

দোখলা রিসোর্ট ও জাতীয় উদ্যান, আনন্দ মঠ আম্বাড়িয়া জমিদার বাড়ি, মদন গোপালের মন্দির হলো দর্শনীয় স্থান।

২. ধনবাড়ি*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর স্মৃতি ধন্য উপজেলা ধনবাড়ী। উপজেলাটি নবীন। টাংগাইল হতে ৬০ কি. মি. দূরে এ উপজেলা অবস্থিত।[১৩৩]

২০০৬ সালে ধনবাড়ী উপজেলায় উন্নত হয়। উত্তরে জামালপুর, পূর্বে মধুপুর, দক্ষিণে গোপালপুর এবং পশ্চিমে সরিষাবাড়ী উপজেলা।[১৩৪]

ধনবাড়ির মোট আয়তন ১৩০.৫০ বর্গ কি.মি.।[১৩৫]

ধনবাড়িতে একটি পৌরসভা সহ মোট ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে। জনসংখ্যা মোট ২,০৩,২৮৪ জন।[১৩৬]

ধনবাড়ি উপজেলায় একটি সরকারী কলেজসহ মোট ৮টি কলেজ, একটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়সহ মোট ২৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩টি মাদ্‌রাসা ও ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।[১৩৭]

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

---

[১৩১] www.Tangail.com

[১৩২] বাংলা পিডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

[১৩৩] Bangla pedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.gov.bd)

[১৩৪] wikipedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.gov.bd)

[১৩৫] ঐ

[১৩৬] আদম শুমারী ২০১১।

[১৩৭] উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

Dhaka University Institutional Repository

ঝিনাই নদী ধনবাড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ধনবাড়ি মসজিদ ও জমিদার বাড়ি এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

৩. গোপালপুর*

বাংলার বিখ্যাত জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর জমিদারী অন্তর্ভুক্ত ছিল আজকের গোপালপুর উপজেলা। টাংগাইল জেলা সদর থেকে ৫৫ কি.মি. দূরে ১৯১.৪৮ বর্গ কি.মি. আয়তন নিয়ে গঠিত হয়েছে গোপালপুর উপজেলা।[১৩৮] ১৯৮৩ সালে এটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। উত্তরে ধনবাড়ি, পূর্বে মধুপুর ও ঘাটাইল, দক্ষিণে ঘাটাইল ও ভূঞাপুর পশ্চিমে সরিষাবাড়ি ও জামালপুর সদর।[১৩৯]

এটি পৌরসভা সহ মোট ৭টি ইউনিয়ন নিয়ে গোপালপুর গঠিত। ১৯৭২ সালে গোপালপুর থানা হয়। গোপালপুরের মোট জনসংখ্যা ২,৫২,৩৩১ জন।[১৪০] সাক্ষরতার হার-৪৩%। একটি সরকারিসহ ৫টি কলেজ, ১টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সহ ৪৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ৪৬টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৫টি।[১৪১]

ঝিনাই, বৈরান হলো গোপালপুরের বুক চিড়ে বয়ে চলা নদী।

হেমনগর জমিদার বাড়ি, ২০১ গম্বুজ মসজিদ গোপালপুরের দর্শনীয় স্থান।[১৪২]

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

[১৩৮] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Gopalpur.com)

[১৩৯] গোপালপুর উপজেলা, উইকিপিডিয়া।

[১৪০] আদমশুমারী, ২০১১।

[১৪১] ঐ

[১৪২] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ঘাটাইল*

টাংগাইল জেলা সদর হতে ৩০ কিমি উত্তরে ঘাটাইল উপজেলা অবস্থিত। 'শহীদ সালাহ উদ্দিন সেনানিবাস' ঘাটাইল উপজেলা শহরের অদূরে অবস্থিত। উত্তরে গোপালপুর ও মধুপুর দক্ষিণে কালিহাতি ও সখিপুর, পূর্বে ফুল বাড়িয়া ও ভালুকা, পশ্চিমে গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলা।[১৪৩] ঘাটাইলের আয়তন ৪৫১.৭১ বর্গ কি.মি.।

জনসংখ্যা ৪,৩৪,৩০০ জন।[১৪৪]

১টি পৌরসভাসহ ঘাটাইলে মোট ১৪টি ইউনিয়ন রয়েছে।[১৪৫]

একটি সরকারি ও ১টি মহিলা সহ মোট ৭টি কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৩টি মাদ্‌রাসা ৩২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৯টি।[১৪৬] সাক্ষরতার হার ৪৪%। ঘাটাইল উপজেলা ঝিনাই ও বৈরান নদী বিধৌত। সাগর দিঘী ও রাজবাড়ি, ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট, পাকুটিয়া জমিদার বাড়ি, পাকুটিয়া খোকা সাধুর আশ্রম হলো উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

৫. কালিহাতি*

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠক শাহজাহান সিরাজের জন্মভূমি কালিহাতি উপজেলা। জেলা শহর হতে ২০ কি.মি. দূরে অবস্থিত এ উপজেলা। উত্তরে ঘাটাইল, পূর্বে সখিপুর, দক্ষিণে টাংগাইল সদর আর পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ অবস্থিত।[১৪৭]

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

---

[১৪৩] উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

[১৪৪] আদম শুমারী, ২০১১।

[১৪৫] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.gov.bd)

[১৪৬] ঐ

[১৪৭] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার মোট আয়তন ৩০১.২২ বর্গ কিমি. [১৪৮]

উপজেলার জনসংখ্যা ৩,৭৬,৪০৭ জন।[১৪৯]

উপজেলাটি ২টি পৌরসভাসহ মোট ১৩টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।[১৫০]

১টি সরকারিসহ মোট ৭টি কলেজ।

১টি সরকারিসহ মোট ৪৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি টেক্সটাইল কলেজ আছে।[১৫১]

যমুনা বংশাই, ধলেশ্বরী, সাপাই, ঝিনাই নদী বিধৌত উপজেলা কালিহাতি। যমুনা সেতু, কাদিম হামজানি মসজিদ, বল্লা তাঁত শিল্প এলাকা, চারান বিল প্রভৃতি কালিহাতির দর্শনীয় স্থান।[১৫২]

৬. ভূঞাপুর*

বুকে অসীম স্রোত নিয়ে বলে চলা যমুনা নদীর তীর ঘেঁষা উপজেলা ভূঞাপুর। উপজেলাটি জেলা শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। উত্তরে গোপালপুর উপজেলা ও সরিষাবাড়ী উপজেলা, পূর্বে গোপালপুর, ঘাটাইল ও কালিহাতি, দক্ষিণে কালিহাতি আর পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ।[১৫৩]

মোট আয়তন ১৩৪.৪৬ বর্গ কি.মি.।

১টি পৌরসভা ও ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১,৯০,৯১০ জন।[১৫৪] ১টি সরকারিসহ ৭টি কলেজ, ২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

[১৪৮] বার্ষিক রিপোর্ট-২০১৪।

[১৪৯] আদমশুমারী-২০১১।

[১৫০] উইকিপিডিয়া, ভূঞাপুর (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১৫১] খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার, সম্পাদিত টাংগাইল, জেলায় স্থান, নাম, বিচিত্রা, পৃ. ২৫৩।

[১৫২] ঐ, পৃ. ২৫৩।

[১৫৩] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

[১৫৪] আদমশুমারী-২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা ২২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭টি।[১৫৫] যমুনা, ঝিনাই, ধলেশ্বরী, নদী এই ভূঞাপুরের বুক চিড়ে সতত প্রবাহমান।

যমুনা সেতু, এলেংগা রিসোর্ট এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।[১৫৬]

৭. টাংগাইল সদর*

ঢাকা থেকে ৯৬ কি.মি. দূরে সুস্বাদু চমচমের মিষ্টতা ছড়ানো উপজেলা টাংগাইল সদর। রনদা প্রসাদ সাহা ও মাওলানা ভাসানীর স্মৃতি ধন্য এ উপজেলাটি টাংগাইলের মধ্যমনি। উত্তরে কালিহাতি, পূর্বে বাসাইল ও সখিপুর, দক্ষিণে দেলদুয়ার ও নাগরপুর এবং পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ জেলা।[১৫৭]

উপজেলাটির মোট আয়তন ৩৩৪.২৬ বর্গ কি.মি.।[১৫৮] ১৯৮৩ সালে এটি উপজেলায় রুপান্তরিত হয়। ১টি পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয়েছে এ উপজেলা।[১৫৯] যেখানে মোট ৫,২১,১০৪ জন মানুষের বসবাস।[১৬০] শিক্ষায় বরাবরই টাংগাইল এগিয়ে এর ধারাবাহিকতায় ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ১টি মেডিকেল কলেজ সহ মোট সরকারি কলেজ ৪টি। বেসরকারী কলেজ ১০টি। উচ্চ বিদ্যালয় ৫১টি, মাদরাসা ৪৩টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৯টি।[১৬১] যমুনা, ধলেশ্বরী, এলেংজানি, লৌহজং নদী এ উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

মাওলানা ভাসানীর মাজার, করটিয়া জমিদার বাড়ি, কাপড়ের হাট, সন্তোষে বিশ্ববিদ্যালয় এ উপজেলার অন্যতম আকর্ষণ।[১৬২]

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

---

[১৫৫] এক নজরে ভূঞাপুর।

[১৫৬] খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার, সম্পাদিত, টাংগাইল জেলার স্থান, নাম, বিচিত্রা, পৃ. ৩৮৪।

[১৫৭] এক নজরে টাংগাইল সদর, মুক্ত বিশ্বকোষ, উইকিপিডিয়া।

[১৫৮] আদম শুমারী-২০১১।

[১৫৯] www.Tangail.gov.bd.com

[১৬০] কামাল মাহমুদ, টাংগাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী, পৃ. ১৩৪।

[১৬১] www.Tangail. gov.bd.com

[১৬২] কামাল মাহমুদ, টাংগাইলের স্মরণীয়, বারো মনীষী, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৮. নাগরপুর*

যমুনা নদীর তীরবর্তী উপজেলা নাগরপুর উত্তরে টাংগাইল সদর ও দেলদুয়ার, দক্ষিণে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর ও সাটুরিয়া, পূর্বে মির্জাপুর ও ধামরাই উপজেলা পশ্চিমে চৌহালি ও শাহজাদপুর উপজেলা।[১৬৩]

১৯৮৩ সালে উপজেলায় উন্নীত হয় নাগরপুর মোট ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৫৮,৪৩১ জন।[১৬৪]

একটি সরকারি কলেজসহ ৩টি কলেজ, ৩০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১২৩টি মাদ্‌রাসা, ১৫৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।[১৬৫]

যমুনা ধলেশ্বরী, লৌহজং এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী।

যাদব সাহেবের বাড়ি ও নাগরপুর জমিদার বাড়ি এ উপজেলার অন্যতম দর্শনীয় স্থান।[১৬৬]

৯. দেলদুয়ার*

উত্তরে টাংগাইল সদর এবং বাসাইল, দক্ষিণে নাগরপুর, পূর্বে মির্জাপুর, পশ্চিমে নাগরপুর ও টাংগাইল সদর এর ঠিক মধ্যভাগে ১৮৪.৫৪ বর্গ কি.মি. জায়গা নিয়ে গঠিত হয়েছে দেলদুয়ার উপজেলা।[১৬৭]

১৯৮৩ সালে থানাটি উপজেলায় উন্নীত হয়। পৌরসভা বিহীন মোট ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১,৮৮,৪৪৯ জন।[১৬৮]

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

---

[১৬৩] এক নজরে নাগরপুর, উইকিপিডিয়া (www.Tangail.bd.)

[১৬৪] আদমশুমারী-২০১১।

[১৬৫] একনজরে নাগরপুর, উইকিপিডিয়া (www.Tangail.bd.)

[১৬৬] ঐ

[১৬৭] এক নজরে দেলদুয়ার, উইকিপিডিয়া (www.Tangail.bd.)

[১৬৮] আদম শুমারী-২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সরকারি কলেজসহ ৫টি কলেজ, একটি সরকারি সহ ৩৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এ উপজেলায়।[১৬৯]

ধলেশ্বরী নদী ও গুমলি খাল হলো এখানকার প্রধান জলাশয়।

দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে আতিয়া জামে মসজিদ হলো অন্যতম। এছাড়া দেলদুয়ার জমিদার বাড়ি, হিমাঙ্গনগর রাজবাড়ি অন্যতম।[১৭০]

১০. বাসাইল*

টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলার আয়তন ১৫৭.৭৮ বর্গ কি.মি.। যার উত্তরে কারিহাতি উপজেলা, দক্ষিণে মির্জাপুর ও দেলদুয়ার, পূর্বে সখিপুর ও পশ্চিমে দেলদুয়ার ও টাংগাইল সদর উপজেলা অবস্থিত।[১৭১]

বাসাইল উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১,৬০,৩৪৬ জন।[১৭২]

১৯৮৩ সালে বাসাইল উপজেলায় উন্নীত হয়। পৌরসভাবিহীন এ উপজেলার মোট ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। ৩টি কলেজ, ২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯টি মাদ্‌রাসা, ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছে উপজেলার পাঠদান কার্যক্রম।[১৭৩]

বংশী, লৌহজং, লাংলী এ উপজেলার প্রধান নদী।

বিমান বাহিনীর পাহাড়কাঞ্চনপুর ঘাটি এ উপজেলায় অবস্থিত।[১৭৪]

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

[১৬৯] অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com

[১৭০] বাংলা পিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১৭১] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১৭২] বাসাইল উপজেলা(অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১৭৩] অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com

[১৭৪] এক নজরে সখিপুর (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

Dhaka University Institutional Repository

১১. সখিপুর*

বাংলার সূর্য সন্তান বঙ্গবীর আঃ কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর জন্মভূমি সখিপুর উপজেলা।

উত্তরে ঘাটাইল, দক্ষিণে মির্জাপুর ও গাজীপুরের কালিয়াকৈর, পূর্বে ময়মনসিংহের ভালুকা এবং পশ্চিমে কালিহাতি ও বাসাইল উপজেলা।[১৭৫] ৯৮৩ সালে উপজেলায় উন্নীত হয়। একটি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৭৫,৯৮৬ জন।[১৭৬]

এ উপজেলার মোট আয়তন ৪২৯.৭৮ বর্গ কি.মি.।[১৭৭]

কলেজ ৫টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৪৫টি মাদ্‌রাসা ২৭টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২৭টি।[১৭৮] ধলেশ্বরী, বংশী এ উপজেলার নদী। হযরত কামাল (র.) এর মাজার ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেন্দ্র হল দর্শনীয় স্থান।[১৭৯]

১২. মির্জাপুর*

বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির উপজেলাগুলোর মধ্যে মির্জাপুর অন্যতম। এটি বর্তমানে টাংগাইলের শিল্প নগরীতে পরিণত হয়েছে। উত্তরে টাংগাইলের বাসাইল ও সখিপুর, পূর্বে গাজীপুরের কালিয়াকৈর, দক্ষিণে ঢাকার ধামরাই আর পশ্চিমে দেলদুয়ার ও নাগরপুর উপজেলা অবস্থিত।[১৮০] উপজেলাটি ১৯৮২ সালে গঠিত। ১টি পৌরসভা ও

* মূল অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠা নং vii দ্রষ্টব্য।

---

[১৭৫] আদম শুমারী-২০১১।

[১৭৬] ঐ।

[১৭৭] এক নজরে সখিপুর (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১৭৮] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ২৬।

[১৭৯] এক নজরে মির্জাপুর (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১৮০] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

Dhaka University Institutional Repository

১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে মির্জাপুর উপজেলা গঠিত যার মোট আয়তন ৩৭৩.৮৮ বর্গ কি.মি.।[১৮১]

মোট জনসংখ্যা ৪,২৩,৭০৮ জন।[১৮২]

দেশের এক নম্বর ক্যাডেট কলেজ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এ উপজেলায় অবস্থিত। এছাড়া ৭টি কলেজ, ৪৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯টি মাদ্‌রাসা ও ১৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।[১৮৩] সাক্ষরতার হার-৪৫.৫%।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দাতব্য সংস্থা "কুমুদিনী ট্রাস্ট" এ উপজেলায় অবস্থিত।[১৮৪]

দেশের সর্বাধুনিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট 'কুমুদিনী' এ উপজেলায় অবস্থিত।[১৮৫]

২.৮ অধিবাসীদের পরিচয়

জেলার অধিকাংশ লোকের জাতিগত উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জাতিবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনেকাংশে অনুমান ভিত্তিক। কয়েকজন জাতিবিজ্ঞানী উপজাতীয়দের উৎপত্তি নিয়ে সযত্ন গবেষণা করেছেন। প্রাপ্ত মতবাদের ভিত্তিতে বলা যায়, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী তিব্বত-বর্মীদের মিশ্রণ বিশিষ্ট প্রাক-আর্য অস্ট্রীক বা হেড্ডিড নগরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত।[১৮৬] পরবর্তী গুরুত্বপুর্ণ জাতিগত উপাদান এসেছে আদি নার্ভিক বা তথাকথিত আর্য জাতির রক্তধারার প্রভাব ক্ষীণ হলেও উজ্জ্বল গাত্র বর্ণ, খাড়া নাক ও কপাল, কোঁকড়ান ও নরম চুল এবং মাথার খুলির গঠন দেখে বোঝা যায় যে, এ রক্তধারার কিছু প্রভাব এ জেলার অধিবাসীদের উপর কিছুটা পড়েছে।[১৮৭]

---

[১৮১] এক নজরে মির্জাপুর, উইকিপিডিয়া।

[১৮২] আব্দুর রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ৫৩।

[১৮৩] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

[১৮৪] আব্দুর রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ৫৩।

[১৮৫] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

[১৮৬] ঐ, পৃ. ৩৫।

[১৮৭] ঐ, পৃ. ৩৫।

এর ফলে মুসলমান আমলে তুর্কী, ইরানি, আরবদেশীয় রক্তধারার প্রভাব এ অধিবাসীদের উপর বিশেষ করে মুসলমানদের উপর যথেষ্ট পড়েছে। তবে শেষোক্ত এই রক্তধারাও মিশ্র।[১৮৮]

নৃ-তাত্ত্বিক উৎপত্তি সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসের সঙ্গে অভিন্ন বলা যায়। কারণ মুসলমান আমলে এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে বৃত্তিভিত্তিক বর্ণবিভাগ ছিল।[১৮৯] এখানকার জনগণের দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের দিক ইঙ্গিত করে। এ জেলায় মধুপুর অঞ্চলে মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কিছু লোক বাস করে। এদের রক্তধারা অনেকটা অবিমিশ্রণ।[১৯০]

টাংগাইল জেলার মধুপুর গড় এলাকায় বেশ কিছু উপজাতির লোক বসবাস করে যাদের অধিকাংশই গারো অল্প কিছু 'বর্মন' জনগোষ্ঠী।[১৯১]

গারো পাহাড়ের বিপরীতে আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে বাসরত উপজাতিরা দেখতে মধুপুরের গারোদের মত। এবং এরা মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভূত।[১৯২] এদের গায়ের রং ফর্সা। মাথার চুল কোকড়ান, দাঁড়ি, গোঁফ, কম, মাঝারি উচ্চতা, নাক বোচা, চোখ ছোট ছোট।[১৯৩]

২.৯ জেলার নামকরণের ইতিহাস

প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ টাংগাইলের বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের নিকট যতটা পরিষ্কার, এর নামকরণের ইতিহাস আমাদের নিকট ততটা অপরিষ্কার। কারণ এ নিয়ে প্রচলিত আছে বহু মত। কোনটা গবেষণার ফলাফল আবার কোনটা বানোয়াট কল্পকাহিনী।

---

[১৮৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫।
[১৮৯] ঐ, পৃ. ৩৫।
[১৯০] ঐ, পৃ. ৩৬।
[১৯১] ঐ, পৃ. ৩৬।
[১৯২] ঐ, পৃ. ৩৬।
[১৯৩] ঐ, পৃ. ৩৬।

টাংগাইলের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কয়েকটি মত আলোচনা করছি–

১. ইতিহাসবিদ আ: রহিমের মতে,

এ অঞ্চলের লোকেরা, উঁচু, শব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দটা বেশি ব্যবহার করে। 'আইল' শব্দের অর্থ হলো সীমানা নির্দেশক। এমতাবস্থায় 'টান আইল' মানে হলো 'উচু আইল'। আর এই 'টান আইল' শব্দ হতেই 'টাংগাইল' শব্দের উৎপত্তি।[১৯৪]

২. ইতিহাসবিদ খুররম হোসাইনের মতে,

শায়েস্তা খানের আমলে মগদের দমন করার জন্য ভারত হতে 'মোপলা' নামক যোদ্ধা জাতিকে আনা হয় এবং মগদের দমন শেষে তাদের ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতে দেওয়া হয়। এই মোপলাদের ধর্ম গুরুর নাম 'তাংগাইল'। এই ধর্মগুরুর নাম থেকেই ঐ স্থানের নাম হয়েছে টাংগাইল।[১৯৫]

৩. একদল আধুনিক গবেষক মনে করেন যে, টাংগাইল শব্দটি কৃষির সাথে সম্পর্কিত। স্থানীয়ভাবে এখানকার উচু জমি 'টান' জমি নামে পরিচিত। এই টানের সাথে আইল শব্দটি যুক্ত হয়ে হয়েছে 'টান আইল' যা পরে টাংগাইলে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানকার অনেক নামের সাথে 'আইল' শব্দটি যুক্ত। যেমন- বাসাইল, ঘাটাইল, ডুবাইল, রামাইল, নিকরাইল প্রভৃতি।[১৯৬]

৪. অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'টান' এবং 'ইল' নামক দুজন ইংরেজ সাহেব সন্তোষ জমিদারিতে এসেছিলেন। তারা এসেছিলেন মূলত থানার স্থান নির্ধারণ করতে। পরবর্তীতে তাদের দুই জনের নাম অনুসারে স্থানের নাম হয়েছে টাংগাইল।[১৯৭]

---

[১৯৪] খন্দকার, আ: রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, (টাংগাইল, যমুনা প্রকাশনী, ১৯৭৭), পৃ. ১৩।

[১৯৫] টাংগাইল নাম করনের ইতিহাস।

[১৯৬] টাংগাইল নাম করনের ইতিহাস, মুক্ত বিশ্বকোষ, উইকিপিডিয়া।

[১৯৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৫. খন্দকার আ: রহিম লিখেছেন,

আটিয়া পরগনার জমিদারের যাতায়াতের জন্য খোসন্দপুর থেকে এনায়েতপুর পর্যন্ত উচু রাস্তা (টান আইল) নির্মাণ করা হয়। স্থানীয়রা একে 'টান আইল' বলে ডাকতো বা বলত সেই থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে টাংগাইল।[১৯৮] টাংগাইলের নামকরণ নিয়ে আমরা বেশ কয়েকটা মতামত জানলাম। মতামত যতই থাকুক, 'টান আইল' শব্দ হতেই 'টাংগাইল' নামকরন হয়েছে বলে যে দাবি ইতিহাসবিদ করেছেন এটাই সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক।

২.১০ টাংগাইল জেলার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও গঠন প্রণালী

আজ থেকে ৫০০০ বা ৫৫০০ বছর পূর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। শুধুমাত্র মধুপুরের ভাওয়াল গড়ের অস্তিত্ব ছিল। যেহেতু এটি প্রাচীন ভূখন্ড অতএব নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, এই অঞ্চলের মানব বসতির সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থাও প্রাচীন।[১৯৯]

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাং' তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বঙ্গভূমিকে যে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন।[২০০] এর মধ্যে ২য় ভাগে পড়েছে বর্তমানের টাংগাইল জেলা। আধুনিক ইতিহাসবিদের প্রদত্ত তথ্য মতে, টাংগাইল জেলা পাল ও সেন শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে।[২০১]

তারা আরো দাবি করেন, টাংগাইলের মধুপুর পাল রাজা ভবদত্তের রাজত্বের অংশ ছিল।[২০২]

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলা বিজয়ের পর এই সমুদয় অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০৩]

---

[১৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[১৯৯] খন্দকার আ: রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭।

[২০০] ঐ, পৃ. ৩৮।

[২০১] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[২০২] ঐ, পৃ. ৩৮।

[২০৩] বাকের মুহাম্মদ (সপা: টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২৫।

ফিরোজ শাহ ময়মনসিংহে যে আধিপত্য বিস্তার করেন তা, তাঁর রাজত্বের একটি অন্যতম গৌরব উজ্জ্বল দিক। এরপর ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ও টাংগাইলের উপর তাঁর আধিপত্য ধরে রাখেন। ভারতে মুঘল শাসনের সময় (১৫২৬-১৮৫৮) টাংগাইল চলে যায় বাংলার ভুঁইফোড় জমিদারদের হাতে যারা বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত।[২০৪]

১৫৭২ সালে বাদশা আকবর বাংলা অভিযান পরিচালনা করেন এবং ১৫৭৬ সালে বাংলা অধিকার করেন। ফলে টাংগাইল মুঘলদের অধিকারে চলে যায়।[২০৫]

আব্দুল ফজল তাঁর 'আকবরনামা' গ্রন্থ।[২০৬]

বর্তমান টাংগাইলের স্থানে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- আটিয়া, বড় বাজু, পুখুরিয়া, কাগমারী প্রভৃতি। যা বর্তমানে টাংগাইল হিসেবে পরিচিত।

বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত টাংগাইল শানসতান্ত্রিকভাবে প্রাচীন আসামের অন্তর্ভুক্ত কামরুপ রাজ্যের অংশ ছিল।[২০৭]

১৭৭৬ সালে মীর কাসিম বাংলার নবাব হওয়ার পর খাজনা আদায়ের জন্য যে ভূমি বন্দোবস্ত করেন, তাতে আতিয়া, কাগমারী, বড়বাজু ইত্যাদি পরগনার উল্লেক পাওয়া যায়।[২০৮] তবে সেখানে টাংগাইলের নাম পাওয়া যায় না।

১৭৭৮ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্রেও 'টাংগাইল' নামের উল্লেখ নেই।[২০৯] পলাশী যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণের পর এ দেশে সর্ব প্রথম ভূমি জরিপ করা হয় ১৭৮৮ সালে।[২১০]

---

[২০৪] বাংলার ইতিহাস, পৃ. ১৪৭।

[২০৫] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৪৭।

[২০৬] খন্দকার আ: রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[২০৭] আকবর নামা সম্রাট আকবর এর সভাসদ ও সহচর আব্দুল ফজল কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ। যাতে সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের পুরো বিবরণ উল্লেখ করা আছে। আকবর ও তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস জানার জন্য এটি একটি আঁকড় গ্রন্থ।

[২০৮] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

[২০৯] ঐ, পৃ. ৩৪।

[২১০] ঐ, পৃ. ৩৪।

সেখানেও টাংগাইলের নামের কোন উল্লেখ নেই।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই জনপদ ও তার মানব বসতির ইতিহাস যতটা প্রাচীন এর নাম অর্থাৎ 'টাংগাইল' নামটি ততটা প্রাচীন নয়। ১৮৪৫ সালে শাসন কাজে সুবিধার জন্য জামালপুর মহকুমা সৃষ্টি সহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকে ২টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. সদর বিভাগ
২. জামালপুর বিভাগ।[২১১]

উল্লেখ্য ময়মনসিংহহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৭ সালে।[২১২]

সদর বিভাগের অধীনে নাসিরাবাদ, গাবতলী, মধুপুর, নেত্রকোনো, ঘোষগাঁ, ফতেপুর, গফরগাঁও, মাদারগঞ্জ, নিকলা ও বাজিত থানাসমূহ। এবং জামালপুর বিভাগের অধীনে শেরপুর, হাজিগঞ্জ, পিংনা থানাসমূহ ছিল।[২১৩] আতিয়া পরগনার অঞ্চলসমূহ তখন ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২১৪]

১৮৫০ সালে ২য় বার ভূমি জড়িপের সময়ও টাংগাইল নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রেনেলের মানচিত্রে 'আতিয়া' নামের উল্লেখ ছিল।[২১৫] ১৮৬৬ সালে সরকার 'পারদিখুলিয়া' মৌজায় 'টান আইল' (পরে যা রূপান্তরিত হয়ে টাংগাইল নাম ধারন করেছে) থানার পত্তন করেন এবং ১৮৬৯ সালে আতিয়া পিংনা ও মধুপুর থানার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, 'আতিয়া মহকুমা'। ১৮৭০ সালের ১৫ নভেম্বর আতিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হলে টাংগাইল নামের ব্যাপ্তি ঘটে।[২১৬]

---

[২১১] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
[২১২] ঐ, পৃ. ৩৪।
[২১৩] E barta, Tangail.com
[২১৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
[২১৫] ঐ, পৃ. ৩৫।
[২১৬] ঐ, পৃ. ৩৫।

এরপর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি টাংগাইল নামক এই জনপদকে। আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হতে থাকে এই জনপদ। পরবর্তীতে এটি ময়মনসিংহ জেলার অধীনে ‘মহকুমায়’ রূপান্তরিত হয়। সর্বশেষ ১৯৬৯ সালের ১লা ডিসেম্বর টাংগাইল জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ

সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ সত্ত্বার সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক ইতিহাসের প্রভাব পড়ে।[১]

কোন দেশকাল বন্ধ এর নারীর জনন-কল্পনা, ধ্যান ধারণা, চিন্তাভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্ম-বাস, শিল্পকলা-জ্ঞান বিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং উহাদের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্চার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়।[২]

তাই যেকোন স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবন সংস্কৃতি জানতে গেলে তার প্রত্যাহিক জীবন যেমন, জেলার অধিবাসীদের পরিচয় বাসগৃহ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার এবং সামাজিক উৎসব প্রভৃতি জীবনের অত্যাবশ্যকীয় দিবসগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন। টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণের জন্য এই দিকগুলো উক্ত অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

৩.১ অধিবাসীদের পরিচয়

ইতিহাস অনুসারে আদি অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, অ্যালপাইন প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠীয় সমন্বয়ে বাঙালি জাতি সত্ত্বার বিকাশ ঘটে।[৩]

নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন, বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক বা জাতিগত উৎস সম্ভবত আদি অস্ট্রালয়েড (proto Aus troloid) জনধারা। বাঙ্গালীর নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাসে দেখা যায়, আদি অস্ট্রালয়েড জনধারাই এ অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেছে। এবং

---

[১] 'ভূমিকা' সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ৩য় খন্ড, (ঢাকা, এশিয়াটি, সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩।

[২] নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (কলকাতা; দেজ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ (বাংলা) পৃ. ৩।

[৩] বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান, পৃ. ৩০।

নৃ-তাত্ত্বিক বুনিয়াদ গঠন করেছে। বাংলাদেশের ওরাঁও, মুন্ডা, কোলং, সাঁওতাল এদের উত্তর সুরি। পুন্ড্রবর্ধনের ইতিহাসে জানা যায়, প্রায় ৩,৫০০ বছর আগে তারা ব্রহ্মপুত্র, নদের পাশে বসতি স্থাপন করে।[৪]

এই জনপদের অধিকাংশ অধিবাসী তিব্বত বর্মীদের মিশ্রণ বিশিষ্ট প্রাক-আর্য অস্ট্রীক বা হেড্ডিড নরগোষ্টীর অন্তর্ভুক্ত।[৫]

যেহেতু এই অঞ্চলে বহিরাগত শাসকদের আধিপত্য ছিল তাই মুসলমান শাসন আমলে তুর্কী, ইরানি ও আরব দেশীয়, রক্তের প্রভাবও বিদ্যমান আছে।

এই জেলার মধুপুর উপজেলায় গারো, নামক উপজাতি সম্প্রদায় বাস করে যারা ময়মনসিংহ ও আসামের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এসেছে।

৩.২ টাংগাইলের গারো সম্প্রদায়

টাংগাইল জেলার গারোরা মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভুত।[৬] গারো পাহাড়ের বিপরীতে ভারতের আসামের উপজাতিদের সঙ্গে এদের মিল আছে। টাংগাইলের গারো জনগোষ্ঠী সমতলে বাস করে। এরা নিজেদের 'মান্দি' অর্থাৎ মানুষ নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। মূলত গারো পাহাড়ের আশে পাশে থাকে বলেই এদের নাম গারো। প্রধানত গারোরা ২ ভাগে বিভক্ত। (i) পাহাড়ি গারো ঃ এরা ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা-(১) অউ (২) আবেঙ্গ (৩) দুয়াল

(ii) সমতলের গারোঃ এরাও ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) মোমিন (২) মারাক (৩) সাংমা।[৭]

---

[৪] বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, মুহাম্মাদ মাছুদুর রহমান, পৃ. ৩০।

[৫] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ৩৫।

[৬] ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[৭] দিপা নেকলা, মধুপুর, টাংগাইল, ১৯.০২.১৯।

[দিপা নেকলা টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বাসিন্দা এবং ঐ সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রবন্ধকার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ১৯/০২/২০১৯ তারিখে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর সাক্ষাতকার নিয়ে অভিন্দর্ভের সংশ্লিষ্ট অংশে ঐ তথ্য সন্নিবেশ করেন।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, অভিন্দর্ভের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবন্ধকার টাংগাইলের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথেও সাক্ষাত করেন এবং সংশ্লিষ্ট অংশের তথ্য তাঁর সাথে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে সন্নিবেশ করেন। যা সংক্ষেপে দিপা নেকলা (৩০), পিরোজপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ১৯/০২/২০১৯ এভাবে পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করা হবে।]

ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিক্তি করে গারোদের সর্বপ্রাণবাদী (aminist) বলা হয়। তাদের ধর্ম বিশ্বাস পূর্বপুরুষ পূজা এবং প্রাকৃতিক শক্তির পূজা। গারোদের প্রধান দেবতার নাম তাতারা-রাবুগা।[৮] তবে বর্তমানে গারোদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ৬০% গারো খ্রিস্টান বাকী ৪০% সর্বপ্রাণবাদী।[৯]

গারোদের গায়ের রং ফর্সা, আকৃতি মাঝারি, নাক বোচা, দাঁড়ি-গোঁফ কান, মোটা ও সমার্থবান শরীর, চুল কোঁকড়ান।

গারোদের প্রধান উৎসব ওয়ানগালা। গারোরা বিয়ের অনুষ্ঠান যুব জমকালোভাবে করে। গারো পরিবারের সামাজিক গঠন মাতৃতান্ত্রিক সকল সম্পত্তির মালিক মা আর উত্তরাধিকারী মেয়ে। অর্থাৎ বিয়ের পর গারো পুরুষরা শশুড় বাড়ী বসবাস করে। উপার্জন করে নারী আর বাচ্চা সামলায় পুরুষ।[১০]

কৃষিকাজ গারোদের প্রধান জীবিকা। বর্তমানে তারা সমতলে চাষাবাদ করে। নারীপুরুষ উভয়ই তারা কাজ করে থাকে। বাঙালীদের মতই ফসল ফলায় তারা।

বর্তমানে কিছু গারো শিক্ষিত হচ্ছে করছে সরকারী, বেসরকারী চাকরি। গারো নারীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করছে বিউটি পার্লারে।

ঢাকার অধিকাংশ বিউটি পার্লার এখন মধুপুরের গারো দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মান্দি বা আচিক ভাষায় কথা বললেও গারোরা পড়ালেখা করে বাংলা ভাষায়। কারণ গারো ভাষার কোন বর্ণ নেই।

গারোদের উপজাতির পোশাক থাকলেও এখন তারা সমতলের মানুষের মত লুঙ্গি শাড়ি, পরছে। তবে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও গহনাও তারা পরিধান করে।

গারোরা সব ধরনের খাবার স্বাচ্ছন্দ্র খায় তাই তাদের সর্বভুক্ত শ্রেণি বলে গণ্য করা হয়। মদ হল গারোদের প্রিয় পানীয়।[১১]

---

[৮] প্রাঞ্চন নবারেক, ৩০, পিরোজপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ১৯.০২.১৯।

[৯] ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[১০] ডেবিড মাংসাং, ৪৫, মধুপুর, টাংগাইল, ১৯.০২.১৯।

[১১] এন্টত্রিও, ১৫, রেডিকাইদ, মধুপুর, টাংগাইল, ১৯.০২.১৯।

গারো উপজাতিদের জীবন আচারের মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রম হলো মানুষ মারা যাবার পর তারা কাঁদে না। এটি মোটামুটি আনন্দের বিষয়। মৃত গারোকে বসিয়ে মাঠি চাপা দেওয়া হয় এবং তার ব্যবহৃত সকল দ্রব্যাদি করবে দিয়ে দেওয়া হয়।[১২]

মধুপুরের চুনিয়া, পিরোজপুর, জলছত্র, পচিশ মাইল, বেরিবাইদ, দোখলা, শোলাকুড়ি, কুলিয়াকুড়ি, হরিনধরা প্রভৃতি স্থানে গারো উপজাতি বাস করে।

এছাড়াও মধুপুর আদি বা নামক একটি নৃ-গোষ্ঠীর অল্প কিছু লোকসংখ্যা বাস করে।

৩.৩ বাসগৃহ

বাড়িঘর সাধারণত কাঠ, বাঁশ, টিন ও মাটি দিয়ে তৈরি এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা কৃষিভিত্তিক বলে বাড়ি ঘর তৈরিতে কৃষি নির্ভর প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার বেশি। তবে সভ্যতা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াও এখন শহরের পাশাপাশি গ্রামেও ইটের দালান বা বাড়ি গড়ে উঠেছে। এতে করে পালটাচ্ছে গ্রামের চিত্র।[১৩]

নির্মাণের উপকরণ ও ধরন অনুযায়ী বাসগৃহের প্রকারভেদ ঃ ৪ ধরনের বাসগৃহ লক্ষ্য করা যায় যথা-

(১) মাটির বাড়ি

(২) সনের বাড়ি

(৩) টিনের বাড়ি

(৪) ইটের বাড়ি

১. মাটির বাড়ি ঃ

টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় মাটির বাড়ি বেশি। এছাড়া ধনবাড়ী ও ঘাটাইলে অল্প পরিমাণে মাটির বাড়ি বিদ্যমান আছে। গরমকালে ঠান্ডা আর শীতকালে গরম

---

[১২] দিপা নেকলা, ৩০, মধুপুর, টাংগাইল, ১৯.০২.১৯।

[১৩] শেখ মো: আ: জলিল, ৬০, মধুপুর, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

অনুভূত হওয়ার জন্য মাটির বাড়ি জনপ্রিয়। এছাড়া এই এলাকায় এঁটেল মাটি থাকার কারণে মাটির বাড়ি সহজে তৈরি করা যায়। মাটির বাড়ি তৈরি করতে টিন, কাঠ ও মাটি প্রয়োজন হয়। এতে নির্মাণ ঘরচ অপেক্ষাকৃত কম। অধিক সহনশীল ও টেকসই হওয়ার এ অঞ্চলের মানুষ যুগযুগ ধরে মাটির বাড়িতে বাস করছে।[১৪]

মধুপুর, ঘাটাইল এর মানুষজন সনের ঘড়ে থাকতে পছন্দ করে এবং এই অঞ্চলে সন সহজলভ্য হওয়ায় সনের গড়ের প্রচলন আছে। এই ঘড় ২ চালা অথবা চারচালা হয়ে থাকে।[১৫] এই ঘড় নির্মাণ করতে লাগে সন আর বাঁশ, তাই নির্মাণ খরচ কম। পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ায় এর কদর বেশি।

৩. টিনের ঘড় ঃ

টিনের ঘর টাংগাইলে বেশি। দুই চালা ও চারচালা ২ রকমের ঘড় আছে। এই ধরনের ঘড় নির্মাণে টিন, বাঁশ, কাঠ দরকার হয়। নির্মাণ খরচ মাটি ও সনের চাইতে বেশি। তবে ঘড় তৈরির উৎকৃষ্ট মাটি ও সনের অভাবে এই টিনের বাড়িই এই অঞ্চলে বেশি প্রচলিত।[১৬]

৪. ইটের বাড়ি ঃ

ইট দিয়ে নির্মিত বাড়িই ইটের বাড়ি নামে পরিচিত। সত্যতার বিকাশ, প্রযুক্তির উন্নতি এবং মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে এই রকম বাড়ি নির্মাণ হু হু করে বাড়ছে নির্মাণ ভেদে ইটের বাড়ি ও ২ ধরনের হয় সেমি বা আধা পাকা আর ফুল পাকা বা দালান। অর্থাৎ ইটের দেওয়াল বিস্তছাদ টিনের এমন বাড়ি হলো আধাপাকা বাড়ি আবার দেওয়াল ও ছাদ দুইটিই ইটের এমন বাড়িকে বলে পাকা বাড়ি। এমন বাড়ি নির্মাণ করতে লাগে ইট, বালু, সিমেন্ট, রড প্রভৃতি। টেকসই ও মজবুত বাড়ি হিসেবে ইটের বাড়ির কদর সবচেয়ে বেশি যদিও এর নির্মাণ খরচ অনেক বেশি।

---

[১৪] সরকার মো: শাহ আলম, ২৮, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

[১৫] মো: খলিল, ৩০, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

[১৬] সোহেল আকন্দ, ৪০, নাগবাড়ী, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

টাংগাইল জেলা শহর ও এর ১২টি উপজেলা বাদে ও প্রত্যন্ত গ্রামে এখন হরহামেশাই ইটের বাড়ি দেখা যায়।[১৭]

৩.৪ খাদ্যাভাস

বাঙ্গালীর প্রধান খাবার ভাত, মাছ, ডাল। টাংগাইল জেলার অধিবাসীরাও এর বিপরীত নয়। তাদেরও প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, সবজী, ডাল দুধ ও ডিম। অনেকে রুটিও খায়। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের খাবার একই। তবে মুসলিম সম্প্রদায় পাঠা ও শুকরের খাবার খায় না। আর হিন্দুরা গরুর মাংস খায় না।[১৮]

অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে চিড়া, মুড়ি, খৈ, পিঠা, দই, মিষ্টি, ক্ষীর, পায়েস, গুড়, আচার, সেমাই প্রভৃতিও খেয়ে থাকে।[১৯]

উৎসবে পোলাও রোস্ট, কোরমা, কাবাব, রেজালা বেশ জনপ্রিয় এছাড়াও গ্রাম ও শহর উভয়ের মানুষই কিছু নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি পান বা গ্রহণ করে থাকে যেমন- চা, পান-শুপারি, জর্দা, গুল, বিড়ি, সিগারেট। পূর্বে হুক্কা ছিল এখন তা আর দেখা যায় না।[২০]

টাংগাইলের ঐতিহ্যবাহী খাবার

উপরের খাবারগুলো সারা বাংলাদেশের মানুষ খায়। তবে বিশেষ কতগুলো ঐতিহ্যবাহী খাবার এই অঞ্চলে আছে যা কেবল এই টাংগাইলের মানুষ খায়। এগুলো সু-প্রাচীন কাল হতেই এখানকার মানুষ খেতে পছন্দ করে। নিচে এমন কতগুলো খাবারের নাম ও প্রস্তুত প্রণালী তুলে ধরছি। আরও উল্লেখ থাকে যে এই খাবারগুলোর অধিকাংশই পিঠা ও তরকারি জাতীয়।

---

[১৭] মিজানুর রহমান, ৩৪, দিঘলআটা, গোপালপুর, টাংগাইল, ২১.০২.১৯।

[১৮] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল একাডেমী, পৃ. ৪০।

[১৯] শফিক আহমেদ, ৫০, মির্জাপুর, টাংগাইল, ২৫.০২.১৯।

[২০] সাইফুল ইসলাম, ৩২, নরকোনা, মধুপুর টাংগাইল, ২৩.০২.১৯।

১. পোড়াবাড়ির চমচম

টাংগাইলের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং একই সাথে আকর্ষণীয় খাবার হলো পোড়াবাড়ীর চমচম যা বাঙালীর রসনা বিলাসে এনে দেয় তৃপ্তির সর্বশেষ মাত্রা। খাঁটি দুধ থেকে ভেজাল ছাড়াই কারিগরের হাতে তৈরি হয় এই চমচম। চমচম দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, আর খেতে এক কথায় চমৎকার। এই চমচমের আবেদন টাংগাইল থেকে দেশ আর দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। টাংগাইল শহর হতে অল্প দুরে পোড়াবাড়ী নামক স্থানে তৈরি হয় এই সুস্বাদু মিষ্টি যা চমচম বা পোড়াবাড়ীর চমচম নামে পরিচিত। এই চমচমের স্বাদ এখন ছড়িয়ে পড়েছে টাংগাইলের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশে।[২১]

২. সূর্যকান্তের মিষ্টিঃ

টাংগাইলের আরও একটি সুস্বাদু খাবার হলো সূর্যকান্তের মিষ্টি। টাংগাইল থেকে ৬০ কি.মি. দূরে ধনবাড়ী তৈরি হয় এই মিষ্টি। ময়রা সূর্যকান্ত এই মিষ্টির প্রথম কাড়িগড়। তার নামেই হয়েছে এই মিষ্টির নাম। খেতে সুস্বাদু এই মিষ্টি ব্যাপক জনপ্রিয়।[২২]

৩. রস গজা ঃ

টাংগাইলের একটি অতি পরিচিত মিষ্টি জাতীয় খাবার। দেখতে অনেকটা ভাল পুরির মত। ময়দা দিয়ে বানিয়ে তেলে মচমচে করে ভেজে চিনির রসে ডুবানো হয়। খেতে খুবই সুস্বাদু এই রস গজা। তবে শীতের দিনে এর বিক্রির পরিমাণ বেশি।[২৩]

৪. কদমা ঃ

চিনি ও ময়দা দিয়ে তৈরি হয় কদমা। একে বাতাসাও বলা হয়। দেখতে গোল মিষ্টির মত আকৃতি তবে ভেতরটা ফাঁকা। কদমা দুই ধরনের গুড়ের কদমা এবং চিনির কদমা। এই মিষ্টি খাবারটি সাধারণত মানুষ কোন শুভ কাজ শুরু করার সময় খাওয়ায় এবং মসজিদে শুক্রবার দিন নামাজের পর সবাইকে খাওয়ায়।[২৪]

---

[২১] শিশির ঘোষ, ৩২, টাংগাইল, ২৭.০২.১৯।

[২২] শরীফ আহমেদ, ২৮, সয়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

[২৩] শফিকুল ইসলাম (বিক্রেতা), ৪৫, পশ্চিমা, মধুপুর, টাংগাইল, ২১.০২.১৯।

[২৪] গোলাম মোস্তফা, ৪০, কোনাবাড়ী, মধুপুর টাংগাইল, ২৫.০২.১৯।

৫. পাচইঃ

এটি গ্রীষ্মকালীন একটি খাবার। বিশেষ ধরনের চাল দিয়ে ভাত রান্না করে সামান্য গুড়, চিনি দিয়ে সারা রাত ঢেকে রাখা হয়। এরপর ভাত নরম হয়ে আসলে (অনেকটা মদ যেভাবে বানায়) এটি পরিবেশেন করা হয়। এই খাবার খেলে এক ধরনের মাদকতা তৈরি হয়। তবে এই খাবার এখন তেমন একটা প্রচলিত নেই।[২৫]

৬. দুধের পিঠাঃ

চালের গুড়া দিয়ে চিতই পিঠা বানিয়ে দুধ, গুড়ের রসের মধ্যে সারারাত চিতই পিঠা ভিজিয়ে রাখলে সকালে রসে ভিজে পিঠা নরম হলে খাওয়ার উপযোগী হয়। আত্মীয়দের খাওয়ানোর জন্য ও নিজেরা খাওয়ার জন্য এই পিঠা বানায়। শীত বা ঠান্ডা না থাকলে এ পিঠা নষ্ট হয়ে যায়। এই পিঠা না হলে এখানকার মানুষের শীত জমে না।[২৬]

৭. তেলের পিঠাঃ

চালের গুড়ার মধ্যে গুড় দিয়ে তা আঠালো লেই তৈরি করে গরম তেলে অনেকটা পেঁয়াজুর মত করে ভাজা হয়। তারপর খাওয়া হয়।[২৭]

৮. ঝাল পিঠাঃ

গরুর মাংস রান্নার সকল মসলা চালের গুড়ার সাথে মিশিয়ে পানি দিয়ে নরম করা হয় (অনেকটা রুটি বানানোর জন্য ময়দা যেভাবে গোলা হয়)। তারপর কড়াই এর মধ্যে ঐ নরম করা আটা কলাপাতায় তেল মাখিয়ে মুড়িয়ে নিচে জ্বাল দেওয়া হয় আর উপরে আগুনওয়ালা কয়লা তুলে দেওয়া হয় ৩-৪ ঘন্টা পর পিঠা হয়ে এলে নামিয়ে ফেলতে হয়। গরম গরম এ পিঠা খেতে খুবই মজা।[২৮]

---

[২৫] আয়মনা বিবি, ৬৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২৬.০২.১৯।

[২৬] সেলিনা বেগম, ৪৮, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ২১.০২.১৯।

[২৭] দুলালী বেগম, ৫৫, হাসনই, মধুপুর টাংগাইল, ০২.০৩.১৯।

[২৮] খাদিজা বেগম, ৪৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

৯. কলা পিঠাঃ

পাকা কলা সিদ্ধ করে চালুনি দিয়ে চেলে বিচি আলাদা করে রাখা হয়। তারপর চালের গুড়া সিদ্ধ করে গোলা তৈরি করে সেমাই বানাতে হয়। তারপর দুধ, গুড় জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ কলা সেখানে ঢেলে দিতে হয় দুধ, গুড়, কলা হয়ে এলে আগে বানানো সেমাই তাতে ঢেলে দিয়ে হালকা আচে সিদ্ধ করলে হয়ে গেল কলার পিঠা। শীতকালীন পিঠা হলেও এটি সারা বছর জুড়েই খাওয়া যায়।[২৯]

১০. নাবড়া (সবজি)ঃ

বাংলাদেশে মূলত শীতকালে বেশি সবজি পাওয়া যায়। আর হরেক রকম সবজি দিয়েই তৈরি হয় এই সবজি। যা আমাদের অঞ্চলে নাবড়া নামেই বেশি পরিচিত। এই সবজি তৈরি করতে ৫/৬ রকমের সবজির প্রয়োজন হয় আর প্রয়োজন মুগ ডালের। শীতকালে এই সবজি এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।[৩০]

১১. মূলা দিয়ে টাকি মাছের ভর্তা (ভাজি)ঃ

শীতকালের সবজিমূলা দিয়ে টাকি মাছের ভর্তা টাংগাইলে একটি অতি সুস্বাদু ও জনপ্রিয় খাবার। এই খাবার তৈরি করতে প্রথমে সালাদ খাওয়ার সাদা মূলা আলু ভাজি করার জন্য আলু যেভাবে কুচি কুচি করতে হয় সেভাবে কুচি কুচি করে নিতে হবে। এরপর তাভাপে সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ করার পর পানি ছাড়িয়ে নিতে হবে। অন্য একটি পাত্রে টাকি মাছ তেল, হলুদ, মরিচ দিয়ে ভাজতে হবে। তারপর মাছ হতে কাটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। এরপর আগেই সিদ্ধ করে রাখা মূলার কুচি আলুর মত করে ভাজতে হবে ভাজি হয়ে এলে টাকি মাছ তাতে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলতে হবে। হয়ে গেল সুস্বাদু খাবার মূলা দিয়ে টাকি মাছের ভর্তা।[৩১]

---

[২৯] আয়মনা বিবি, ৬৪, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ২০.০২.১৯।

[৩০] হেলাল উদ্দিন, ৪৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২১.০২.১৯।

[৩১] রিনা বেগম, ৪২, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ২৫.০২.১৯।

১২. লাউ, টাকির ঘাটি (ঘন্ট)

এই খাবারটাও শীতকালে প্রচলিত একটি অতি প্রিয় খাবার রূপে পরিগণিত। লাউ দিয়ে টাকি মাছের ঘাটি। মুলত মাছ আস্ত বা টুকরা না রেখে গলিয়ে ফেলে এই তরকারি রান্না করা হয়।[৩২]

১৩. মিষ্টি কুমড়ার চুকা (মিষ্টি ঘন্ট)

এটি অতি সুস্বাদু একটি খাবার। এই খাবার প্রস্তুত করার জন্য পাকা মিষ্টি কুমড়া তরকারি রান্না করার জন্য যেভাবে কাটে ঐভাবে টুকড়া করে নিতে হয়। তারপর সিদ্ধ করে চেপে পানি ছাড়িয়ে ভর্তার মত করে ফেলতে হয়। অন্য একটি পাত্রে দুধ, গুড়, জাল দিতে হয়। ঐ পাত্রে পরে ঐ মাখানো মিষ্টি কুমড়া ছেড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলতে হয়। এভাবেই সহজেই প্রস্তুত মিষ্টি কুমড়ার চুকা (মিষ্টি ঘন্ট)। এটি গরম গরম ভাতের সাথে খেতে ভাল লাগে।[৩৩]

১৪. মূলার মোরব্বাঃ

মূলার মোরব্বাও একটি অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় খাবার। মূলা যেহেতু শীতকালীন সবজি তাই এই সুস্বাদু খাবারটিও শীতকালে তৈরি করতে হয়। এটি বানাতে বড় ও সাদা সালাদ খাওয়ার মূলা প্রয়োজন। মূলা প্রথমে টুকরা টুকরা করে কেটে ভাপে দিতে হবে। তারপর হালকা চাপ দিয়ে পানি ছাড়িয়ে নিতে হবে। তারপর আলাদা পাত্রে দুধ ও চিনি জ্বাল দিতে হবে। সিদ্ধ মূলা খেজুরের কাঁটা দিয়ে ছিদ্র ছিদ্র করে নিতে হবে যাতে দুধ ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর তা দুধের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবেই তৈরি মজাদার মূলার মোরব্বা। এটি ভাত, মুড়ির সাথে খেতে দারুন।[৩৪]

---

[৩২] ফাতেমা বেগম, ৩৭, নারায়ণপুর, গোপালপুর, টাংগাইল, ২৫.০২.১৯।

[৩৩] রোজিনা, ২৮, সখিপুর, টাংগাইল, ২৬.০২.১৯।

[৩৪] ফরিদা আক্তার ৪৮, বেতবাড়ি, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২৭.০২.১৯।

১৫. কচুর মুখির ডালঃ

আবহমান কাল ধরে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ কচুর মুখির ডালকে তাদের খাদ্য তালিকায় আপন করে নিয়েছে। কচুর নিচে বা লতির সাথে যে মুখি হয় তা সিদ্ধ করে বেটে গলিয়ে ডাল রান্না করা হয় তাকেই কচুর মুখির ডাল বলে। টাংগাইলের রসনা বিলাসী মানুষ তাদের পাতে এই ডাল বছরে অন্তত একবার হলেও খেতে পছন্দ করে।[৩৫]

১৬. কামরাঙ্গা ভাজিঃ

আমাদের সকলের কাছে অতি পরিচিত একটি টক ফল হল কামরাঙ্গা। যা মানুষ পাকলে খেতে পছন্দ করে। আর আমাদের এখনকার আলোচনার খাবারটি এই কামরাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। কাচা কামরাঙ্গা কুচি করে কেটে আলুর মত করে ভেজে খাওয়া হয়। এটাই এলাকার মানুষের নিকট কামরাঙ্গা ভাজি নামে পরিচিত। এটি অনেকেই অতি আগ্রহ ও আনন্দের সাথে খেয়ে থাকে।[৩৬]

১৭. আনারস ভাজিঃ

টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় প্রচুর আনারস ফলে। দেশের সবচেয়ে বেশি আনারস এই অঞ্চলে চাষাবাদ হওয়ার কারণে এই আনারসের আছে এই অঞ্চলে বহুমাত্রিক ব্যবহার। আনারস সারাদেশের মানুষ খায় পাকলে। আর এই আনারসের দেশের মানুষ আনারস খায় নানাভাবে। যেমন ভেজে। আলুর মত করে কুচি কুচি করে কেটে তারপর সিদ্ধ করে পানি ছাড়িয়ে নিয়ে আলুর মত করে ভেজে খাওয়া হয়। একটু একটু টক স্বাদ তাই খেতে মজা।

১৮. ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর ঘন্ট

প্রথমে কচুর কচি ডাটা পাতাসহ কুচি করে কেটে ভাপে সিদ্ধ করতে হবে তারপর মসলা দিয়ে ভাল করে মথে নিতে হবে। এরপর মাছের মাথা দিয়ে কচুর ঘন্ট আরও

---

[৩৫] রহিমা বিবি, ৬৫, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২৬.০২.১৯।

[৩৬] আমিনা বেগম, ৪৮, মাঝিপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল, ২৭.০২.১৯।

একটু ভাল করে জ্বাল দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ইলিশ মাছের মাথা আলাদা করে কষিয়ে নিলে বেশি ভাল হয়। এভাবেই তৈরি হয় মজাদার ইলিশ মাছ দিয়ে কচুর পাতার ঘন্ট। এটি গরম ভাতের সাথে খেতে সুস্বাদু।[৩৭]

১৯. আমের আচার

টাংগাইলে আমের আচার একটু গুরুত্বপূর্ণ ও অতি পছন্দের খাবার। সাধারণত আমের আচার কাঁচা আম দিয়ে বানানো হয়। কখনও আঁটিওয়ালা আম দিয়েও আচার বানানো হয়। কোন কোন আচার ভর্তা প্রকৃতির কোন কোনটা আস্ত চাটনি প্রকৃতির। কোন আচার ঝাল আবার কোনটা মিষ্টি আবার কোনটা টক। তবে আচার খিচুড়ি, তরকারির সাথে যেমন খেতে মজা তেমনি হাতে নিয়ে চেটে খেতেও মজা।

৩.৫ পোশাক পরিচ্ছদ

বিশ শতকের প্রথম দিকেও এ অঞ্চলের মানুষের পোশাক পরিচ্ছেদ তেমন কোন বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অর্থনৈতিক শ্রেণি অনুসারে দৈনন্দিক পোশাকের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবের ব্যতীত সকল পোশাকই এক। মানুষ প্রতিদিনের প্রয়োজনের তাগিদে এবং বিশেষ দিনে আনন্দ করার জন্য নানান রকম পোশাক পরে থাকেন। তবে ছেলে ও মেয়েদের একদম কমন কতগুলো পোশাক আছে। এগুলো 'বাঙালি পোশাক' নামে পরিচিত। যেমন- শাড়ি, লুঙ্গি ইত্যাদি। তবে পোশাকের সবচেয়ে বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নারী ও পুরুষের পোশাকে। এমতাবস্থায় আমরা টাংগাইলের যে জনগোষ্ঠী তাদের পোশাককে ২ ভাগে ভাগ করে আলোচনার প্রয়াস পেলাম–

(ক) পুরুষদের পোশাক

(খ) মহিলাদের পোশাক

---

[৩৭] জাহানারা, ৪৬, গোপালপুর, টাংগাইল, ২৭.০২.১৯।

(ক) পুরুষদের পোশাক

শারীরিক গঠন ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে ছেলেদের পোশাক মেয়েদের পোশাকের চাইতে খানিকটা পৃথক। পুরুষেরা কখনও ভাড়ি পোশাক আবার কখনও হালকা পোশাক পরিধান করে। তবে অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং কাজের ধারন অনুসারে পুরুষের পোশাকের ধরন পৃথক। নিচে পুরুষের পোশাকগুলো তুলে ধরা হলো–

১. লুঙ্গি

গ্রাম ও শহর উভয় স্থানের পুরুষের পছন্দের পোশাক লুঙ্গি। এটি আরামদায়ক। দুই পাশ খোলা এবং গোল এই পোশাক পড়তেও সহজ আবার আরামদায়ক তাই এর ব্যবহার এবং জনপ্রিয়তা বেশি।

২. পাঞ্জাবী-পাজামা

উৎসবে ও রুচিপূর্ণ পুরুষের প্রথম পছন্দ পাঞ্জাবী-পাজামা। এটি মুসলিমদের অতি প্রিয় উৎসবের পোশাক। ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে মেরাজ শবে বরাদ, শবে কদর সহ নানান উৎসব ও আয়োজনে মুসলিমরা এই পোশাক পড়ে থাকেন। পাঞ্জাবী মানেই আনন্দের বার্তা বিষয় অনেকটা এমনই।

৩. ফতুয়া

ফতুয়া অনেকটা পাঞ্জাবীর মতন তবে পাঞ্জাবীর চেয়ে ছোট। বাহিরের দিকে এর দুইটি পকেট থাকে। পাঞ্জাবীর চেয়ে ছোট ও হালকা হওয়ায়, পুরুষের পোশাক হিসেবে এটি বেশ জনপ্রিয়।

৪. শার্ট-প্যান্ট

আধুনিক পুরুষের প্রথম পছন্দ শার্ট-প্যান্ট। বর্তমানে শিক্ষিত যুব সমাজ প্রয়োজনে এবং আধুনিক সমাজের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচে শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে। এটি ইংরেজদের পোশাক। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বাংলাদেশেও এই পোশাক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৫. টি-শার্ট জিন্স

কিশোর থেকে যুবক সকল পুরুষের পছন্দের তুঙ্গে টি-শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট। পাশ্চাত্ত ঘরানার এই পোশাক অতি জনপ্রিয়।

৬. চাদর

রুচিশীল পুরুষের শীতকালীন পোশাক হলো চাদর। রকম ও ডিজাইন ভেদে নানান শ্রেণিও পেশার পুরুষের গায়ে এই চাদর শোভা পায়।

(খ) মেয়েদের পোশাক

জন্মগত ভাবেই মেয়েরা পুরুষের চেয়ে সৌন্দর্য সচেতন। তাই তারা বাহারি পোশাক পরিধান করে। সকল পোশাকেই কম বেশি ঐতিহ্যের পাশাপাশি নতুনত্বের ছোঁয়া রয়েছে। বাঙ্গালী মেয়েদের প্রথম পছন্দ শাড়ি। তবে আধুনিক নারীরা পাশ্চাত্য ঢং এর পোশাক পড়তেও স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। নিচে মেয়েদের হরেক রকম পোশাকের মধ্য হতে কয়েকটি পোশাক নিয়ে আলোকপাতের প্রয়াস নিলাম।

১. শাড়ি

শাড়ি বাঙালী নারীর প্রথম এবং প্রধান পোশাক। শাড়ি এবং নারী যেন একই সূত্রে গাঁথা। টাংগাইলের নারীদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। শাড়ি হলো বর্ণিল রং এর সুতোয় গাঁথা এক টুকরা লম্বা কাপড়। যা লম্বায় ১২ হাত। এটি শরীরে পেচিয়ে রাখতে হয়। শাড়ি পরলে সকল বয়সী নারীকেই ভাল লাগে। এটি আরামদায়কও বটে।[৩৮]

২. সেলোয়ার-কামিজ

এটি মূলত বিদেশী পোশাক। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় মেয়েদের পোশাক রুপে পরিগণিত। এটি দেখতে বেশি সুন্দর। সহজে সকল নারীর পরনে বেশ মানিয়ে যায়। এটি রুচিশীলও বটে। এটি বেশ আরামদায়ক।[৩৯]

---

[৩৮] রোমানা ইসলাম, ২৮, ধলপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ০১.০৩.১৯।

[৩৯] শারমিন আক্তার, ২১, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০১.০৩.১৯।

৩. টপস্-কাটস্

এটি পাশ্চাত্য ঢং এর আধুনিক পোশাক। তবে কিশোরী মেয়েরা এই পোশাক পড়ে থাকে। দেখতেও বেশ ভাল।[৪০]

৪. লেহেংগা

এর প্রচলন টাংগাইলের মেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় তবে অপেক্ষাকৃত একটু ধনাঢ্য পরিবারের মেয়েদের এই পোশাক পড়তে দেখা যায়। এটিও বিদেশি পোশাক।[৪১]

৫. ফ্রক

অপেক্ষাকৃত কম বয়সী মেয়েদের এই পোশাক পড়তে দেখা যায়। মূলত গ্রামের মেয়েদের মধ্যে ফ্রকের প্রচলনটা একটু বেশি।

৬. ডুমা

এটি গামছার চেয়ে একটু বড়। অনেকটা ছোট শাড়ির মত যা শরীর পেঁচিয়ে পড়া হতো। যখন শাড়ির প্রচলন কম ছিল তখন নারীরা এই পোশাক পরিধান করতো। সাধারণত মার্কিন কাপড়ে তৈরি ডুমা গামছার মত ডোরাকাটা বা চেক চেক হত। ১২-১৩ বছর বয়সী মেয়েরা এই ডুমা পরিধান করতো।

৩.৬ অলংকার

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মেয়েরা কম বেশি গহনা পরিধান করতো। সভ্যতার ক্রমবিকাশে তা আরো ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়েছে। এখন অলংকার ব্যতীত কোন নারীকে কল্পনা করা যায় না। পা হতে মাথা পর্যন্ত সাজানোর জন্য আছে নানা রকম অলংকার। এই অলংকার নারীকে করে তোলে অপরূপ, মোহনীয়। পুরুষের অলংকার বলতে তেমন কিছুই নেই। ঘড়ি ও আংটি ব্যতীত ছেলেদের আর কোন অলংকার পড়তে দেখা যায় না। এগুলোকে অলংকার না বলে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য বলাই

---

[৪০] মৌসুমী, ২৭, আদালতপাড়া, টাংগাইল, ০১.০৩.১৯।

[৪১] জাসিয়া, ১৪, টাংগাইল, ০২.০৩.১৯।

উত্তম। টাংগাইলের নারীরা পূর্ব থেকেই কিছু কিছু গহনা পরিধান করে এবং আগেও করতো। তবে শুধু উচ্চ শ্রেণিরাই সোনার গহনা পরিধানে করতো বাকীরা রূপার গহনা পরিধান করতো। অঙ্গের ধরন অনুযায়ী ও ব্যবহার অনুযায়ী গহনার ধরন ও আকৃতিও ভিন্ন হয়। এখন আমরা নারীর কিছু ঐতিহ্যবাহী গহনা বা অলংকার নিয়ে আলোকপাত করব–

মাথার অলংকার ঃ ক্লিপ, টটকালি, শিথিপাটি মাথায় প্রধান অলংকার। এছাড়া রুপোর কাটা ছিল খোঁপা বাঁধার জন্য।[৪২]

গলার অলংকার ঃ আকৃতি, প্রকৃতি অনুযায়ী গলার অলংকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন-কেসলি, চন্দ্রহার, ধান তাবিজ প্রভৃতি। ধান-তাবিজ নামক গহনায় ধানের মত ৫-৭টি তাবিজ থাকতো যা সাধারণত সোনা, রুপা বা পিতলের হতো।[৪৩]

কানের অলংকার ঃ কানে সাধারণত কান-মাকড়ী, কানপাশা, ঝুমকা, মাকর ফুল ইত্যাদি পড়তো, এছাড়া নানান রকম দুল ও পরিধান করতো। এদের অধিকাংশই ছিল সোনার তবে কেউ কেউ রূপা দিয়েও বানিয়ে পড়তো।[৪৪]

নাকের অলংকার ঃ নাকের প্রধান অলংকার ছিল নাকফুল। যা এখনো জনপ্রিয় ও অতি পরিচিত নাকের অলংকার। বিভিন্ন আকৃতির এই নাকফুলগুলোর নাম ছিল- 'ময়ূর' 'চাঁদ তারা' 'বাবলাফুল'। এছাড়াও নাকের মাঝখানে পড়তো 'ফুরফুরী' 'সিন্দুবালা' 'বেশর'। বেশর অনেক স্থানে নাকঢশা নামেও কেউ কেউ এত বড় নাকঢশা বা বেশর পড়তে যে খাওয়ার সময় হাত দিয়ে এটি উঁচু করে রাখতে হতো।[৪৫]

---

[৪২] চম্পা আক্তার, ২৭, মধুপুর, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

[৪৩] গোলভানু, ৬৭, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল ১০.০৩.১৯।

[৪৪] ফরিদা আক্তার, ৪৬, মধুপুর, টাংগাইল ২০.০৩.১৯।

[৪৫] রহিমা বেগম, ৪৮, চাপড়ী, মধুপুর, টাংগাইল ০৪.০৩.১৯।

হাতের অলংকার ঃ হাতে বা বাহুতে পড়তো রুপার 'কাটাবাজু' 'আমলেট' 'চুড়ি' এবং মোটা 'সোনাপৌছ'। এছাড়াও ছিল 'চুর'। 'লোহার খাড়ু' সধবা হিন্দু বয়স্কা মহিলারা পড়তো। এছাড়া হিন্দু সধবা মহিলারা 'শাখা' পড়তো এবং এখনো পড়ে।

আঙ্গুলের অলংকার ঃ 'স্বর্নাঙ্গুলী' ছিল আঙ্গুলের প্রধান অলংকার। তৎকালে উচ্চ বিত্ত পরিবারের মেয়ে এই সোনার আঙ্গুলী বা আংটি পরিধান করতো। এখনও এই আংটির প্রচলন ব্যাপক।

কোমড়ের অলংকার ঃ কোমড়ের অলংকার ছিল-'বিছা'। 'তারাহার' এগুলো সাধারণত রূপার হতো।[৪৬]

পায়ের অলংকার ঃ পায়ের অলংকার হিসেবে পড়তো 'খাড়ু' আর উপরে পড়তো 'পঞ্চম' যা ঝুন ঝুন করে বাজতো। এখন পড়ে নূপুর বা মল (যা এক পায়ে পড়া হয়)। পায়ের সব অলংকারই রূপা দিয়ে তৈরি করা হয়।

৩.৭ প্রসাধনী

সৌন্দর্য প্রিয়তা সর্বকালের নারীদের মধ্যেই লক্ষনীয়। তৎকালীন সময়ে সৌন্দর্য বর্ধনের তেমন কোন প্রসাধনী সামগ্রিক প্রচলন ছিল না। তবে এখন, অভাব নেই। হিন্দু বিবাহিত মেয়েরা 'সিদুর' পড়তো। এখনও মেয়েদের প্রসাধনী ব্যবহারের প্রবণতা বেশি তবে বর্তমানে তাদের কাতারে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্যপ্রিয় আধুনিক ছেলেরা। এমতাবস্থায় প্রসাধনীর বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে এর একটি শ্রেণিকরণ করার প্রয়াস নেব।

(ক) ছেলেদের প্রসাধনী ঃ আগেই বলা হয়েছে যে ছেলেরা তেমন সৌন্দর্য সচেতন নয়। এক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে। পূর্বে ছেলেরা তেমন কোন প্রসাধনী ব্যবহার করতো না বললেই চলে। শুধু মাঝে মাঝে সাবান ব্যবহার করতো। তবে তখন সাবানের

---

[৪৬] খাদিজা, ৪৯, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

প্রচলনও কম ছিল সে সময় এক ধরনের মাটি ছিল যা দিয়ে মাথা ও শরীর পরিস্কারের কাজ চলতো। এর বাইরে তারা চোখে 'সুরমা' ব্যবহার করতো। সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করতো 'আতর'। তবে এখন চিত্র কিছুটা ভিন্ন। যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ছেলেরাও কিছু প্রসাধনী ব্যবহার করছে। চুলের যত্নে শুধু ছেলেদের জন্য শ্যাম্পু, পাওয়া যায় মুখের জন্য আছে বিশেষ 'ফেইসওয়্যাশ' 'ক্রীম'। আছে 'শেভিং জেল ফোম' 'আফটার শেভ লোশন'। গামের প্রতিকারে ডিউডোরেন্ট, আছে 'বডি স্প্রে' 'পারফিউম'। অর্থাৎ সকল প্রসাধনীই এখন ছেলেরা ব্যবহার করছে। আছে ছেলেদের বিউটি পার্লার। যেখানেও ক্রেতা সমাগম লক্ষ্য করা যায়।[৪৭]

(খ) মেয়েদের প্রসাধনী ঃ প্রতিটা অঙ্গ সাজাবার জন্য মেয়েদের আছে পৃথক পৃথক প্রসাধনী। পূর্বে প্রসাধনীর পরিমান কম থাকলেও নারীদের নিজেকে সাজাবার চেষ্টার কমতি ছিল না। পূর্বে নারীরা মাটি দিয়ে চুল ও শরীর পরিষ্কার করতো।[৪৮]
তারপর সাবান আবিষ্কৃত হলো তবে তা শুধু ধনাঢ্যরা ব্যবহার করতে পারতো। আস্তে আস্তে যখন সাবান সবার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসে তখন সবাই সবান ব্যবহার করতো। তখন মেয়েরা ঠোঁট রাঙ্গানোর জন্য 'লিপিস্টিক' ব্যবহার করতো। পা রঙ্গিন করার জন্য ছিল 'আলতা'। মেয়েরা চোখ সাজাবার জন্য ব্যবহজার করতো 'কাজল'। চুলে খোঁপার কাটা ব্যবহার করতো। তেলের সাথে মোম গলিয়ে চুলের অগ্রভাগে ব্যবহার করতো যাতে চুল এলোমেলো না হয়ে যায়।

ত্বকের যত্নে ঃ সারা শরীরের যত্নেও নারী একদম পিছিয়ে নেই। ভাল মানের 'সাবান' এবং 'বডিওয়্যাশ' সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। বিউটি পার্লারে করে 'স্পা'। অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কারের জন্যও আছে প্রসাধনী যেমন 'ভিট'। আছে 'ফল' 'সবজি' 'গোলাপ জল' 'লেবু, কমলার রস, মধুর বিশেষ মালিশ। শরীরে নারী ব্যবহার করেন 'বডিলেশান' বডি স্প্রে, 'পারফিউম' 'ডিওডোরেন্ট' পাউটার, প্রভৃতি প্রসাধনী।

---

[৪৭] ফয়সাল আরেফিন, ২৮, চালাস, ধনবাড়ী, টাংগাইল ০৪.০৩.১৯।

[৪৮] নুরি বেগম, ৫৫, লোবাদেও, মধুপুর, টাংগাইল ০৪.০৩.১৯।

পায়ের যত্নে ঃ মুখ ও পায়ের রং এর পার্থক্য দূর করা মেয়েদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই তারা পায়ে স্পা করে থাকেন।

চুলের যত্নে ঃ চুলের যত্নে নারী ব্যবহার করে 'শ্যাম্পু' এবং 'কন্ড্রিশনার'।

মুখের যত্নে ঃ মুখের যত্নে নারীর জন্য আছে 'ফেইসওয়্যাশ' 'উপটান' বিভিন্ন রকমের 'ম্যাসেজ' এর উপকরণ। আছে নানা রকমের ক্রীম। এছাড়া মুখের সাজ-সজ্জায় ব্যবহার করে নানা রকমের 'মেকাপ' বা 'ফেস পাউডার'। আছে ফল সবজির থেরাপি।

ঠোটের যত্নে ঃ ঠোট নারী শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একে ঠিকঠাক রাখতে নারীর প্রচেষ্টার যেন কোন ত্রুটি নেই। ঠোটের যত্নে নারী ব্যবহার করে 'লিপজেল, আর ঠোট রাঙ্গাতে ব্যবহার করে 'লিপস্টিক।' মাথার চুলের পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করতো 'নারিকেল তেল' আর চুল আচড়ানোর জন্য ব্যবহার করতো 'কাকই' বা 'চিরুনি' নামে পরিচিত। কাপড় কাঁচার জন্য ব্যবহার করতো 'সোডা'। কলার খোল/থোর পোড়ানো 'ছাই।[৪৯]

বর্তমানে নারীর প্রসাধনীর জগৎটা এখন ভিন্ন। হরেক রকমের প্রসাধনী এখন বাজারে। পাড়ার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিউটি পার্লার। এখন মেয়েরা সৌন্দর্য চর্যা বাড়ীতে না করে পার্লারেই বেশি করে। নারীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সাজানোর জন্য আছে ভিন্ন ভিন্ন সব প্রসাধনী।

৩.৮ সামাজিক উৎসব

টাংগাইল জেলার সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য বিষয় হলো সামাজিক উৎসব। এমনিতেই বাঙালী জাতি উৎসব প্রিয় জাতি। এক্ষেত্রে টাংগাইল জেলার মানুষও ব্যতিক্রম না। সারা বছরই এ জেলায় বিভিন্ন উৎসব ও মেলা লেগেই থাকে।

---

[৪৯] হাওয়া বেগম, ৬০, পালপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল ০১.০৩.১৯।

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন উৎযাপন উপলক্ষ্যে এই মেলা বসে। তাছাড়া মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের উৎসবগুলোও সকলের অংশগ্রহণে অতি উৎসাহ ও আনন্দের সাথে পালিত হয়। নিচে এ জেলার প্রধান প্রধান উৎসবগুলো তুলে ধরা হলো :

১. পহেলা বৈশাখ

টাংগাইল জেলার সর্বত্র এ উৎসব পালিত হয়। এ দিন সকাল থেকে মানুষ বিশেষ দিন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে। ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা আর মেয়েরা শাড়ি, লালচুড়ি, টিপ, খোঁপায় ফুল। এ দিন দলে দলে তরুণরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ঐতিহ্যের সাথে সংগতিতে রেখে সকালের খাবার খায়। বিশেষত পান্তাভাত, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, আলু ভর্তা, বেগুন ভাজি, শুকনা মরিচ থাকে। বেশি উচ্চ শ্রেণি অর্থাৎ ধনাঢ্য হলে ইলিশ মাছ ভাজি দিয়ে পান্তা ভাত খায়। তবে ইলিশ মাছ এখন আর সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে নেই। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। ধনী-গরিব, উচু-নিচু, নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো দল বেঁধে মেলায় যায়। গ্রামের খোলা মাঠে, নদীর ধারে, বটতলায় মেলা বসে। সেই মেলায় জমজমাট বিকিকিনি হয়। মেলায় গ্রামের মানুষ নিজেদের তৈরি বিভিন্ন কৃষিজ পন্যের পশরা সাজায়। উঠে বিভিন্ন মিস্টান্ন জাতীয় খাবার। থাকে শিশুদের জন্য বাহাড়ি খেলনা, ও মেয়েদের নানান শখের ও সাঁজগোজের পণ্য। মেলা শেষে রাত্রে বসে বাউল গানের আসর আবার কখনও বা যাত্রা। কোথাও আবার মেলা উপলক্ষ্যে আসে সার্কাস। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভিন্ন ধরনের আয়োজন। থাকে খাওয়া-দাওয়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। যা সবাইকে আনন্দিত করে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে টাংগাইল শহরে ও উপজেলা শহরে চলে শোভাযাত্রা। বর্ণিল সেই

শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে সবাই। এভাবে এই মেলার মানুষ পহেলা বৈশাখ কে অতি আদরে বরণ করে নেয়।[৫০]

২. নবান্ন উৎসব

প্রধানত হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে টাংগাইল জেলার হিন্দু মুসলিম নবান্ন উৎসব পালন করে। তাদের নবান্ন উৎসব মূলত নতুন ধান থেকে যখন তারা চাল পায় ঐ চাল প্রথম যেদিন রান্না করা হয় ঐ দিন আত্মীয় স্বজন এবং মৌলভীকে দাওয়াত করা হয় ভাল খাবার রান্নার পাশাপাশি নতুন চালের ক্ষীর বা পায়েস রান্না করা হয়। যা সকলে মিলে আনন্দের সাথে খায়। এই আনন্দের সাথে পালিত দিনটিই নবান্ন নামে পরিচিত।[৫১] নতুন ফসল প্রাপ্তিতে কৃষকের মন আনন্দে ভরে উঠে। সারা মাস ফসল ঘরে তোলার পর কৃষক এই উৎসব এর আয়োজন করে। বাড়ি ভর্তি মেহমান ভাল খাওয়া দরকার সাথে গোলা ভড়া ফসল। কৃষকের মন আনন্দে নেচে উঠে। নবান্ন উপলক্ষ্যে কৃষক নিজের বাড়িতে যেমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঠিক তেমনি অন্যের বাড়িতেও দাওয়াত খেতে যায়। এই অনুষ্ঠানকে তারা মঙ্গলজনক হিসেবে বিবেচনা করে। বাড়ির বয়োজেষ্ঠরা কিছু বাড়তি রীতিনীতি পালন করে থাকে। তবে সমাজের হিন্দুরা এমন কতগুলো কাজ এই নবান্ন উপলক্ষে করে যা মুসলিম রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

তবে সকলে নবান্ন উৎসবে মেতে উঠে এটাই যেন টাংগাইলের চিড়ায়িত রুপ।

নবান্নের গান

ও আমার মাইঝা ভাই সাইজা ভাই

কই গেলা রে (২)

চল যাই ক্ষেতে ধান কাটিতে ॥

---

[৫০] আসলাম তালুকদার, শিক্ষক, ৪২, মধুপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

[৫১] হেলাল উদ্দিন, ৪৫, বাইলাচড়া, মধুপুর, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

কাঁচি লই হাতে মাথাইল লই সাথে
মুড়ি কিছু বাইন্ধা লও গামছাতে ॥
কাটিব পাকা ধান
আনন্দে নাচবে প্রাণ
বউ ঝিরা বানবে বারা ঢেঁকিতে ॥
কাটিয়া পাকা ধান
আনন্দে চিবাবো প্রাণ
মাথাই কইরা আইনা দেব বাড়িতে ॥
ধান কাটিয়া নেব
বউ ঝিয়ে সাড়িবে
পিঠা চিড়া পাকাইবে হাড়িতে ॥[৫২]

৩. শীতের পিঠা-পার্বণ

শীতের পিঠা পার্বণ যেন টাংগাইল বাসীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। শীত মানেই পিঠা আর পিঠা মানেই মজা। মজাকে কেন্দ্র করে সকলের আনন্দ। শীতের এই পিঠার জঁমজমাট আয়োজন চলে পুরো পৌষ মাস জুড়ে। পৌষ মাস মানেই রসের পিঠার মাস। সারা টাংগাইল পৌষের পিঠা উৎসবে মেতে উঠে। দুধের পিঠা, পুলি পিঠা, তেলের পিঠা, ভাঁপা পিঠা, কাল পিঠা, কাঠ পুলি প্রভৃতি পিঠা নিজেরা এবং আত্মীয়স্বজনকেও খাওয়ায়। যেন পিঠা খাওয়ার মহা উৎসব। মেয়ের জামাই এর জন্য চলে শশুরবাড়িতে পিঠা বানানোর মহা উৎসব। শীতে পিঠা বানানোকে কেন্দ্র করে গ্রামগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায়। অপর দিকে পাড়ার অল্প বয়স্ক ছেলেরা বাড়ি বাড়ি থেকে চাল তুলে মাঠে পায়েস রান্না করে খায়। এটি পৌষ মাসের শেষ দিন করা হয়।[৫৩]

---

[৫২] আ: হামিদ, ৭০, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

[৫৩] সুফিয়া বেগম, ৮০, গোপালপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

৪. গ্রামীণ মেলা

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সামনে রেখে পুরো টাংগাইল জুড়েই কম বেশি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে বৈশাখ মাস জুড়েই বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। নিচে টাংগাইলের কয়েকটি মেলা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(ক) ধনবাড়ী মেলা ঃ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে ৩ দিন ব্যাপী ধনবাড়ী শহরের বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলা অনেক বড় এবং জনপ্রিয় মেলা। পুরো টাংগাইল জুড়েই এ মেলার সুখ্যাতি আছে। সারা টাংগাইলের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে এই মেলার জন্য। এই মেলা বর্তমানে একটি বাণিজ্য মেলায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। টাংগাইলে উৎপাদিত প্রায় সকল দ্রব্যাদির সমারোহ ঘটে এই মেলায়। বিশেষত আসবাবপত্র বেশি কেনাবেচা হয়। এছাড়া টাংগাইলের শাড়ি এবং মিষ্টান্ন অনেক বেশি বিকিকিনি হয়।[৫৪]

(খ) শোলকুড়ী মেলা ঃ শোলাকুড়ীর মেলা টাংগাইলের মধুপুর উপজেলায় পাহাড়ি অঞ্চলের একটি মেলা। এটি মধুপুর উপজেলা সদর হতে প্রায় ১৫ কিমি দুরে অবস্থিত। এটিও ৩ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মোট ৩ দিনের এই মেলায় নানা বয়সের মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। সারা টাংগাইল এই মেলায় মেতে থাকে। টাংগাইলের ঐতিহ্যবাহী সব পণ্য এই মেলায় পাওয়া যায়। মেলায় আনন্দ করার পাশাপাশি মানুষ মেলা থেকে নিজের পছন্দের পণ্যগুলো কিনে থাকে। চিনির জিলাপী মেলায় মিষ্টতা ছড়ায়।[৫৫]

(গ) চাপড়ী মেলা ঃ এটাও টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার একটি গুরুত্বপুর্ণ এবং আনন্দঘন মেলা। তিন দিনের এই মেলার প্রধান আকর্ষণ বাউল গান। এই বাউলগান দেখার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর সমাগম হয়। মেলা হয়ে উঠে লোকে

---

[৫৪] মঞ্জুর হোসেন, ৩০, ধনবাড়ী, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

[৫৫] সাখাওয়াত হোসেন, ৪০, শোলাকুড়ী, মধুপুর, টাংগাইল ০৪.০৩.১৯।

লোকারন্য হয়ে উঠে। যদিও বর্তমানে মেলায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তারপরও ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটা এখনও লেগে আছে মেলায়।[৫৬]

(ঘ) জামাই মেলা ঃ টাংগাইল সদর উপজেলার রসূলপুর গ্রামে বৈশাখ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ বসে ঐতিহাসিক জামাই মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে ৩০-৩৫ টি গ্রামের মেয়ের জামাইরা দাওয়াত পেয়ে মেলাতে মিলিত হয়।[৫৭]

মেলা উপলক্ষে শশুরবাড়িতে জামাইকে দাওয়াত দেওয়া হয়। জামাইর হাতে দেওয়া হয় ২০০/৫০০/১০০০ টাকা। দেওয়া হয় (শশুরের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায়) সেই টাকা দিয়ে জামাই বাজার করে আনে মেলা থেকে। এর মধ্যে মাটির বাসন কোসন বা ঘড় গেরস্থালির অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সাথে সাথে জিলাপী, বাতাসা, রসগজা, মিষ্টান্ন কিনে আনে। মেলায় পাওয়া যায় বাহাড়ি সব গ্রামীণ পণ্য যেমন- বাঁশের তৈরি খেলনা, মাটির তৈরি খেলনা, ঝিনুকের তৈরি তৈজসপত্র, কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রচুর আমদানি ও বিক্রিয় হয়। মেলার প্রথম দিন জামাইরা আর ২য় ও ৩য় দিন বউ/মেয়েরা কেনা কাটা করে। মেলা উপলক্ষ্যে জামাই বউদের মিলন মেলা বলে এই মেলার নাম জামাই মেলা।[৫৮]

(ঙ) মদনা মায়ের মেলা ঃ টাংগাইল জেলার ছোট কালিবাড়ী গ্রামে একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী মেলা হলো মদনা মায়ের মেলা। এটি একটি মন্দির কেন্দ্রিক মেলা। মন্দিরটি ৪০০ বছরের পুরোনো আর এখানেই বহুদিন যাবত অনুষ্ঠিত হচ্ছে মদনা মায়ের মেলা। এই মেলা বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের রবিবার দিন বসে।[৫৯] পূর্বে এ মেলায় চড়কগাছ ঘুড়ানো হতো। এ মেলায় পোড়াবাড়ির চমচম সহ নানা পণ্য বিকিকিনি হয়।[৬০]

---

[৫৬] জাহিদ হাসান, ১৮, চাপড়ি, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.১৯।

[৫৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল জেলা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৭১।

[৫৮] শিপুল মিয়া, ৩১, টাংগাইল ০৪.০৩.১৯।

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

[৬০] আল আমিন, ২৬, কালিবাড়ি, টাংগাইল ০৬.০৩.১৯।

(চ) নটকা (গোটার মেলা) ঃ টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় সূতী কাঙ্গালদাম গ্রামে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার সামন্ত প্রভু ছিলেন দিকপাইতের জমিদার। তারই জমিদারীতে বাস করতো পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক ও হেমলতা ভৌমিক। তাদের ২ বিঘা জমিতে দাস ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি বট পাকুড় গাছের বিয়ে দেন। কাল ক্রমে এই গাছ দুটি বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা আশ্রয় নেয়। এখানেই প্রতিবছর ২৫ জুন/১১ আষাঢ় এই মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে বিক্রির জন্য এখানে নটকা গোটা (ছোট টক ফল) অর্থাৎ লটকন আমদানি করা হতো বলে এর নাম হয়েছে নটকা গোটা মেলা। নটকা গোটার মেলার স্থানে রথ যাত্রাও হয়। তবে নটকা গোটার মেলার খ্যাতিই বেশি।[৬১]

(ছ) বার তীর্থের মেলা ঃ মধুপুর উপজেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শোলাকুড়ী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বার তীর্থের দিঘীকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর বসে এ মেলা। প্রতিবছর অমব্যাসায় হয় পূর্ণ স্নানের উৎসব আর এ উপলক্ষ্যেই এই মেলা। সারা দেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুণ্যার্থীরা এখানে জড়ো হন। সারা রাত ভর চলে পুণ্যার্থীদের স্নান এবং পূজা। আর সারা রাত ব্যাপী চলে মেলা। হয় জমজমাট বেচা কেনা। মেলা হয় তিন দিন। প্রথম দিনের পর মেলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ যায় জামালপুর জেলার শ্রীপুর অন্যভাগ শোলাকুড়ীর স্কুল মাঠে। সেখানে চলে ২ দিন। মেলার সাথে যুক্ত হয় সার্কাস। ভেরাইটি শো, পুতুল নাচ, যাত্রা, বাউল গান, ব্যান্ড শো। শোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেলার শেষ অর্থাৎ কারণ এ দিন মেলায় পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এদিন মেলায় যাবে শুধু নারীরা। তবে নারীরা তার স্বামীকে সাথে নিয়ে মেলায় প্রবেশ করতে পারবে। যুগ যুগ ধরে এ মেলা এ এলাকার মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনের সৃষ্টি করেছে।[৬২]

---

[৬১] আনোয়ার হোসাইন, ৩২, কাওয়াইল, গোপালপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

[৬২] আনিসুর রহমান, ৩০, শোলাকুড়ী, মধুপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

৫. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) ঃ এই দিনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জন্ম ও মৃত্যু দিন। ১২ রবিউল আউয়ালের এই পবিত্র দিনে মহানবী (সা:) দুনিয়ায় আগমন করেন এবং ওফাত লাভ করেন। তবে টাংগাইলবাসী দিনটিকে মহানবীর জন্মদিন হিসেবেই উদ্‌যাপন করে। এদিন মহানবীর (সা:) স্মরণে দোয়া মিলাদ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদে মসজিদে চলে নফল ইবাদত। শেষে থাকে তবারক। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বাড়ীতে এ দিনের উদ্দেশ্য দোয়া, মিলাদের আয়োজন করা হয়। সর্বোপরি টাংগাইলের মানুষ দিনটিকে গুরুত্ব দিয়ে উদযাপন করে।[৬৩]

৬. গায়ে হলুদ ঃ বিয়ের সম্পর্ক পাকপাকি হওয়ার পর সাধারণত কনের বাড়িতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা হয়। বরপক্ষের লোকজন কনের বাড়িতে গিয়ে কনেকে হলুদ মেখে দিয়ে আসে বলে এর নাম গায়ে হলুদ। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে হলুদ বাটা, সরিষা বাটা, মেহেদী পাতা বাটা, ধান, দুর্বা ইত্যাদি দিয়ে জল সাজিয়ে কনের সামনে রাখা হয়। কনের গায়ে হলুদ মাখার সময় কনের দাদী, নানী বা অন্য কেউ মেয়েলী গীত পরিবেশন করতে থাকে। গান, কৌতুক ও হাস্যরসের পরিবেশনা বাড়িতে বিয়ের বরবর সাজ বাড়িয়ে দেয়। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই কনের গায়ে হলুদ মাখানো শুরু হয় মূলত কনের রূপ লাবন্যকে বাড়িয়ে দিতেই এই হলুদ মাখনো। এটি হিন্দু সংস্কৃতিজাত একটি প্রথা তবে বর্তমানে এটি সার্বজনীন।[৬৪]

৭. ইছালে সওয়াব ঃ একটি নির্দিষ্ট দিনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করার জন্য যে অনুষ্ঠান বা আলোচনা সভা এই সভাকেই বলা হয় ইছালে সওয়াব মাহফিল। পূর্বে এটি সামাজিক উৎসব হিসেবে পরিগণিত না হলেও বর্তমানে এর ব্যাপ্তি। উদ্‌যাপন, গুরুত্ব এবং এই আলোচনা সভাকে কেন্দ্র করে যে সমাবেশ তার প্রেক্ষাপটে একে সামাজিক উৎসবের

---

[৬৩] আ: জলিল, ৬০, লোকাদেও, মধুপুর, টাংগাইল ০৫.০৩.১৯।

[৬৪] আরিফা চৌধুরী, ৩০, মধুপুর, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

কাতারে ফেলা যায়। পুরো টাংগাইল জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত মাদরাসা কর্তৃক এ সভার আয়োজন করা হয়। পুরো শীতকাল চতুর্দিকে এই ইছালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম সভা শোনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক সমাগম ঘটে। বাড়িতে বাড়ি আত্মীয়দের আগমন ঘটে। বাড়িতে থাকে ভাল খাবারের আয়োজন সাথে সাথে আলোচনা শেষে থাকে তবারকের ব্যবস্থা। মাহফিল ঘিরে বসে ছোট খাট মেলা। যা শিশুদের আকৃষ্ট করে। মেলায় কোরআন, ধর্মীয় বই, তসবিহ, জায়নামাজ, আতর, খেজুর মেসওয়াক ও টুপির দোকান ছাড়াও খাদ্য ও ফার্নিচারের দোকান বসে। অর্থাৎ যে কোন বিবেচনায় এটি একটি সামাজিক উৎসব।[৬৫]

৮. শারদীয় দুর্গোৎসব ঃ পুরো টাংগাইল জুড়েই কম বেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস। আর তাই তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পুজাও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে পুজা উপলক্ষে অস্থায়ী মন্ডপ স্থাপিত হয়। আর ঐ মন্ডপ ঘিরে বসে ৩-৭ দিনের মেলা। নানা বয়স ও ধর্মের মানুষ এ মেলায় অংশ গ্রহণ করে। পুজার সাথে চলে তুমুল বেচাকেনা ও আনন্দ। প্রতিবার দুর্গাপুজায় জেলা টাংগাইল ও তার মানুষজন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়।[৬৬]

৯. সুন্নাতে খাৎনা (মুসলমান উৎসব) ঃ সাধারণত মুসলমান ছেলেদের বয়স ৫-৭ বছর হলে তার লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কর্তন করা হয়। একে সুন্নাতে খাৎনা বা মুসলমানি বলে। ধর্মীয় রীতি মেনে হাজাম (যিনি মুসলমানি করান) এ কাজ সম্পন্ন করেন। পূর্বে এ কাজ অপেশাদার ও মান্ধাত্ত্বা আমলের রীতিতে করানো হলেও এখন ডাক্তার দিয়েই খৎনা দেওয়ার প্রচলন বেশি। খৎনার দিন সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ২/৩ দিন পর ধনী ব্যক্তিরা বড় আয়োজন করে সবাইকে খাওয়ান।[৬৭]

---

[৬৫] আ: আজিজ, ৬৫, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

[৬৬] শিশির ঘোষ, ৩২, টাংগাইল ০৩.০২.১৯।

[৬৭] বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ. ৬২।

১০. মহরম উৎসব ঃ টাংগাইল শহর ও আশেপাশের অল্প কিছু শিয়া মহরম উৎসব তাদের নিজস্ব রীতিতে পালন করেন। যেমন শোক প্রকাশ, তাজিয়া মিছিল বের করা ইত্যাদি। এছাড়া পুরো টাংগাইল ব্যাপী দোয়া, মিলাদ ও তবারক বিতরণ এর মধ্যেই এই মহরম উৎসব উদযাপন করা হয়।[৬৮]

১১. চেহলাম ঃ টাংগাইলে চেহলামকে চল্লিশা বা ফয়তা বলা হয়। সাধারণত কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার মৃত্যু ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা ও ঐ ব্যক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য ৪০ দিনের দিন একটি বড় ভোজের আয়োজন করে যাকে চল্লিশা বলা হয়। তবে এখন আর এটি ৪০ দিনেই করা হয় এমন নয়। ৩ দিন হতে ৪০ দিন বা ১ বছর পর পর্যন্ত পরিবার তার সুবিধাজনক সময়ে চেহেলাম অনুষ্ঠান করে থাকেন। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সকলের নিকট মাফ চাওয়া ও দোয়া প্রার্থণাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।[৬৯]

১২. বিবাহ উৎসব ঃ টাংগাইল জেলায় প্রচলিত হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়। বিবাহপূর্ব, বিবাহকালীন এবং বিবাহত্তোর পর্ব। এ সকল পর্বের মধ্যে পাত্র পাত্রী দেখা, আঁবাদ, বাটা করা, গায়ে হলুদ, পানচিনি, ইজার কবুল, ওয়ালিমা, ফিরানি, হাটুভাংগা প্রভৃতি হলো অন্যতম। এর মধ্যে বিয়ের গীত বিয়ের আয়োজনকে আরও রাঙ্গিয়ে দেয়।

বিবাহপূর্ব পর্বে পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষকে নানাভাবে যাচাই বাছাই করে। এক্ষেত্রে কনের সৌন্দর্য, পরিবার, বংশ বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে পাত্র পক্ষকে খুশী করার সামর্থ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিবাহকালীন পর্বে কনেকে শশুড়বাড়ী গিয়ে নানা রকম বুদ্ধির পরিক্ষা দিতে হয়। তবে বিবাহের সময় বরের কাছ হতে কনে যা যা পায় তা হল-

---

[৬৮] আসলাম তালুকদার, ৫০, বাসাইল, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

[৬৯] এমদাদুল হক, ৫০, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল ০৩.০৩.১৯।

নাকফুল, কসমেটিকস, শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, জুতা প্রভৃতি। নাকফুল ও সিংরি (সিংরানি) বরপক্ষকে দিতেই হবে।

বহুল প্রচলিত একটি বিয়ের আসরের গীত হলো–

হাতে ঝিলমিল রাখী রে
দাঁতে ঝিলমিল মেশি রে
কাজলা নশা হাসে রে
রুমাল মুখে দিয়া রে
কন্যা কান্দেরে মায়ের কোলে বইসা
এমন সুন্দর মাও থুইয়া
কেমনে যাবো চলিয়া
নওসা হাসেরে রুমাল মুখে দিয়া
কন্যা কান্দেরে বাপের কোলে বইসা।[৭০]

বিয়ের পর কনে পক্ষ বর পক্ষের বাড়িতে মোটামুটি ঘড় গৃহস্থালির সকল সামগ্রী প্রেরণ করে থাকে। ওয়ালিমায় বর পক্ষ কনে পক্ষকে দাওয়াত দেয়। দাওয়াত খেয়ে বরকে সহ কনে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় একে বলে ফিরানি। ৩ দিন পর বর পক্ষ ছেলে বউ কে নিতে আসে। এই পর্যায়ে নতুন বউ শশুড় বাড়িতে ৭ দিন থাকে। ৭ দিন পর বাবার সাথে বাড়ি যায় একে বলে 'আটুভাংগা'। এভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। এটি রীতিমত একটি হুলস্থুল সামাজিক উৎসব।[৭১]

১৩. ঈদ উৎসবঃ

মুসলিম ধর্মাম্বলীদের দুইটি ঈদই হয়ে উঠে সবার জন্য আনন্দময় সম্মিলনের প্রধানতম উৎসব। বিশেষ করে রোজার ঈদের পর টাংগাইলের বিভিন্ন স্থানে ঈদ মেলার আয়োজন এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। টাংগাইলের মানুষ রোজার ঈদকে ছোট

[৭০] সবুরা বেগম, ৫৭, অলিপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ০৫.০৩.১৯।
[৭১] হেলাল উদ্দিন, ৪৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.১৯।

ঈদ আর কোরবানীর ঈদকে বড় ঈদ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এ নাম করনের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না। এলাকা বা গ্রাম ভেদে ঈদ মেলা ৭দিন থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। বেশ জোড়শোড়েই চালানো হয় প্রচার প্রচারণা। বৈচিত্রময় উপকরণের কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়। মেলার প্রধান আকর্ষণ ছোট বাচ্চাদের খেলার সামগ্রী। চিত্তবিনোদনের জন্য থাকে পুতুল নাচ ও স্থানীয় ও জেলা পর্যায় থেকে আসা শিল্পীদের নানা পরিবেশনা। কখনও মঞ্চস্থ হয় যাত্রাপালা। আরও থাকে সাইকেল বাইচ, ধীর গতিতে মোটর সাইকেল চালনা, ঘুড়ি ওঠানো, হাডুডু খেলা, বায়োস্কোপ ইত্যাদি আনন্দ আয়োজন। যদিও আধুনিক সভ্যতার নীল ছোঁবলে এই আনন্দ আয়োজন অনেকটা বিলুপ্তির পথে।[৭২]

১৪. শব-ই-বরাত ঃ শব-ই-বরাত এর বাংলা প্রতিশব্দ হল ভাগ্য রজনী মুসলমানদের নিকট এ রাতের অপার মহিমা, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দার সারা বছরের রিযিক ও ভাগের ভাল মন্দ নির্ধারণ করে থাকেন। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা তাই এ রাতে নফল ইবাদতে মগ্ন থাকে। শব-ই-বরাত কে কেন্দ্র করে টাংগাইলের মধুপুর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে কিছু রীতিনীতি। মহিমান্বিত এ রজনীতে প্রতি বাড়িতে বাড়িতে হালুয়া রুটি ও ভালো ভালো খাবার রান্না করা হয়। বাড়ির মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। ইবাদত বন্দেগীর মাঝে মাঝে মসজিদে বিতরণ করা হয় তবারক। এবং শেষ রাতের মুসল্লিদের জন্য থাকে ভাল খাবারের ব্যবস্থা। এ রীতিনীতি ঐতিহ্যগতভাবে এ অঞ্চলে অনেক আগে হতেই চলে আসছে।[৭৩]

---

[৭২] মো: নজরুল ইসলাম, ৩০, ডুবাইল, গোপালপুর, টাংগাইল, ০৭.০৩.১৯।

[৭৩] মো: মোস্তফা কামাল, ৪৫, কোনাবাড়ী, মধুপুর, টাংগাইল, ২১.০২.১৯।

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে টাংগাইল জেলার অধিবাসীদের সামাজিক কার্যাবলী তথা অধিবাসীদের পরিচয়, বাসগৃহ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, প্রসাধনী এবং সামাজিক উৎসবসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে টাঙগাইল জেলার সাংস্কৃতিক জীবন তথা ভাষা ও সাহিত্য, মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্প, লোকশিল্প ও যাত্রা এবং সংবাদপত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

৪.১ ভাষা ও সাহিত্য

ভাষাঃ বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।

অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্-সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, মানুষ্য জাতি অর্থবোধক যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে।[১]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন কোন শব্দ ও বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।[২]

এক-এক গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলাজাত ধ্বনিপুঞ্জকে বলা হয় একটি ভাষা। দেশ-কাল-মানুষ ভেদে ভাষা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। সব দেশে, সবকালে, সব মানুষ যদি একই ধ্বনি উচ্চারণ করে একই মনোভাব প্রকাশ করতে পারত, তবে সমস্ত পৃথিবীতে সৃষ্টির শুরু থেকে একই ভাষা প্রচলিত থাকত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

---

[১] বাংলা ভাষা ব্যাকরণ, ৯-১০ শ্রেণি, পৃ. ১

[২] ঐ, পৃ. ১

বর্তমানে পৃথিবীতে ৩,৫০০ এর মত ভাষা বিশ্বে প্রচলিত।[৩]

এর মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক হতে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ ভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ ছাড়াও বারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাস করে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।[৪]

আঞ্চলিক ভাষাঃ

আঞ্চলিক ভাষা 'উপভাষা' হিসেবে পরিচিত মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দই হল আঞ্চলিক ভাষার প্রাণ।

ম্যাক্সমুলার বলেছেন,

The real and natural life of language is in its dealects. অর্থাৎ ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তার উপভাষাগুলিতে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন,

কোন স্থানের খাঁটি উপভাষা জানিতে হইলে সেই স্থানের অশিক্ষিত মানুষদের ভাষাকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই স্থানে আর একটি বিষয় জানা কর্তব্য যে, যে স্থলে দুইটি ভাষার সীমানা আসিয়া মিলিত হয়, সেই স্থানে উভয় ভাষার মধ্যবর্তী একটি উপভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহাকে দুই ভাষারই উপভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।[৫]

ড. সুকুমার সেনের মতে, কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষা ছাঁদকে উপভাষা (Dialect) বলে।[৬]

---

[৩] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৪] ঐ, পৃ. ১৩।

[৫] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৬২।

[৬] ড. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৩।

যে কোন স্থানীয় বা আঞ্চলিত ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে সেই জনগোষ্ঠীর ভাষা বিশ্লেষণ অতীব জরুরী। কারণ মানুষ ভাষার মাধ্যমেই মনের ভাব আদান প্রদান করে। কোন অঞ্চলের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের ভাষা, উপভাষার ব্যবচ্ছেদ ও স্বরূপ উন্মোচন জরুরী। টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ের আলোচনায় তাই টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা জানা জরুরী।

৪.২ টাংগাইল জেলার আঞ্চলিক ভাষা

টাংগাইলের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় মনের ভাব আদান প্রদান করে, প্রমীত ভাষা হতে খানিকটা বিকৃত ঐ ভাষাই টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা। অন্যান্য অঞ্চলের মতই টাংগাইলের উপভাষাও বৈচিত্রময়। টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা সরলতাপূর্ণ। টাংগাইলের আশেপাশের ৫টি জেলার অনেক শব্দই টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। টাংগাইলের লোক সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য ও প্রবাদ প্রবচনে এ ধারাটি লক্ষ্যণীয়।[৭]

টাংগাইল সদর থেকে জেলার চারদিকে ১০ মাইলের মধ্যে এর প্রভাব বেশি লক্ষ্যণীয়। রয়েছে নানারকম আঞ্চলিক শব্দ এবং উচ্চারণের ভিন্নতা। উত্তর এবং দক্ষিণের উচ্চারণে ভিন্নতা। উত্তর এবং দক্ষিণের উচ্চারণে পাওয়া যায় ব্যাপক পার্থক্য। এ জেলার উত্তরাঞ্চলের উচ্চারণের সাথে ময়মনসিংহ অঞ্চলের টান যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি দক্ষিণাঞ্চলের কিছু অংশ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলের টান কানে বেজে ওঠে। টাংগাইল জেলার মধুপুর অঞ্চলে গারো আদিবাসীদের বসতি রয়েছে। যাদের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন–

"মিখো চাবো চিখো রিংবো চেং চেং
চানাম বে চেং চেং চাওছে ওবাং
মাগেন কারি নাম জাওয়া।"

(গারো ভাষা)

---

[৭] ভাষা ও সংস্কৃতি, টাংগাইল (www.Tangail.gov.com)

বাংলা অর্থ– ভাত খাও, পানি খাও, টক খেয়ো না, টক খেলে পেটের ব্যাথা, ঘা শুকাবে না।

তরুন গবেষক শফিউদ্দিন তালুকদার তাঁর "ভূঞাপুরের জনজীবন ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে ভূঞাপুরের চরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, ভাষার উচ্চারণ ও শব্দের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ মেয়েলি ঝগড়ার অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন–

> ড্যাহরডা আগে ভালাই আছিলো। ব্যাবাক কাজেই এত ছুক্কল ধরে নাই। এত দগল-ফসল কথাও কই নাই। কতায় কতায় ফলনা-দকনাও দ্যাহায় নাই। পত্তি বিশুদভারে গোদাইর আটে যাওনের সোম হইস করছে কি কি আনোন নাগবো। এহন আমার কাছে কিছুই হইস করে না। আন্দন ঘরের বোগল দিয়াই আহে না।
>
> ওশরা তিঘাই দ্যারিবেরা দিয়া বাইর অইয়া আটে যায়। হইস করবো ক্যা? ঐ যে হুবুচুনি একটা হেংগা কইরা আনচে। এহন হে যা কয় তাই হোনে। তার হাতে একটা ব্যাফাস কতাও কয় না। এই ড্যাহরের নিগাই তো এত ডোমফাই।

বাংলা প্রমীত অর্থ:

ছেলেটা আগে ভালোই ছিল। কোন কাজেই খুঁত ধরে নাই। এত বেশি বাজে, বড় বড় কতাও বলেনি। প্রতি বৃহঃপতি বার গোদাইর হাটে যাওয়ার সময় কি কি বাজার আনা লাগবে জিজ্ঞাসা করতো কিন্তু এখন আর জিজ্ঞাসা করে না। বারান্দা দিয়ে বের হয়ে বাজারে চলে যায়। রান্না ঘরের ধার দিয়েও আসে না।

আর জিজ্ঞাসাই বা কেন করবে?

এক রূপসী বিয়ে করে নিয়ে এসেছে? তার সব কথাই শোনে? তার সাথে ঝগড়াও করে না। ওর জন্যই তো এত অহংকার করে?[৮]

---

[৮] ভাষা ও সংস্কৃতি, টাংগাইল জেলা, www.Tangail.gov.com.

এ রকম বহু আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণ আছে। এ জেলার উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায়।

আঃ হালিম খাঁ বলেছেন, টাংগাইল জেলার আঞ্চলিক ভাষা অনেকটাই মার্জিত, উন্নত এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার কাছাকাছি। খুবই সুস্পষ্ট এবং উজ্জল।[৯]

৪.৩ ভাষার পার্থক্য

বাংলা প্রমিত ভাষার সাথে টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বিদ্যমান। স্যার জর্জ গিয়ারসন এর (১৯০৩) প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে ভাষাতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ বাংলা ভাষার প্রধান ৪টি উপভাষা নির্ণয় করেছেন। যেখানে টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার অন্তর্ভূক্ত।[১০]

টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা পর্যালোচনা করে দেখা যায় এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার খুব কাছাকাছি, মার্জিত ভাষা। এটি কোনমতেই দুর্বোধ্য হয়।

উপভাষা হওযার কারণে প্রমিত ভাষার সাথে এর কিছুটা পার্থক্য আছে। উচ্চারণ গত কিছু ব্যাপারও লক্ষ্য করা যায়। আর বিশেষভাবে এটাও লক্ষ্যনীয় যে, টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা আশেপাশের জেলার শব্দ ভান্ডার থেকে শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ থেকে শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই আশেপাশের জেলার সাথে এই জেলার আঞ্চলিক ভাষার শব্দ চয়ন, উচ্চারণ এবং টানের সদৃশ্য রয়েছে।

নিচে টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা সঠিকভাবে বোঝানোর স্বার্থে প্রমিত ভাষার সাথে এর পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

১. অকাম = অকাজ

২. গাতা = গর্ত

৩. ঢিলা = আলসে

---

[৯] দৈনিক সংগ্রাম, একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

[১০] বগুড়া জেলার সমাজ সংস্কৃতি, মুহাম্মদ মাছুদুর রহমান, পৃ. ৭৬।

৪. অগর = ওদের

৫. গতর = শরীর

৬. অবা = অমন

৭. তফন = লুঙ্গি

৮. ঘাইরা = একগুয়ে

৯. তহিত = তালাশ

১০. ত্যাকত্যাকা = নরম

১১. থোয়া = রাখা

১২. হাছুন = ঝাড়ু

১৩. বিছুন = পাখা

১৪. কাহই = চিরুনি

১৫. জিরান = বিশ্রাম

১৬. চঙ্গ = মই

১৭. আত্তুর = হাতুড়ি

১৮. টোবলা = পোটলা

১৯. এবাই = এমনি

২০. হেবাই = সেই রকমই

২১. ছেপ = থুতু

২২. ঐডা = ওটা

২৩. ছেড়া = ছেলে

২৪. ছেড়ি = মেয়ে

২৫. জাইলা = জেলা

২৬. ট্যাহা = টাকা

২৭. কইতর = কবুতর

২৮. ডাট = অহংকার

২৯. বিগার = রাগ

৩০. বিছুন = বীজ

৩১. ভেছকি = ধমক

৩২. হিয়াল = শিয়াল

৩৩. বোরাক = বৃষ্টি

৩৪. ফটফটা = পরিস্কার

৩৫. খেউড়ি = চুলকাটা

৩৬. হাসা = সত্য

৩৭. ভেদর = কাদা

৩৮. বুদাই = বোকা

৩৯. বুজি = বড় বোন

৪০. ঢ্যাপঢ্যাপা = নরম

৪১. সাফ = পরিস্কার

৪২. বেমলা = অনেক

৪৩. মগা = ভোঁতা

৪৫. বাজান = বাবা

৪৬. শিমটাল = স্বার্থপর

৪৭. হাগা = মলত্যাগ

৪৮. মুতা = প্রশ্রাব করা

৪৯. ফাতরা = ফাজিল

৫০. ভোমাইরা = অনেক বড়

৫১. স্যাই = সেমাই

৫২. ভোটকা = মোটা

৫৩. কাহিলা = রোগী

৫৪. ওশ = শিশির

৫৫. নেংগুড় = লেজ

৫৬. ড্যালা = চোখ

৫৭. ফিড়া = পিঁড়ি

৫৮. নারাই = ঝগড়া

৫৯. খেশি = আত্মীয়

৬০. ফুচকি = উকি দেওয়া

৬১. ঠিলা = কলস

৬২. কাল্লা = মাথা

৬৩. ধুল্লা = ছোট

৬৪. ফইচ্‌কা = দুস্টু

৬৫. কুটাই = কোথায়

৬৬. টুপটুপা = রসাল

৬৭. নাও = নৌকা

৬৮. জাইরাম কি = দুস্টামি

৬৯. পাগাল = ধার

৭০. ওঠ = ঠোট।

৭১. আপনি কি কাল ঢাকা গিয়েছিলেন?

= আন্থে কি কাইল ঢাকা গেছিলাইন?

৭২. তোমরা কোথায় গিয়েছিলেন?

= তোমরা কুটাই গেছিলা?

৭৩. কে ওখানে?

= ক্যারা উনু?

৭৪. আল্লাহ ... তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ?

= আল্লাহ গো ... তুমি না ম্যালা ডাংগর অইয়া গেছ গা?

৭৫. তুমি কোন স্কুলে পড়?

= তুমি কোন ইস্কুলে পড়?[১১]

*** আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকারী:**

টাংগাইল জেলায় নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ মিলেমিশে বাস করে। যারা উচ্চ শিক্ষিত তারা অপেক্ষাকৃত কম কথা বলে আঞ্চলিক ভাষায়। তাদের মধ্যে প্রমিত বাংলায় কথা বলার প্রবণতা বেশি। এক্ষেত্রে শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। যেমন-

১. কৃষক
২. শ্রমিক
৩. কুলি
৪. কামার
৫. কুমার
৬. কবিরাজ
৭. জেলে
৮. তাঁতি
৯. মুচি
১০. ড্রাইভার
১১. দোকানদার
১২. রিক্সাচালক/ভ্যানচালক
১৩. মাঝি
১৪. হকার
১৫. বৃদ্ধ মানুষ

---

[১১] ভাষা ও সংস্কৃতি, টাংগাইল জেলা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, www.Tangail.gov.com.

৪.৪ আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন

বহুদিন যাবত টাংগাইলের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতগুলো জীবন ঘনিষ্ঠ প্রবাদ প্রবচন। এ প্রবাদ প্রবচনগুলো কোন শিক্ষিত সাহিত্যিক কর্তৃক সৃষ্ট হয়নি। বরং জীবন পথে চলতে চলতে নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে জীবনের সাথে মিলিয়ে সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করেছে। তবে অনেক অর্থপূর্ণ প্রতিটি প্রবাদ। নিচে আলোচনা করার মাধ্যমে এই প্রবাদ প্রবচনগুলোর অর্থ প্রকাশের প্রয়াস পেলাম–

১. উপকার করে কোন বুড়ি ধইরা আনতারখেতা (কাঁথা) পুড়ি।

অর্থ: কারও উপকার করলে তার কাছ থেকে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[১২]

২. ধলা বলদ পালের শোভা।

অর্থ: পরিপাটি অকর্মন্য ব্যক্তিকে দেখে তার প্রকৃত অবস্থা বিচার করা যায় না।[১৩]

৩. কী এর মধ্যে কী

পানতা বাতে ঘি।

অর্থ: গুরুত্বপূর্ণ কথার মাঝে অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করা।[১৪]

৪. বনে বনে মধু হয় না

সকল জনেই সাধু হয় না।

অর্থ: সবাই ভাল মানুষ না।[১৫]

৫. যার যাবার তার যাবো

ধোপার যাকে ক্ষার আর খৈল।

অর্থ: নিজের সামান্য ক্ষতি করে হলেও অন্যের ক্ষতি সাধন করা।[১৬]

---

[১২] রফিজ উদ্দিন, ৭০, পোড়াবাড়ি, ঘাটাইল, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[১৩] আঃ মালেক, ৬৩, ঘাটাইল, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[১৪] তায়েব আলী, ৭৩, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[১৫] আঃ রহিম, ৫০, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০৭.০৩.২০১৯।

[১৬] ময়ূরী বিবি, ৮৬, হাসনই মধুপুর টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

৬. গাই গুনে ঘি

মাও গুনে ঝি

গাছ গুনে গোটা

বাপ গুনে ব্যাটা।

অর্থ: উৎসভেদে পণ্যের গুণগত মান নির্ভর করে। ভাল উৎস হতে যা পাওয়া যায় তার গুণগত মান সব সময়ই ভাল হয়।[১৭]

৭. বাইরে ফিটফাট

ভিতরে সদরঘাট।

অর্থ: বাইরের রূপ দেখে মানুষকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না।[১৮]

৮. মানলে তালগাছ

না মানলে বালগাছ।

অর্থ: কাউকে মান্য না করলে কিছু করার থাকে না।[১৯]

৯. নাং করলে গায়ের ঠাকুর

মাছ খাইলে বিলের মাগুর।

অর্থ: যে কোন কাজে নেতৃত্ব স্থানীয় লোক/জিনিস গ্রহণ করা।[২০]

১০. পুরুষের রাগ বাদশা

নারীর রাগ বেশ্যা।

অর্থ: পুরুষের রাগ অনেক সময় মঙ্গলজনক হয় কিন্তু নারীর তা হয় না।[২১]

---

[১৭] রমিছা বেগম, ৭৬, তক্তার চালা, সখিপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[১৮] আহাম্মদ আলী, ৭০, কুমুল্লী, করটিয়া, টাংগাঈল, ০৭.০৩.২০১৯।

[১৯] ছোট মিয়া, ৭৫, করাতিপাড়া, বাসাইল, টাংগাইল, ০২.০৩.২০১৯।

[২০] সিরাজ আলী মিয়া, আগবিক্রম হাটি, টাংগাইল, ০২.০২.২০১৯।

[২১] আঃ খালেক, ৪০, ঝটাবাড়ী, মধুপুর, টাংগাইল, ০২.০৩.২০১৯।

১১. হিল (শীল) পাটায় ঘষাঘষি

মইচের (মরিচের) কাম হারা।

অর্থ: বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে পড়ে কখনও কখনও সাধারণ ব্যক্তির ক্ষতি হয়।[২২]

১২. যদি চলে পরে পরে

কার চেটে (পুংলিঙ্গ) বিয়া করে।

অর্থ: অন্যের কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণকারী কখনও নিজে কোন কাজের দায়িত্ব কাঁধে নিতে চায় না।[২৩]

১৩. আমি করি মাই মাই, (মা)

মায়ের চোখে পানি নাই।

অর্থ: যার জন্য ত্যাগ স্বীকার করি সে আমার জন্য কিছুই করে না।[২৪]

১৪. গল্পের নাম দম্পোজি

তুমি গল্পের জানো কি

গপ্পো জানে ছোট জায়

বাল দিয়া উঠান হুইরা যায়।

অর্থ: অল্প বিদ্যার দেমাগি মানুষকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা।[২৫]

১৫. বেশি বড় হইয়ো না, ঝড়ে ভাঙবো মাথা,

বেশি ছোট হইয়ো না, ছাগলে খাবে পাতা।

অর্থ: প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বড় বা ছোট হওয়া উচিত নয়। এতে বিপদ হয়।[২৬]

১৬. আত্তী (হাতি) গাতায় (গর্তে)

পড়লে চামচিকায়ও নাত্তি (লাথি) দেয়।

---

[২২] সেলিনা বেগম, ৩৫, আদালতপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[২৩] মজনু মিয়া, ৩৫, কৃষ্ণপুর, নাগরপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[২৪] আঃ লতিফ, ৬৫, ভাতকুড়া, টাংগাইল, ০৫.০২.২০১৯।

[২৫] আনোয়ার হোসাইন, ৩২, কাওয়াইল, গোপালপুর, টাংগাইল, ০২.০৩.২০১৯।

[২৬] ময়রী বিবি, ৮৬, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০২.০২.২০১৯।

অর্থ: প্রভাবশালী ব্যক্তি কখনও বিপদগ্রস্থ হলে নিরীহ শ্রেণির লোকও তাকে আঘাত করার চেষ্টা করে।[২৭]

১৭. অভাগী যেদিকে চায়,
সাগর শুকাইয়া যায়।

অর্থ: বঞ্চিত লোক সর্বদাই আশায় নিরাশ হয়।[২৮]

১৮. জোর যার, মুল্লুক তার।

অর্থ: শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভাব বেশী।[২৯]

১৯. জাতের মেয়ে কালাই (কাল) ভালা,
নদীর পানি ঘোলাই ভালা।

অর্থ: ভাল বংশের মেয়েরা চরিত্রবান হয়।[৩০]

২০. যার লাঠি, তার মাটি।

অর্থ: শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভাব বেশি।[৩১]

২১. যা দিব হাতে,
তাই যাব সাথে।

অর্থ: কর্মফলের উপরই মানুষের সব কিছু নির্ভর করে।[৩২]

২২. চোরে চোরে আলি (হালি)
এক চোরে বিয়া করে
আরেক চোরের শালি।

অর্থ: সমমনা লোকের সাথেই মানুষের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।[৩৩]

---

[২৭] রিয়াজ উদ্দিন, ৮৯, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ০৫.০২.২০১৯।
[২৮] আঃ জুব্বার, ৮০, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ০৭.০৩.২০১৯।
[২৯] আশরাফ আলী, ৭২, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০৭.০২.২০১৯।
[৩০] আঃ হামিদ, ৬৮, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০৫.০৩.২০১৯।
[৩১] শাহ আলম, ৩৪, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ১৮.০২.২০১৯।
[৩২] মিজানুর, রহমান, ৪৩, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ০১.০৩.২০১৯।
[৩৩] ফারুক আহমেদ, ৩১, চওনা, সখিপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

২৩. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস,

অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

অর্থ: ভাল বন্ধুর সঙ্গ সর্বনাশ ডেকে আনে অন্যথায় ডেকে আনে বিপদ।[৩৪]

২৪. বুইড়ার (বৃদ্ধ) বুদ্ধি তলায়

আর চেৎরার (অল্প বয়স্ক) গলায়।

অর্থ: অল্প বয়সের লোকের তুলনায় বয়স্ক লোকের তুলনায় বেশি।[৩৫]

২৫. আসল ঘরে মুসুর (মশারি) নাই,

ঢেঁহি (ঢেঁকি) ঘরে চান্দা।

অর্থ: মূলকাজ বাদ রেখে অন্য কাজ করা।[৩৬]

২৬. অল্প বিদ্যা ভয়ংকরি,

কথায় কথায় ডিকসেনারি।

অর্থ: অল্প জানা মানুষ বেশি বাড়ই করে।[৩৭]

২৭. এক সহে মায়

আর এক সহে নায় (নৌকায়)

অর্থ: মা ও খেয়াপারের নৌকা সকল অত্যাচার সহ্য করে।[৩৮]

২৮. বয়সকালে বেটা, শেষকালে টেকা

অর্থ: প্রথম যৌবনে পুত্র সন্তান যেমন প্রয়োজন, তেমনি বৃদ্ধ কালে টাকার প্রয়োজন।[৩৯]

---

[৩৪] ফজলুল হক, ৩৪, স্টেডিয়াম পাড়া, টাংগাইল, ০৭.০৩.২০১৯।

[৩৫] ফজর আলী, ৭০, আলমনগর, গোপালপুর, টাংগাইল, ০৯.০৩.২০১৯।

[৩৬] মোঃ তুলা মিয়া, ৩৫, গোপদ, মধুপুর, টাংগাঈল, ২১.০২.২০১৯।

[৩৭] জহির উদ্দিন, ৭০, সিংগুরিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২৩.০২.২০১৯।

[৩৮] হোসেন আলী, ৭৫, সুতি দিঘলীপাড়া, গোপালপুর, টাংগাইল, ২৫.০২.২০১৯।

[৩৯] সুরেশ চন্দ্র দাস, ৭০, ঘাসপাড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল, ২৬.০২.২০১৯।

২৯. সময়কালে বিয়া,

হাইঞ্জা (সন্ধ্যা) কালে বাতি

দিলেও যা, না দিলেও তা।

অর্থ: সময়ের কাজ সময়ে না করলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।[৪০]

৩০. কয়লা যায় না ধুইলে,

স্বভাব যায় না মইলে।

অর্থ: যার যে স্বভাব তা শত চেষ্টার ফলেও পরিবর্তন করা যায় না।[৪১]

৩১. যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।

অর্থ: যে যেমন তাকে ঠিক সেভাবেই মূল্যায়ন করা উচিত।[৪২]

৩২. যে কয় আয় লো,

তার নগেই (সাথে) যাই লো।

অর্থ: ভাল-মন্দ বিচার না করে হুজুগে সাড়া দেওয়া উচিত না।[৪৩]

৩৩. চুক্কা চুক্কা কথা কয়,

হেইভাই আমার ননদ হয়।

অর্থ: ননদের প্রতি ভাবির বিরক্তি প্রকাশ।[৪৪]

৩৪. পঁচা শামুকেও পা কাটে।

অর্থ: অবহেলিত ব্যক্তির দ্বারাও ক্ষতি হতে পারে।[৪৫]

---

[৪০] চাবেদ আলী, ৬৫, ভাইঘাট, ধনবাড়ী, টাংগাইল, ০৯.০৩.২০১৯।

[৪১] আঃ সাত্তার, ৬৮, কালামাঝি, মধুপুর, টাংগাঈল, ২৮.০২.২০১৯।

[৪২] রমজান আলী, ৬৯, উত্তর মান্দিয়া, ফলদা, গোপালপুর, টাংগাইল, ২৮.০৩.২০১৯।

[৪৩] মসলিম উদ্দিন, ৭০, সুন্দর, বাসাইল, টাংগাইল, ২৮.০২.২০১৯।

[৪৪] সুরুজ মিয়া, লোকদেও, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[৪৫] সামস উদ্দিন, ৬৫, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ২৮.০২.২০১৯।

৩৫. এক পেট কুত্তায়ও পালে।

অর্থ: একক ব্যক্তির খাবারের অভাব হয় না।[৪৬]

৩৬. আদরে আদরে বউ নাল (লাল) হয়।

অর্থ: বেশি আদরে বউ নষ্ট হয়।[৪৭]

৩৭. ওস্তাদের মাইর শেষ রাইতে।

অর্থ: নেতা সব শেষে আসরে আসেন।[৪৮]

৩৮. কুত্তার পেটে ঘি অজম (হজম) হয় না।

অর্থ: অভ্যাস না থাকলে বেমানান হয়।[৪৯]

৩৯. অতো নালি আদে সের না।

অর্থ: বেশি ক্ষমতা দেকালে কটাক্ষ করে বলা হয়।[৫০]

৪০. বেশি কথায় খ্যাতা (কাঁথা) আড়ায় (হারায়)

অর্থ: বেশি কথা বললে আসল কথা বাদ পড়ে।[৫১]

৪.৫ সাহিত্য

সাহিত্য হলো জাতির মানদণ্ড। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে জাতির উত্থান ও পতন নির্ভর করে। যুগে যুগে জাতির সৃষ্টিগত ঐক্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে এই সাহিত্যকে নির্ভর করেই।[৫২]

---

[৪৬] আঃ মালেক, ৭২, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ০১.০৩.২০১৯।

[৪৭] আঃ খালেক, ঝটাবাড়ী, মধুপুর, টাংগাইল, ০২.০৩.২০১৯।

[৪৮] আমিন মিয়া, ৩১, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০২.২০১৯।

[৪৯] মামুন, ৬০, নতুন বাজার, মধুপুর, টাংগাঈল, ০৩.০৩.২০১৯।

[৫০] জাহিদুল ইসলাম, ৪০, কালামাঝি, মধুপুর, টাংগাইল, ২৩.০২.২০১৯।

[৫১] নাজিম উদ্দিন, ৩৪, দওগ্রাম, মধুপুর, টাংগাইল, ২৭.০২.২০১৯।

[৫২] বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, মুহাম্মদ মাছুদুর রহমান, পৃ. ৮৩।

ইহা অনুসরণ করে পরবর্তী জাতির লোকেরা সজাগ হয়েছে এবং আগের ভুলত্রুটি মোচন করে উন্নতির শিখরে উঠেছে। সাহিত্য হলো জাতির দর্পণ স্বরূপ। আয়নায় যেমন কোন কিছুর প্রতিবিম্ব ভেসে উঠে তদ্রুপ কোন জাতির সমকালীন সাহিত্য অধ্যায়ন করলে তৎকালীন সময়ের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি অর্থনৈতিক তথা মানব জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

সাহিত্য এক অমল চিত্তাকর্ষক ভেতরে বাইরে যার সমপর্যায়ী আঘ্রান। এক অনিত্য অবস্থা থেকে নিত্যকালের হয়ে ওঠা সাহিত্যের মাধ্যমে সম্ভব। চিত্তবৃত্তির এমন বহিঃপ্রকাশ অন্য কোন শিল্পে দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য–

অন্তরের জিনিসকে বাহিরের ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্ব মানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ। যুগে যুগে মানবের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ, বিরহ আনন্দ, ব্যাথাবেদনা ও তার অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান কবি সাহিত্যিকগণ। আকারে-প্রকারে ভাবে ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলেই তার বেঁচে থাকা। সাহিত্যের বিশাল ভুবনের অংশীদারিত্ব নিতে গিয়ে কেউ সফলতার চুড়ায় আরোহন করেন, কেউ ব্যর্থতার গ্লানি বুকে নিয়ে বেড়ান। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের যে ঐতিহ্যের কথা আমরা বলে থাকি, সেখানেও কথা আমরা বলে থাকি, সেখানেও রয়ে গেছে সেই বহিঃপ্রকাশের ইঙ্গিত।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি সাহিত্যের বিস্তৃতি ভূ-ভাগ জুড়ে প্রতিনিয়তই যে সৃষ্টির উন্মাদনা লক্ষ্য করে আসছি, তাকে একটি ধারাবাহিক সৃষ্টির ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন- গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রহসন, ছড়া, প্রবন্ধ এগুলো যে বিভিন্ন সময়ে লেখকের অন্তহীন প্রচেষ্টার এক একটি সাক্ষ্য, এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি,

তা ভুললে চলে না। একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ অর্থাৎ তার সমগ্র জানতে হলে তার সাহিত্যের ইতিহাসকে অনিবার্যভাবে জানতে হবে এবং পাঠবাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৪.৬ টাংগাইল জেলার সাহিত্যের ইতিহাস

অভিসন্দর্ভের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে বাংলাদেশের যে কয়টি স্থানের অস্তিত্ব ছিল তাদের মধ্যে বর্তমান টাংগাইল জেলা অন্যতম। প্রাচীন অঞ্চল হওয়ায় এখানকার মানব বসতির ইতিহাসও প্রাচীন। ইতোমধ্যেই এটা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, যেখানেই মানুষ সেখানেই সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি। তাই টাংগাইল জেলার শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যের যে পদ যাত্রা তার মাধ্যমেই টাংগাইলের সামগ্রিক সমৃদ্ধি। নিচে টাংগাইল জেলার সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম।

প্রথম পর্যায়ঃ

প্রথম পর্যায়টাকে টাংগাইল জেলার সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলা যেতে পারে। কারণ এই পর্যায়ে কেবল সাহিত্যের অভিমুখে যাত্রার শুভারম্ভ। এদের মধ্যে প্রথমেই যে ব্যক্তিটির নাম ভেসে উঠে তিনি হলেন মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন (১৮৩২-১৯০৮) তিনি বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম কোরআন শরীফ বাংলায় অনুবাদ করেন।

তিনি বোখারী শরীফ অনুবাদ করেন। তিনি 'আখবারে এস্থলামিয়া, পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ছোট বড় মিলিয়ে রচনা করেছেন ৫০ টির অধিক গ্রন্থ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো– জোব্দাতুন মাসায়েল (১৮৯২), ফতোয়ায়ে আলমগীরী (১৮৯২) ইত্যাদি। প্রথম দিকে তার এ জ্ঞানচর্চা টাংগাইলের সাহিত্য জগৎকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সাহিত্যের চর্চা সব সময়ই বিশেষ ব্যক্তিবর্গ করে থাকে। সাহিত্য কখনোই সর্বসাধারণে বিষয় ছিলো না। সাহিত্য অনুধাবনও সে মতে চর্চা করার জন্য আলোকিত ও অনুসন্ধ্যিৎসু মনের প্রয়োজন। প্রাচীনকালে কেবল উচ্চ বিত্তরাই শিক্ষিত হতো এবং সাহিত্রের চর্চা করত। টাংগাইলের সাহিত্যের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমে সাহিত্যের চর্চা ছিল রাজবাড়ী কেন্দ্রিক। অর্থাৎ রাজা-জমিদার, শিক্ষিত ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়বর্গই কেবল সাহিত্যের চর্চা করত।[৫৩]

প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা টাংগাইলের সাহিত্যের আকাশে নক্ষত্রের মত উজ্জল কয়েকজন ব্যক্তিকে পাই যারা সাহিত্য চর্চায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে টাংগাইলের এ সাহিত্য ছিল ধর্ম নির্ভর লেখা ও নীতিমূলক প্রবন্ধের উপর নির্ভরশীল।

তবে কেউ কেউ রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক লেখাও লেখেছেন যেমন সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এদের মধ্যে অন্যতম।[৫৪]

২য় পর্যায়ঃ

টাংগাইলের সাহিত্য বিকাশের যে ইতিহাস এর মধ্যে ২য় পর্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে দেশপ্রেম, রাজনৈতিক জাগরণ, সামাজিক সংস্কার, আন্তর্জাতিকতা ও আধুনিকের জনগান গাওয়া হযেছে সাহিত্যে। টাংগাইলের সাহিত্যের এই পর্যায়ের বিকাশও ঘটেছে কতগুলো ব্যক্তির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যার কথা প্রথমেই আসে তিনি হলেন প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। সা'দত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ। তিনি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা, প্রতিবাদমুখর লেখা লেখেছেন। এছাড়া ইসলামী জাগরণও তাঁর লেখার অন্যতম দিক। ইবরাহীম খাঁ এর বিখ্যাত নাটকগুলো হলো আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, কাফেলা।

---

[৫৩] রহমান, মোঃ লুৎফর, টাংগাইল জেলার লেখক অভিধান, পৃ. ৩৭।

[৫৪] ঐ, পৃ. ৩৮।

তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– সোনার শিকল। বিখ্যাত প্রবন্ধ উস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র।[৫৫]

এই বিখ্যাত লেখকের ক্ষুরধার লেখনীতে টাংগাইলের সাহিত্যের বিকাশ ব্যাপকভাবে তরান্বিত হয়।

২য় পর্যায়ে টাংগাইলের বাংলা সাহিত্যের বিকাশকে আরো একজন ব্যক্তি ব্যাপকভাবে তরান্বিত করেছেন তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী ফজিলাতুন্নেছা জোহা। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে শুধু সাহিত্য নয়, নারী শিক্ষাকে দিয়েছেন অন্যরকম মাত্রা।

ফজিলাতুন্নেছা জোহা ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যেমন ছিলেন নারী শিক্ষার ব্রতী তেমনি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলো টাংগাইলের সাহিত্য জগৎ তথা বাংলা সাহিত্যের ধারাকে করেছে বিকশিত।

৩য় পর্যায়ঃ

দেশে দেশে যখন যুদ্ধের ঝনঝনানি এবং চর্তুদিকে অন্যায়, রেষারেষির বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক তখনই সাম্য ও শান্তির বাণী ছড়িয়ে বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়েছে টাংগাইলের কয়েকজন সাহিত্যিক। আবদুস সাত্তার (১৯২৮-)। এই বিখ্যাত ব্যক্তি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সম্পাদক হিসেবে। অবসর গ্রহণ করেন। নিজে ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তাই তার লেখনি ছিল বহুমাত্রিক। করেছেন বহু দেশ ভ্রমণ। প্রায় ১০০ গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। বিশেষ করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি বেশি সংখ্যক বই রচনা করেছেন। বইগুলো হয়েছে পাঠক সমাদৃত এবং উপজাতী সম্পর্কে তথ্য ভান্ডার।

অরণ্য জনপদ, অরন্য সংস্কৃতি, ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

---

[৫৫] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৩৯।

৩য় পর্যায়ের টাংগাইলের সাহিত্যে যে ব্যক্তি বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি হলে বিখ্যাত লোক বিজ্ঞানী ও আশরাফ সিদ্দীকী। তাঁর লেখায় সবকিছু অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, মানবতা বোধ, আধুনিকতার অপূর্ব মিশেলে তিনি তার প্রতিটি লেখাকে সাজিয়েছেন। আশরাফ সিদ্দিকীর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি লোকবিজ্ঞানী। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি নানা অজানা বিষয় সংগ্রহ করেছেন। লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব তিনি তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তিনি এই অঞ্চলের গান, মেলা, লোকপ্রযুক্তি, লোকাচার, আঞ্চলিক শব্দ ভান্ডার ও সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবন প্রণালী নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। এর বাইরে তিনি গল্প, কবিতা ও শিশুতোষ গ্রন্থও রচনা করেন।

নাটক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা, বাংলা সাহিত্যের যে শাখাটি অতি দ্রুত প্রসার ও সার্থকতা লাভ করেছে তার মধ্যে বাংলা নাটক অন্যতম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মীর মশাররফ হোসেনের হাত ধরে এগিয়ে চলা নাটকের গতিকে আরো খানিকটা ছন্দময় করতে টাংগাইলের যে সাহিত্যিক অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে তিনি মামুনুর রশীদ। টাংগাইলের ঘাটাইলে জন্ম গ্রহন করেছেন এই কৃতি সন্তান। মামুনুর রশীদ নাট্যকার, নাট্যনির্মাতা এবং বিখ্যাত অভিনেতা। তার নাটক বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিকশিত করেছে ঠিক টাংগাইলের সাহিত্য অভিধানকে করেছে সমৃদ্ধ।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম হলো–

ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, ইংলিশ, এখানে নোঙ্গর, গিনিপিগ, জয়জয়ন্তী, সংক্রান্তি, রাঢ়াঙ্গ, সুন্দরি, ইতি আমার বোন, অর্পণ, পুত্রদায়, অসলপুর ইত্যাদি।[৫৬] তিনি এখনো বাংলা নাটককে এগিয়ে নিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

রফিক আজাদ ১৯৪১ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঘাটাইল থানার গুণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ভাষা সংগ্রামী, মুক্তিযোদ্ধা ও কবি। তাঁর কবিতায় প্রেম ও বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে।

---

[৫৬] উইকপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো–

অসম্ভবের পায়ে, সীমাবদ্ধ হলে সীমিত সবুজে, চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া, পাগলা গারদ থেকে প্রেমিকার চিঠি, প্রেমের কবিতা সমগ্র, বর্ষণে আনন্দে যাও মানুষের কাছে, বিরিশিরি পর্ব, রফিক আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, রফিক আজাদের কবিতা সমগ্র, হৃদয়ের কী বা দোষ, কোনো খেদ নেই, প্রিয় শাড়িগুলো হলো অন্যতম।[৫৭]

'ভাত দে হারামজাদা,' তাঁর বিখ্যাত কবিতা। যা তাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে একটি উজ্জল নক্ষত্র কবি আল মুজাহিদী। ষাটের দশকের কবি হিসেবে চিহ্নিত এই কবি পাঁচ দশক ধরে অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন। তিনি টাংগাইলের গৌরব, তিন দশকের অধিক সময় তিনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মূলত একজন কবি। তার কবিতায় প্রেম ও আধুনিকতা ফুটে উঠেছে।

তার বিখ্যাত কবিতাগুলো হলো-

'হেমলকের পেয়ালা', 'ধ্রুপদ' ও 'টেরাকোটা', 'যুদ্ধ নাস্তি', মৃত্তিকা অতি মৃত্তিকা, প্রিজন ভ্যান, ঈডের হ্যামলেট, 'প্রাচ্য পৃথিবী', 'পৃথিবীর ধুলো', 'সৌর জোনাকী', 'আল-মুজাহিদীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সন্ধ্যার বৃষ্টি', 'কলের বন্দীতে', 'পাখির পৃথিবী', 'আলবাট্রাসস', 'ভঙ্গুর গোলাপ', 'কাঁদো হিরোশিমা কাঁদো নাগাসাকি', 'পালকী চলে দুলকী আনে'।[৫৮]

তার বিখ্যাত উপন্যাসগুলো হলো–

'প্রথম প্রেম', 'চাঁদ ও চিরকুট', 'লাল বাতির হরিণ', 'আলোর পাখিটা', 'রুপোলি রোদ্দুর', 'ছুটির ছুটি', 'খোকার আকাশ', 'খোকার যুদ্ধ' প্রভৃতি।

---

[৫৭] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১১৭।

[৫৮] রহমান, মোঃ লুৎফর, লেখক অভিধান, পৃ. ১৪৭।

তাঁর বিখ্যাত ছোট গল্পগুলো হলো–

'প্রপঞ্চের পাখি', 'বাতাবরণ', 'ভরা কটাল মরা কটালের চাঁদ' প্রভৃতি।

শিশু সাহিত্যে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। যেমন-

'হালুম হুলুম', 'তালপাতার সেপাই', 'শেকল কাটে খাচার পাখি', সোনার মাটি রুপোর মাটি, ইস্টিশনের হুইসেল প্রভৃতি।

এছাড়াও প্রবন্ধ, গবেষণালব্ধ ও অনুবাদ সাহিত্যের তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। আধুনিক বাংলা কবিতাকে টাংগাইলের যে কবি দিয়েছেন নতুন মাত্রা তিনি হলেন কবি কুশল ভৌমিক। আপাদমস্তক একজন খাঁটি কবি হলেন কুশন ভৌমিক। তরুণ এই কবি মূলত প্রেম বিষয়ক কবিতা বেশি লিখেন। মেধা ও মননের বিকাশ ঘটিয়ে তিনি রচনা করে চলেছেন একের পর এক কবিতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই হলো– 'উল্টো হলে কাটছি সাঁতার', 'মৃতিকায় ধরে রাখি সবটুকু' হলো অন্যতম।

বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি টাংগাইলের সাহিত্য অঙ্গনেও এখন উত্তর আধুনিক যুগ চলছে। পূর্বের সেই কাব্য ধারায় এসেছে নতুন ছোঁয়া রাবীন্দ্রিক ঘরানার লেখালেখি বাদ দিয়ে আধুনিক কবিরা বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যকে অনুকরণ করার মাধ্যমে নতুন ধারার কাব্য, রচনা করছে। টাংগাইলের উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিকাশে যা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নতুন লিখন শৈলী, ছন্দ, বিষয়বস্তু, শব্দের ব্যবহার নিয়ে কবিতা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করছেন। টাংগাইলের আধুনিক কয়েকজন কবি সাহিত্যিক। এরা হলেন–

i) মাহফুজ মুজাহিদ

ii) মিশুক মঞ্জুর

iii) রাশেদ রহমান

iv) বিনয় চন্দ্র দে

v) রুদ্র মোস্তফা প্রমুখ

vi) মাহবুব হক বুলবুল।

উল্লিখিত কবি-সাহিত্যিকগণ আধুনিক ভাব ধারার লেখনির মাধ্যমে পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন ধারা প্রবর্তনের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করছে ঠিক তেমনি টাংগাইলের সাহিত্য চর্চাকে করছে সমৃদ্ধ।

৪.৭ মৃৎ শিল্পঃ

মাটি দিয়ে তৈরি হাড়িপাতিল বা পাত্রকে মৃৎ পাত্র বলে। আর মৃৎ পাত্র নির্মাণ সংক্রান্ত শিল্পকে বলা হয় মৃত শিল্প বলে।[৫৯]

মাটির পাক-পাতিল ব্যবহার এর রীতি টাংগাইলের গ্রাম অঞ্চলে সেই প্রাচীনকাল থেকে। মাটির পাত্র আর গ্রামীণ জীবন যেন এক সূত্রে গাঁথা। গ্রামীণ জীবনের প্রতি পরতে পরতে মৃৎশিল্পের ছোঁয়া রয়েছে।

মাটির নিত্যব্যবহার্য উপকরণ তৈরির ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তবে টাংগাইলে ঠিক কখন মাটির পাত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে তা জানা যায় না।

টাংগাইলের সূতি গোপালপুর, ভুপাইল পালপাড়া ও গোপালপুরের পালপাড়ায় গড়ে উঠেছে মৃৎ শিল্প।[৬০]

এ শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের কুমার বলে। বয়োবৃদ্ধ ও বিশেষজ্ঞদের ধারনা সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা, না থাকার কারণে এ শিল্পে তার অতীত গৌরব হারিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু মানুষ ঐহিত্য রক্ষার তাগিদে ও পেটের তাগিদে এ পেশা ও শিল্প দুটোই টিকিয়ে রেখেছে। এ পেশায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান তালে কাজ করে।

*** মাটি থেকে পাত্র বানানোর কৌশলঃ** মৃৎ শিল্পের সাথে জড়িত রঘুনাথ পার জানান, সাধারণত নদীর তীরের বা জমির মাটি দিয়ে সরা-হাঁড়ি-বাসন ও বিভিন্ন খেলনা তৈরি

---

[৫৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ২১৭।

[৬০] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৭১।

করা হয়। মাটি থেকে ময়লা আবর্জনা আলাদা করে প্রথমে তা পা দিয়ে পিষে নরম করা হয়। তারপর পাটের আঁশ মিশিয়ে জিনিসপত্র তৈরির উপযোগী করা হয়। মাটি প্রস্তুত করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে। মাটি তৈরির কাজ শেষ হলে বিভিন্ন সাজে ফেলে তা থেকে সরা-হাঁড়ি-বাসন তৈরি করা হয়। এরপর তা আবার রোদে শুকানো হয়। সবশেষে রং করে বিক্রির উপযোগী করা হয়।[৬১]

*** বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্রঃ** নিচে বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **কলসঃ** অনেকটা গোলাকার মাটির পাত্র। সাধারণত পানি রাখার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। দাম ৩০ টাকা থেকে ৭০ টাকার মধ্যে।[৬২]

২. **পাতিলঃ** এটিও গোলাকার। এটিতে সচরাচর ভাত রান্না করা হয়। ১৬-২০ টাকা এর দাম।[৬৩]

৩. **খোরা (ঢাকনা)ঃ** ভাতের পাতিলের ঢাকনা হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি গোল। দাম ১০-১৫ টাকা।[৬৪]

৪. **কোলা (বড় কলসি)ঃ** এটা কলসির মতই তবে কলসির চাইতে অনেক বড়। ধান, চাল রাখার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। দাম ৭০-১২০ টাকার মধ্যে।[৬৫]

৫. **কান কড়াইঃ** এটি দেখতে কড়াই এর মত। রুটি, চিতই পিঠা, ভাজি করতে এটি লাগে। দাম ১৩-২০ টাকা।

৬. **ভাঁপা পিঠার পাতিলঃ** এটি ভাত রান্নার পাতিল এর চেয়ে একটু বড়। এটি দিয়ে ভাঁপা পিঠা তৈরি করা হয়। দাম ৩০-৪০ টাকা।[৬৬]

---

[৬১] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৭১।

[৬২] রহিমা খাতুন, ৪৮, ধলাপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল, ০৩.০৩.২০১৯।

[৬৩] রমিছা খাতুন, ৫২, চানপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ০২.০৩.২০১৯।

[৬৪] জরিনা খাতুন, ৬০, মাঝিরা, মধুপুর, টাংগাইল, ১২.০৩.২০১৯।

[৬৫] জমিলা, ৭০, আতিয়া, টাংগাইল, ২২.০৩.২০১৯।

[৬৬] খোদেজা খাতুন, ৪৫, মাগনতি নগর, মধুপুর, টাংগাইল, ১২.০২.২০১৯।

৭. **সাত খোলাঃ** এটি কড়াইর মত তবে ৭টি গর্ত আছে। সাত খোলা নামক পিঠা বানাতে এটি ব্যবহৃত হয়। দাম ১৪-২২ টাকা।[৬৭]

৪.৮ লোক শিল্পঃ

টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোক শিল্প। শুরু থেকে টাংগাইলের বিভিন্ন প্রান্তে এই শিল্পগুলো বিকশিত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

*** কাঁসা ও পিতল শিল্পঃ** টাংগইলকে প্রসিদ্ধ করেছে কাঁসা ও পিতল শিল্প। শুরু বাংলাদেশে নয় ভারতেও এই শিল্পের সুনাম ছিল।[৬৮]

টাংগাইলের কাঁসা ও পিতলের তৈজসপত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল সারা দেশে। অনুপম কারুকার্য ও গুণগত মানের জন্যই এই শিল্প বিখ্যাত হয়েছিল। কাগমারী, বাখিল, মগড়া ও সাকরাইন গ্রাম ছিল কাঁসা ও পিতলের শিল্পের জন্য বিখ্যাত। থালা, বাটি, গ্লাস, জগ, ঝারি, কলস, ডেকচি, লোটা, ঘটি প্রভৃতি তৈজসপত্র বানানো হয় কাঁসা ও পিতল দিয়ে। তবে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এবং এ্যালুমোনিয়াম হাড়ি-পাতিলের দাপটে এই শিল্প ডুবতে বসেছে।

*** তাঁত শিল্পঃ** বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। তাঁত শিল্প আমাদের ঐতিহ্যের ধারক। টাংগাইল জেলা সেই শিল্পের অন্যতম অংশীদার। তাঁতের শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা উৎপাদিত হয় টাংগাইলে। এর মধ্যে শাড়ি বেশি বিখ্যাত।

টাংগাইলের সুতি, সফট সিল্ক ও কটনের শাড়ি তৈরি হয়।[৬৯]

টাংগাইলে তাঁতিদের 'জোলা' বলে। মন মতানো রং, মনোহর ডিজাইন ও টেকসই সুতার জন্য টাংগাইলের তাঁতের শাড়ি সবার প্রথম পছন্দ। বলা হয়ে থাকে-

---

[৬৭] আমিনা খাতুন, ৪৫, বাহিতকহি, মধুপুর, টাংগাইল, ১২.০৩.২০১৯।

[৬৮] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৫৯।

[৬৯] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১২৫।

খাল-বিল, নদী-নালা

গজারির বন,

টাংগাইলের শাড়ি তার

গরবের ধন।[৭০]

*** মিষ্টি শিল্পঃ** মিষ্টি উৎপাদনের জন্য টাংগাইল বিখ্যাত। টাংগাইলের চমচম টাংগাইলের অহংকার।

টাংগাইলের চমচম ২০০ বছরের ঐতিহ্যের ধারক।[৭১]

চমচম ছাড়াও দানাদার, রসগোল্লা, আমিত্তি, জিলাপি, সন্দেস, বিভিন্ন প্রকার দই, খির, নই টানা, খাজা, কদমা বাতাসা ইত্যাদি।[৭২]

মিষ্টির রাজা হিসেবে খ্যাত চমচম টাংগাইলে শহরের একটু দূরে পোড়াবাড়ী নামক স্থানে তৈরি হয়। এই চমচম শুরু দেশে নয় বিদেশেও প্রশংসিত।

*** পাটি শিল্পঃ**

বেতকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে গড়ে উঠে পাটি শিল্প। এ শিল্পের সাথে জড়িত হিন্দু নাথ ও যোগী সম্প্রদায়।[৭৩]

জীবন ও জীবিকার জন্য এরা পাটি তৈরিকেই বেছে নেয় পেশা হিসেবে। নানা রকম পাটি তারা তৈরি করে যেমন- বিয়ের পাটি, নামাজের পাটি, সাধারণ পাটি, বুকার পার্টি, পিঠের পাটি ইত্যাদি।[৭৪]

---

[৭০] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১২৫।

[৭১] ঐ, পৃ. ১৬৪।

[৭২] ঐ, পৃ. ১৬৪।

[৭৩] ঐ, পৃ. ১৬৭।

[৭৪] ঐ, পৃ. ১৫৮।

মধুপুর উপজেলার রক্তিপাড়া, গাংগাইর, বেকারকোনো, কালামাঝি, ঘাটাইলের পাকুটিয়া ও কালিহাতীর বাঘুটিয়া অঞ্চল এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।[৭৫]

*** শিকা শিল্পঃ**

পাট ও রঙ্গিন সুতার মিশ্রণে তৈরি হয় শিকা। ঘড়ের দাওয়ায় বা দেওয়ারে শিকা টানিয়ে তাতে ঝুলিয়ে রাখা হয় নানা আসবাব ও প্রয়োজনীয় জিনিপত্র পাট কেন্দ্রিক এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের প্রচলন অনেক প্রাচীন।

মধুপুর উপজেলার কাকবাইদ, গোবুদিয়া, জলছত্র, জটাবাড়ি ও গাছাবাড়িতে এ শিল্প বেশ বিকশিত।[৭৬]

*** বাঁশ শিল্পঃ**

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত টাংগাইলের মধুপুর ও গোপালপুর উপজেলায় বাঁশ শিল্পের প্রচলন আছে। লোকজীবনের নানা স্তরে বাঁশের বিচিত্র ব্যবহার আছে। আর এ শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি পেশাজীবী শ্রেণি। বাঁশের বুক সেলফ, বসার মোড়া, মাছ ধরার যন্ত্র, দোয়ার দিয়ার, ঘুনি চাক, খালই, খাঁচা, ডালা, চালা, কুলা, পাইছা, টুকরি, চালুন, ফুলের ঝাড়, কলমদানী প্রভৃতি বাঁশ দিয়ে তৈরি।[৭৭]

টাংগইলের গোপালপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর ও ধনবাড়ীতে এ শিল্প বেশ উন্নত। এর মধ্যে মধুপুর উপজেলার রক্তিপাড়া, কালামাঝি, লাউফুলা, আলোকদিয়া, মলকা, কুড়াগাছা, রাধানগর, আম্বারিয়া, ধনবাড়ী উপজেলার ভাইঘাট, উখারিয়া বাড়ী, নরিল্যা, এবং গোপালপুরের সূতি ও ডুবাইন অঞ্চলে এ শিল্প সমৃদ্ধ।[৭৮]

*** নক্‌শি কাঁথাঃ** নক্‌শি কাঁথা পল্লী বাংলার এক প্রাচীন ও সুনিপুণ লোকশিল্প। নারীর হৃদয়ের সৌন্দর্য কল্পনার এক অনবদ্য বহিঃপ্রকাশ এ শিল্পে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

---

[৭৫] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৬৮।

[৭৬] ঐ, পৃ. ১৬৮।

[৭৭] ঐ, পৃ. ১৬৮।

[৭৮] ঐ, পৃ. ১৬৯।

গৃহকর্মের অবসরে নারীরা এ শিল্পে আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব শিল্পবোধের পরিচয়ে ফুটিয়ে তোলে প্রতিটি সেলাই এর ফোঁড়। রঙ্গিন সুতার ফোঁড়ে সাদা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলে লতাপাতা, ফুলপাখি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। নক্‌শি গাঁথাকে বলা হয় নারীর জীবনের আনন্দ-বেদনার কাব্য। মধুপুর উপজেলার গারো বাজার, মোটের বাজার, মহিষমারা, গোপালপুর, সাগরদীঘি, প্রভৃতি এলাকায় নক্‌শিকাঁথার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।[৭৯]

৪.৯ স্থাপত্য

ঐতিহাসিক স্থাপনা কোন অঞ্চলের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির দিক নির্দেশ করে থাকে। যে অঞ্চলে যত বেশি স্থাপনা অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি আছে ঐ অঞ্চল ততটা সমৃদ্ধ। টাংগাইল অঞ্চল যেহেতু সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল তাই এ অঞ্চলে কতগুলো ঐতিহাসিক স্থাপনা আছে। মুসলিম ও হিন্দু উভয়েরই ধর্মীয় স্থাপনা বিদ্যমান আছে। পাল, সেন আমলের প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য টাংগাইল অঞ্চলে লুকায়িত আছে।[৮০]

নিচে অন্যান্য নির্মাণশৈলীর কতগুলো প্রাচীন স্থাপনার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

*** ধনবাড়ি নবাববাড়ী মসজিদঃ**

টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর কোন সঠিক দিক তারিখ খুঁজে পাওয়া যায় না।[৮১]

মসজিদটি ধনবাড়ী নবাব মঞ্জিলের বাইরে দিঘীর পাড়ে নির্মিত। মুঘল স্থাপত্যে নির্মিত মসজিদটির আকার আয়তনে কয়েকবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ লাগোয় মিনার রয়েছে। মসজিদটি প্রায় ১০ কাঠা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।[৮২]

---

[৭৯] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১৭০।

[৮০] ঐ, পৃ. ৫২।

[৮১] বাংলাপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৮২] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ৫৩।

এর দৈর্ঘ্য ১৩.৭২ মিটার, এবং প্রস্থ ৪.৫৭ মিটার। তবে আকার পরিবর্তনের পর মসজিদটি বর্গাকৃতির হয়ে গেছে।[৮৩]

এ মসজিদের পূর্ব দিকে বহুখাজ বিশিষ্ট খিলান যুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ আছে। তবে মসজিদের প্রবেশ পায় মোট ৫টি। [৮৪]

এ মসজিদের পূর্ব দিকের তিনটি প্রবেশ পথ বরাবর এর অভ্যন্তরে কিবলা দেওয়ালে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রিয় মিহরাবের কুলিঙ্গিটি অষ্টভুজাকার ও বহু খাজ বিশিষ্ট খিলানযোগে গঠিত অলংকারহীন। কেন্দ্রিয় মিহরাবের পার্শ্বে একটি মিম্বার রয়েছে। মসজিদের ভিতরে সর্বত্র চীনামাটির টুকরা দ্বারা মোজাইক কর।[৮৫]

মসজিদটিকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। এবং দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ এখানে নামাজ পড়তে আসে এবং ইচ্ছা পূরণের জন্য তবারক দেয়।

*** আটিয়া মসজিদঃ**

করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী ১৬০৯ সালে (১০১৮ হিজরী) এই মসজিদ নির্মাণ করেন।[৮৬]

আয়তক্ষেত্রকার এই মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৫৯ ফুট, প্রস্থ ৪০ ফুট, ৭ ফুট পুরু এর দেওয়াল। একটি গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রকের কক্ষ এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দা নিয়ে গঠিত।[৮৭]

চারকোণে আটকোন বিশিষ্ট উচ্চ মিনার, মাঝে মাঝে কারুকার্যের বেষ্টনী। সর্বোপরি, আস্তর করা আধুনিক চূড়ামন্ডিত এই মসজিদ। পূর্ব দিকের খিলানে তিনটি প্রবেশদ্বার। এক প্রবেশদ্বার অন্যটি হতে বহু প্যানেল দ্বারা বিভক্ত। ওপরের অংশ খোদাই করা

---

[৮৩] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৩।

[৮৪] বাংলাপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৮৫] বাংলাপিডিয়া, ধনবাড়ী নবাব বাড়ী মসজিদ।

[৮৬] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৫৪।

[৮৭] ঐ, পৃ. ৫৪।

লিখিত ফলক ছাড়া আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলে বিভক্ত। কার্নিসের উপরিভাগ গভীরভাবে খোদিত ও দেওয়াল ছিদ্র যুক্ত।

পিপাকৃতি সছিদ্র ভিত এবং কারুকার্যখচিত তলদেশ বিশিষ্ট গম্বুজগুলোর শীর্ষদেশ খুব উঁচু। মসজিদটি মুঘল স্থাপত্য রীতির কিছু উপাদানের সঙ্গে মোগল পূর্ব রীতির কিছু সংমিশ্রণ পাওয়া গেছে।[৮৮]

*** হেমনগর জমিদার বাড়ি**

জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ১৮৮০ সালে মধুপুর উপজেলার আমবাড়িয়া থেকে গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল ইউনিয়নের সুবর্ণখালি গ্রামে নতুন রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। বাংলার রাজধানী তখন কলকাতা, আর সুবর্ণখালি ছিল বিখ্যাত নদী বন্দর। মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ও সুবিধার জন্যই হেমচন্দ্র বাড়ি পরিবর্তন করেন।[৮৯]

তবে যমুনা নদী বাক পরিবর্তন করায় জমিদার বাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়। পরে হেমচন্দ্র তিন কিলোমিটার দূরে আরও একটি রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। দোতলা বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঐ প্রাসাদের নাম 'পরী দালান'। সামনে পরীর ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। বাড়ির চারপাশে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। পরীর দালানের সামনেই ছিল দোতলা নাট ঘর। পানি পানের জন্য ছিল কুপ। আর গোসলের জন্য বিশাল পুকুর। সেখানে ছিল সান বাঁধানো ঘাট।[৯০]

ভবনের দেওয়াল, পিলার, ফটকে রঙ্গিন কাঁচ ব্যবহার করে ফুল,তারা, গাছ ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। অত্যন্ত কারুকার্যমন্ডিত, দামি বাড়ি ও অপূর্ব পাথরে মোড়ানো অগ্রভাগে দুইটি পরীর ভাস্কর্য সমৃদ্ধ বাড়িটি লতাপাতার অপরূপ নকশায় তৈরি।

---

[৮৮] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৫৪।

[৮৯] ঐ, পৃ. ৫৪।

[৯০] উইকিপিডিয়া, হেমনগর জমিদার বাড়ি।

বাড়িটি দিল্লী ও কলকাতার কারিনগররা তৈরি করেছে। মোট ৬০ একর জমির উপর বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে।[৯১]

*** আনন্দমাঠঃ**

মধুপুর উপজেলা সদরের গাঁ ঘেঁষে বয়ে চলা বংশাই নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল আনন্দমঠ। সন্ন্যাস বিদ্রোহের নেতা আনন্দগীর এই মঠ নির্মাণ করেছিলেন।[৯২]

তার নামানুসারেই এটি আনন্দমঠ নামে পরিচিতি লাভ করে। বংশাই নদীর পশ্চিম পাড়ে বর্তমান খাদ্য গুদামের উত্তর দেওয়াল সংলগ্ন ছিল আনন্দমঠের অস্তিত্ব। এখানে শিব পূজার্চনা করা হতো। নদীর পূর্ব তীরে মঠ সোজাসুজি ছিল আশ্রম। আনন্দ মঠ ও আনন্দ আশ্রমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় নদীর তলদেশ দিয়ে ছিল সুরঙ্গ। [৯৩]

এই পথ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় বিকল্প যোগাযোগের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই মঠটি শুধু পূজার্চনার জায়গাই ছিল না এটি ছিল সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রতীক। মধুপুর এর ঐতিহ্য ও গৌরব গাথার এক উজ্জল নিদর্শন এটি। ধারনা করা হয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি এই আনন্দমঠকে কেন্দ্র করেই লেখা। কালের বিবর্তনের নিশ্চিত হয়ে গেছে এই ঐতিহ্যের স্মারক।[৯৪]

*** আম্বাড়িয়া জমিদার বাড়ি**

মধুপুর উজেলার মির্জাবাড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত বংশাই নদীর তীর ঘেঁষে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই জমিদার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এই জমিদার বাড়ির কর্তা ছিলেন জমিদার হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র চৌধুরী প্রচুর মান শওকতের অধিকারী

---

[৯১] উইকিপিডিয়া, হেমনগর জমিদার বাড়ি।

[৯২] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, বাংলাদেশ একাডেমি, পৃ. ৫৫।

[৯৩] ঐ, পৃ. ৫৬।

[৯৪] সেলিম মিয়া, ৩৫, বোয়ালী, মধুপুর, টাংগাইল, ১৩.০৩.২০১৯।

ছিলেন। সাথে সাথে তিনি প্রজাহিতৈষি শাসক ছিলেন। জমিদার বাড়ির সামনেই ছিল ফলদ বৃক্ষের বাগান। এখনও ১০টি লিচু গাছ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরও আছে বিশাল পুকুর।[৯৫]

জমিদার বাড়ির পাশেই হেমচন্দ্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি ডারাঘর প্রতিষ্ঠা করেন। বংশাই নদীর তীরে একটি সাথে বাঁধা ঘাট নির্মাণ করেন। ঘাটটি এখনও 'রাজঘাট' নামে পরিচিত। [৯৬]

ঘাটের গোড়ায় তিনি একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। যা কালের সাক্ষী হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে।[৯৭]

১৮৮০ সালে যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে হেমচন্দ্র এ বাড়ি পরিত্যাগ করেন। বর্তমানে বাড়িটি প্রায় নিশ্চিহ্ন।

*** আইলাজোলা মসজিদ**

মধুপুর উপজেলা সদরের অদূরে আইলাজোলা মসজিদটি 'চালা' নামক গ্রামে অবস্থিত।[৯৮]

মসজিদটি বহু প্রাচীন। এর নির্মাণ বা নির্মাণকাল নিয়ে কোন সঠিক তথ্য জানা যায় না। জংগল পরিষ্কার করতে গিয়ে মসজিদটি আবিষ্কার করা হয়েছে। এ মসজিদ নিয়ে আছে অনেক কিংবদন্তি। কারো কারো মতে, এক ধনী ব্যক্তি তার 'জোলা' (তাঁতি' এর স্থানীয় নাম) নাম ঢাকতে অনেক টাকা খরচ করে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। যদিও মসজিদ নির্মাণের পর তাঁর 'জোলা' নাম আরও ছড়িয়ে পড়ে।[৯৯]

---

[৯৫] মোঃ মিজানুর রহমান সুমন, ৩২, আম্বাড়িয়া, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০২.২০১৯।

[৯৬] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৭।

[৯৭] বিনয় কুমার দে, ৩২, মির্জাপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

[৯৮] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৩।

[৯৯] নবাব আলী ফকির, ৬৩, নয়াপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

জংগল পরিষ্কার করতে গিয়ে সাড়ে ৭ হাত একটি কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। ধারনা করা হয়– কবরটি কোন সুফি ব্যক্তির।

লোক বিশ্বাস আছে এখানে মানত করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায়।[১০০]

*** ধনবাড়ী নবাব বাড়িঃ**

ধনবাড়ি নবাব প্যালেস টাংগাইল হতে ৬০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রথম প্রস্তাবক, এবং বৃটিশ সরকারের প্রথম মুসলিম মন্ত্রী সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর স্মৃতি বিজড়িত এই নবাব প্যালেস। ধারনা করা হয় মোঘল আমলে মনোয়ার খাঁন ও ইসপন্দিয়া খাঁন এই জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন।[১০১]

বংশাই ও বৈরান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রাচীন জমিদার বাড়িটি অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী এবং কারুকার্যে সত্যিই মনোহর এবং মনোমুগ্ধকর। পুরো একতলা প্রাসাদটি প্রাচীরে ঘেরা। প্রাসাদটি দক্ষিনমুখী ও দীর্ঘ বারান্দা সংবলিত। ভবনের পূর্ব দিকে বড় একটি তোরণ আছে। তোরণের দুই পাশে প্রহরীদের জন্য আছে দুই কক্ষ। তোরণটি নবাব আলী চৌধুরী বৃটিশ গভর্নরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরি করেন। প্রাচীর ঘেরা চত্বরে আবাসিক দুইটি ভবন ছাড়াও আছে ফুল বাগান, চিড়িয়াখানা, বৈঠকখানানা, নায়েব ঘর, কাচারি ঘর, ফুলের বাগান, পাইক-পেয়াদা কক্ষ ও দাসদাসি কক্ষ, প্রাসাদের বাইরেই ৩০ বিঘা জমির উপর বিশাল দিঘী আর দিঘীর পাড়েই নবাব বাড়ী মসজিদ অবস্থিত।[১০২]

*** করটিয়া জমিদার বাড়িঃ**

---

[১০০] মামুন মিয়া, ৪৫, চালা, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

[১০১] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৮।

[১০২] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৯।

টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার করটিয়া ইউনিয়নে করটিয়া জমিদার বাড়ি অবস্থিত। 'আটিয়ার চাঁদ' নামক গ্রন্থ হতে জানা যায় আফগান অধিপতি সোলায়মান খান পন্নী বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন সুদূর বাগদাদ থেকে। তাঁর বংশের ১১তম পুরুষ সাঈদ খান পন্নী করটিয়ায় জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাকৃতিক এবং নিরিবিলি পরিবেশে এই জমিদার বাড়িটি প্রায় ১ কি.মি. দীর্ঘ এবং ০.৫ কি.মি. প্রস্থ বিশিষ্ট প্রাচীরঘেরা সেখানে রয়েছে লোহার ঘর, রোকেয়া মহল, রাণীর পুকুরঘাট, ছোট তরফ দাউদ মহল, এবং বাড়ি সংলগ্ন মোঘল স্থাপত্যের আদলে গড়া মসজিদ। মোঘল ও চৈনিক স্থাপত্য রীতির মিশেলে আপনার মন কেড়ে নেবে।[১০৩]

*** মহেরা জমিদার বাড়িঃ**

টাংগাইলের অন্যতম ঐতিহ্যের নিদর্শন মহেলা জমিদার বাড়ি। স্পেনীয় স্থাপত্য রীতিতে এই জমিদার বাড়িটি আনুমানিক ১৮৯০ সালের দিকে নির্মিত হয়েছে।[১০৪]

জমিদার বাড়িটি ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়কের নাটিয়াপাড়া বাজার থেকে ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। জমিদার বাড়ির সামনেই রয়েছে 'বিশাখা সাগর' নামের এক দিঘী। বাড়িতে প্রবেশের জন্য আছে দুটি সুরম্যগেট। ভবনের পেছনে আছে পাসরা পুকুর এবং রাণী পুকুর। শোভাবর্ধনের জন্য আছে ফুলের বাগান।[১০৫]

রাজবাড়িতে বিভিন্ন নামে ভবন ছিল। যেমন- মহারাজ লজ, আনন্দ লজ, চৌধুরী লজ, কালী চরণ লজ, প্রার্থনা লজ, নায়েব ভবন, কাচারি ভবন প্রভৃতি।[১০৬]

*** নাগরপুর চৌধুরী বাড়িঃ**

---

[১০৩] উইকিপিডিয়া, করটিয়া জমিদার বাড়ি [পরিবর্তন, ডট.কম]

[১০৪] ঐ

[১০৫] ঐ

[১০৬] Banglanews.24.com.

নাগরপুর চৌধুরী বাড়ির প্রতিষ্ঠা যদুনাথ, চৌধুরী তিনি ৫৪ একর জমিতে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৭]

কলকাতা ও মোঘল স্থাপত্যের মিশেলে তৈরি বিশাল তিন তলা বাড়ি। অনেকগুলো বাসা নিয়ে নির্মিত এ বাড়ি দেখতে মনোমুগ্ধকার। এই তিনতলা অট্টালিকা ব্যতীত রাজবাড়ীতে ছিল ঝুলন্ত দালান, ঘোড়ার দালান, রংমহল, বৈঠকখানা, পরীর দালান। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ছিল সুশোভিত বাগান এবং চিড়িয়াখানা। যেখানে নানা রকম পশুপাখি ছিল। বর্তমানে এই বাড়ি নাগরপুর মহিলা কলেজ।[১০৮] তিনতলা অট্টালিকার ভেতরে সুদৃশ্য শ্বেত পাথরের কারুকাজ ছিল। যা যে কোন ব্যক্তির হৃদয়কে করতো বিমোহিত।

*** মদন গোপালের মন্দিরঃ**

রাজশাহীর পুটিয়ার নারী জমিদার হেমন্ত কুমারী দেবীর আমলে নির্মিত। মধুপুর উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। মদন গোপালের মন্দির মূলত একটি কৃষ্ণ মন্দির। তিনি মধুপুর নিত্যানন্দ সেবাশ্রম নির্মাণেও টাকা প্রদান করেন। মদন গোপালের মন্দির সাদামাটা এক তলা একটি ভবন নিয়ে গঠিত যার ৪টা কক্ষ রয়েছে।[১০৯] এখানে কষ্টি পাথরের শিবমুর্তি ছিল। এখনও বহু ভক্ত অনুরাগী পূজা অর্চনা করার জন্য এখানে সমাবেত হন।

৪.১০ লোক-প্রযুক্তিঃ

সুনিপুণভাবে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, উপকরণ, জিনিপত্রকে বলা হয় প্রযুক্তি। গ্রামীণ জীবনে মানুষের নানা ধরনের কাজ থাকে। আর এইসব কাজ সুনিপুণভাবে সম্পাদন করার জন্য মানুষ ব্যবহার করে নানাবিধ উপকরণ আর এগুলোকেই একত্রে বলে লোক-প্রযুক্তি।[১১০] গ্রামের মানুষ দৈনন্দিন সকল কাজেই

---

[১০৭] বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, টাংগাইল জেলা, নাগরপুর চৌধুরী বাড়ি।

[১০৮] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[১০৯] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৫।

[১১০] উইকিপিডিয়া, লোক প্রযুক্তি, (প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৪৩।)

কোন না কোন লোক প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। নিচে এমন কতগুলো প্রযুক্তির নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলো–

* **নৌকাঃ** লোক-প্রযুক্তির অন্যতম একটি নির্দশন হলো নৌকা। এককালে টাংগাইলের জলময় অঞ্চলে একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। টেকসই জাতীয় কাঠ দিয়ে নৌকা বানানো হতো। মাচাল, গলৈ, গুরা, বৈঠা, হাল, চৌড় এগুলো হলো নৌকা তৈরির উপকরণ। পাতাম দিয়ে তক্তার সাথে তক্তা লাগিয়ে তৈরি করা হয় নৌকা। বাচারি, খোসা, পানসি, করফাই, ব্যাপারী নৌকা এরকম আরও অনেক ধরনের নৌকা গ্রাম্য দারু শিল্পীগণ তৈরি করেন। বছরের বিভিন্ন সময় নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়।[১১১]

* **ভেলাঃ** বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। বর্ষা মৌসুমে চলাচলের জন্য প্রাচীন লোক-প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম হলো ভেলা।

যাদের নৌকা কেনার সামর্থ নেই তারা ভেলায় চলাচল করতো। সাধারণত বিচা (বিচিওয়ালা কলাগাছ) কলা গাছ দিয়ে ভেলা বানানো হয়। ৪ থেকে ৫টি গাছ একত্র করে তার মধ্যে বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে জোড়া লাগিয়ে বানানো হয় ভেলা। গ্রামাঞ্চলের সব মানুষ ভেলা বানাতে পারে। ভেলা খুব ধীরে ধীরে চলে কারণ এটি অনেক ভারী। তবে কিছু দিন পরই এই কলা গাছের ভেলা পঁচে যায়। [১১২]

* **পলোঃ** মাইকের হর্ণের মত বাঁশ দিয়ে তৈরি মাছ ধরার যন্ত্রকে বলে পলো।[১১৩] এটি দিয়ে গভীর ও অগভীর উভয় পানিতেই মাছ ধরা যায়। প্রথমে বাঁশ দিয়ে দুইটি চাক তৈরি করা হয় একটি ছোট আর একটি বড়। বাঁশ দিয়ে শলাকা তৈরি করা হয় এবং

---

[১১১] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ৫৪৩।

[১১২] মোশাররফ হোসেন, ৩৫, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

[১১৩] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৫৪৪।

গুনা বা পাঠ দিয়ে তা বাঁধা হয়। ফলশ্রুতিতে তৈরি হয় মাইকের মত পলো যন্ত্র। পূর্বে এই যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেশি ছিল।[১১৪]

*** ঢেঁকি:** ধান ভানার পুরাতন লোকযন্ত্র হচ্ছে ঢেঁকি। টাংগাইলের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এখনো ঢেঁকি দেখতে পাওয়া যায়। গৃহস্থের বাড়িতে ঢেঁকির পাড়ের শব্দ ও কচকচানি এক চিরচেনা শব্দ। ঢেঁকিতে শুধু ধান নয়, গম পাড়ানো, গমের ছাতু পাড়ানো, চালের গুড়া কোটা এবং চিড়া কোটা হয়ে থাকে। গ্রামীণ গরীব নারীরা অর্থের বিনিময়ে অন্যের ধান ভেনে দেয়। কেউ কেউ বাড়িতে ধান ভেনে চাল বাজারে বিক্রি করে। স্থানীয় ভাষায় একে 'বিরক' ভানা নামে পরিচিত। ঢেঁকি তৈরির একমাত্র উপকরণ কাঠ। দশ-বার ফুট লম্বা গাছের গুড়ি ছেটে এই ঢেঁকি তৈরি করা হয়। ঢেঁকির অগ্রভাগ একটু সরু। পেছনের অংশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। গোড়ার দিকের স্ফীত অংশে পা দ্বারা আঘাত করে ধান ভানা হয়। অর্থাৎ ঢেঁকির অগ্রভাগ উঠানামা করে। ঢেঁকির অগ্রভাগের ১ ফুট বা তার থেকে একটু কম স্থানে ছিদ্র করে গোলাকার একটি লাঠি ঢোকানো হয় যা নিচের দিক মোটা। এর শেষ প্রান্তে ধাতব রিং বসানো হয়। ধানের খোসা আলগা করতে যেটি সব থেকে বেশি ভূমিকা পালন করে। একে স্থানীয় ভাষায় 'ওচা' বলা হয়। ঢেঁকির ওচা বরাবর মাটিতে গর্ত করে সিমেন্টের বা কাঠের তৈরি বাটি আকৃতির নোট গেঁড়ে দেওয়া হয়। এটাতেই ধান, গম, চাল রেখে পাড়ানো হয়। সাধারণত শেওড়া, গাব, বেল, গামার গাছ দিয়ে ঢেঁকি তৈরি করা হয়।[১১৫]

*** জাতা:** ডাল, জব, গম ভাঙ্গার পুরাতন লোকযন্ত্র হচ্ছে জাতা। টাংগাইলের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এখনো জাতা দেখতে পাওয়া যায়। গৃহস্থ বাড়িতে জাতা খুবই প্রয়োজনীয়।[১১৬]

---

[১১৪] আঃ রেজ্জাক, ৬৪, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

[১১৫] আঃ হামিদ, ৬৫, পিংনা, ভূঞাপুর, টাংগাইল, ১৫.০৩.২০১৯।

[১১৬] দেলোয়ার হোসেন, ৪৮, ডুবাইল, গোপালপুর, টাংগাইল, ১৫.০৩.২০১৯।

*** চালুনিঃ** টাংগাইলের লোক জীবনে চালুনি এক অপরিহার্য গৃহস্থ উপকরণ। এটি বাঁশের তৈরি একটি ছাকনা বিশেষ। ধান, গম, সরিষা ইত্যাদি কৃষিপণ্যের মধ্যে মিশে থাকা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৃথকীকরণ কাজে চালুনি ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান উপকরণ বাঁশ ও গুণা। বাঁশ দিয়ে পাতলা ও চিকন বেতি তৈরি করা হয়। এই বেতিগুলো সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রেখে গোলাকৃতির চট তৈরি করা হয়। তারপর দেড়-ইঞ্চি প্রশস্ত বাঁশের বেতি দ্বারা একটি চাক তৈরি করে চটাটির বরাবর গুণা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়।[১১৭]

*** ডোলঃ** শস্য রাখার এক প্রকার আধার হচ্ছে ডোল। টাংগাইল গ্রামাঞ্চলে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। গৃহস্থ বাড়িতে এর প্রয়োজন অপরিহার্য বাঁশ দিয়ে পাতলা ও বেশ প্রশস্ত বেতি তৈরি করা হয়। তারপর উক্ত বেতি দ্বারা বর্গাকার একটি চটা তৈরি করা হয়। বর্গাকার চটাটির চারদিকে একই সাথে চারটি দেওয়াল বিশেষভাবে ও কৌশলে বুনে উপরের দিক তোলা হয়। ফলে দেখতে কাগজের তৈরি ঠোঙ্গার মত একটি বস্তু তৈরি হয়। তারপর উপরে প্রান্ত বরাবর এক-দেড় ইঞ্চি মোটা বাঁশের বেতি দিয়ে একটি চাক বানিয়ে লাগিয়ে দিলেই ডোল তৈরি হয়ে যায়।[১১৮]

*** হুকাঃ** লোকজীবনে ধূমপানের জন্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে হুকা। খেতে খামারে নিয়োজিত মজুর শ্রেণির লোকেরা দলীয়বাবে হুকা দ্বারা ধুমপান করে থাকে। বিড়ি-সিগারেট প্রচলিত হওয়ার আগে হুকাই ছিল ধূমপানের সহজ ও সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। নারকেলের শক্ত খোলসটির উপরিভাগে একটি ছিদ্র করে তাতে কাঠের তৈরি ফাঁপা নল লাগানো হয়। নলচেটির গায়ে অনেক সময় সুন্দর কারুকাজ থাকে। নলচের মাথায় মাটির তৈরি কল্কি থাকে যা প্রয়োজনে খোলা যায়। নাকেলের খোলটির একপাশে নলচের সংযোগ থেকে সামান্য নিচে আরেকটি ছিদ্র করা হয়। কল্কির মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেখানে তামাক দেওয়া হয়। আর নারিকেলের গোল

---

[১১৭] শফিকুল ইসলাম, ৩৫, কাচপাই, নাগরপুর, টাংগাইল, ১৫.০৩.২০১৯।

[১১৮] আঃ লতিফ, ৭০, কাচপাই, নাগরপুর, টাংগাইল, ১৫.০৩.২০১৯।

আঁচির মধ্যে পানি দিয়ে আঁচির নিচের ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে ধুয়া টেনে হুকায় ধুমপান করা হয়।[১১৯]

*** জাঁতি/ছরতা:** এটি সুপারি কাটার যন্ত্র। টাংগাইলে একে সরতা বলে অভিহিত করা হয়। লৌহ নির্মিত জাঁতির দুইটি অংশ। উপরের অংশ বাঁকা ধারালো ছুরির মত। নিচের অংশ লৌহ দণ্ড বিশেষ। উভয়ের এক প্রান্তে স্ক্রু সংযুক্ত থাকে। অপর প্রান্ত খোলা, নিচের দণ্ডে সুপারি রেখে উপরের অংশ চাপ দিয়ে সুপারি কাটা হয়। টাংগাইলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এই সুপারি কাটার যন্ত্র আছে।[১২০]

*** লাঙল:** লাঙল একটি বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কৃষিযন্ত্র। আধুনিক কৃষি যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে এটিই ছিল চাষাবাদের অপরিহার্য উপকরণ লাঙ্গল তৈরির উপকরণ হলো কাঠ ও লোহার ধারালো চেষ্টা একটি অংশ। মাটির সাথে সামান্য কৌণিক অবস্থায় একটি প্রশস্ত কাঠ থাকে যাকে বলে পৈঠা। এই পৈঠার সাথে উপরের দিকে প্রায় খাড়া কাঠ লাগানো হয় যা ক্রমশ অগ্রভাগের দিকে সরু হয়। সবার উপরে হাতে হাতল। লাঙল এর অগ্রভাগ জোয়ালের সাথে বেধে হাতল ঠিক করে ধরে লাঙল চালিয়ে হালচাষ করা হয়।[১২১]

*** মই:** মই একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কৃষি যন্ত্র। কাঠের অথবা বাঁশের তৈরি কৃষি যন্ত্রটি চাষাবাদের জন্য অপরিহার্য উপকরণ। মই তৈরির প্রযুক্তিতে বাঁশই প্রধান উপকরণ। টাংগাইলে মইকে চংগ বলে। এটি তৈরি করতে মোটা বাঁশ সমান দুইভাগে বিভক্ত করে এক ফুট দূরত্বে পাশাপাশি দুইটি করে ছিদ্র করতে হয়। তারপর ঐ দুই ছিদ্র দিয়ে বাঁশের কাঠি ঢোকানো হয়। এতে করে তৈরি হয়ে গেল মই বা চংগ।

---

[১১৯] আঃ মালেক, ৬৮, কাজীপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১২০] গোলবানু, ৬৮, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ১৫.০৩.২০১৯।

[১২১] আঃ জুব্বার, ৭৮, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ১৫.০৩.২০১৯।

চাষাবাদকৃত জমির মাটি সমান করতে মই লাগে। এছাড়া গাছ বা ঘরের চালে উঠতেও মই এর প্রয়োজন হয়।[১২২]

*** কোদালঃ** আধুনিক কৃষি যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কোদাল ছিল অন্যতম কৃষি যন্ত্র। কোদাল তৈরি করতে লোহার চেপ্টা অংশের বিপরীতে ছিদ্রযুক্ত অংশে কাঠ বা বাঁশের ২/৩ হাত লম্বা হাতল লাগানো হয়। ঐ হাতল ধরে কোদাল উঁচু করে চেপ্টা অংশ মাটিতে আঘাত করলেই মাটি উঠে আসে। গ্রামের সকল বাড়িতেই কোদাল থাকে।[১২৩]

*** গরু/মহিষের গাড়িঃ** মহিষ বা গরুর গাড়ি বানাতে লাগে দুইটি গরু/মহিষ, দুইটি বড় কাঠের চাকা যাতে লোহার রিং পড়ানো থাকে। আর একটি বড়ি। উপরে 'ছৈ' অর্থাৎ ছাদ থাকতেও পারে আবার নাও পারে। মানুষহ বিভিন্ন মাল অর্থাৎ পণ্যাদি টানার জন্য এই গাড়ি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এগুলোর সংখ্যা কমে গেলেও পূর্বে স্থল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল।[১২৪]

*** ঘুঁটে বা গোবরের লরিঃ** টাংগাইল জেলার গ্রামীণ জনপদে জ্বালানীর অন্যতম উৎস ঘুঁটে বা গোবরের লরি। গরু/ছাগলের গোবর বিশেষ কায়দায় শুকিয়ে লড়ি তৈরি করা হয়। সাধারণত বাঁশের কঞ্চির সারা গায়ে গোবর লাগিয়ে শুকিয়ে ঘুটে তৈরি করা হয়। এটি একটি উত্তম জ্বালানী।[১২৫]

*** ধিয়াইরঃ** এটি একটি মাছ ধরার যন্ত্র। বাঁশ ও গুনা এর উপকরণ। বাঁশ দিয়ে সরু সলাকা তৈরি করা হয় তারপর গুনা দিয়ে বেঁধে লম্বা ও চেপ্টা চারকোনা বিশেষ এই যন্ত্র বানানো হয়। পানি চলাচলের অভীর স্থানে ধিয়াইর পাততে হয়। এর ভেতর মাছ

---

[১২২] সোহরাব উদ্দিন, ৬৩, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১২৩] হেলাল উদ্দিন, ৪৮, সুনুটিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১২৪] চাঁন মিয়া, ডিগরবাড়ি, ২৬, মধুপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১২৫] মেরি বেগম, ৩৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। মাছের সাথে সাথে সাপ, কুঁচো, ব্যাঙও এতে প্রবেশ করে।

*** হরকা:** এটি একটি মাছ ধরার যন্ত্র। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি। দেখতে অনেকটা পানি সেচের যন্ত্র 'হোচার' মত। এটি আকৃতিতে বিশাল। এর মাঝখানে গাছের ডালপালা দিয়ে নদীতে ফেলে রাখা হয়। যাতে স্রোতে গড়ে না যায় তাই বড় দড়ি দিয়ে বেঁধে ঐ দড়ির অপর প্রান্ত ডাঙ্গায় কিছুর সাথে বেঁধে রাখা হয়। কিছু দিন পর পর এটি উপরে তুলে আনলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।[১২৬]

*** খুইয়া:** খুইয়া হল সুতা দিয়ে বোনা মাছ ধরার জাল। এর তিন দিকে বাঁশের কাঠি দিয়ে মোড়ানো খেত-খামারে কিংবা ডোবা-নালায় অল্প পানিতে চলাচল করা মাছ ধরার কাজে এই খুইয়া ব্যবহৃত হয়। এই জাল ডুবিয়ে ঢেলে সামনের দিকে নিতে হয়। একটু পর দেখতে হয় মাছ ধরা পড়ছে কি না।[১২৭]

*** কোচ:** ছাতির শলাকার মত সূচালো অগ্রভাগ সম্পন্ন কয়েকটি লোহার শলাকা বাঁশের মাথায় বরশির মত কালযুক্ত থাকে। এটি দিয়ে কোপ মেরে মাছ ধরা হয়।

*** খলুই:** জাল দিয়ে মাছ ধরে তা রাখার যন্ত্র হল খলুই। বাঁশের বেতি বা প্লাষ্টিক দিয়ে খলুই তৈরি করা হয়। এর উপর দড়ি থাকে যা ব্যক্তির কোমরে বাঁধা হয়। যাতে মাছ ধরের খুলই এ রাখা যায়। [১২৮]

*** মাথাল:** এটি সাধারণত তালপাতা বা গোলপাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। উপরের অংশটি টুপির মত করে তৈরি করা। আগের দিনে ছাতার ব্যবহার কম ছিল তাই রোদ, বৃষ্টি থেকে মাতাকে রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহৃত হতো। তাই এর নাম

---

[১২৬] আনসের আলী, ৮০, লোকদেও, মধুপুর, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

[১২৭] আঃ সাগর, ৪৬, হাসনই মধুপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১২৮] হেলাল উদ্দিন, ৪৮, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

মাথাল। এটি গ্রামের মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। সাধারণত কৃষক খেতে-খামারে কাজ করার সময় এই মাথাল ব্যবহার করে।[১২৯]

*** হাত পাখা:** তাল গাছের পাতা, বট বা পাকুট গাচের পাতা দিয়ে হাত পাখা তৈরি করা হয়। এর চার পাশের অংশটা বেত বা বাঁশের পাতলা বেতি দিয়ে মুড়িয়ে সুতা দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। একটি তালগাছের পাতায় দুইটি পাকা তৈরি করা যায়। এছাড়া মোটা কাপড় দিয়ে পাখা তৈরি করে তার মধ্যে নকসা করা যায়। বর্তমানে এর ব্যবহার কম।[১৩০]

৪.১১ পেশাজীবী শ্রেণি

টাংগাইল একটি বিরাট এলাকা নিয়ে গঠিত তাই এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আছে ব্যাপক বৈচিত্র। বৈচিত্র আছে জীবনধারা এমনকি পেশাতেও। টাংগাইলের মানুষজন জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সব পেশার উপর নির্ভরশীল সেগুলো আলোচনা করা হলো–

*** কৃষক:** বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক দেশ। কৃষিই হলো এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। ধান, গম, পাট, সরিষা, আলু, কলা, আনারস, হলুদ, আদা, কুল, কাঁঠাল প্রভৃতি ফসল টাংগাইল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আর এই ফসলগুলো ফলানোর কাজ করেন যে মানুষগুলো তারাই কৃষক। কৃষকরাই টাংগাইলের প্রাণ এবং গর্ব।[১৩১]

*** তাঁতি:** যারা বয়ন শিল্পের সাথে জড়িত তারাই তাঁতি নামে পরিচিত। তবে তারা নিজেদের 'বসাক' নামে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্ন বোধ করে। তাঁতিরা দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে পোশাক বুনে থাকে। টাংগাইলের পাথরাইল, নলশোধা চন্ডি, বাজিতপুরসহ বিভিন্ন স্থানে কাপড় তৈরি হয়। বর্তমানে তাঁতিদের অবস্থা ভাল তাদের ছেলে-

---

[১২৯] কালু শেখ, ৮৬, কুলিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১৩০] নজরুল ইসলাম, ৪৫, ডুবাইল, গোপালপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১৩১] আবু বকর সিদ্দিক, বয়স, ৬৫, গ্রাম-হাসনই, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

মেয়েরাও শিক্ষিত হচ্ছে। এখন এ কাজে অনেক মানুষ কাজ করছে। এ সব মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণিই আছে।[১৩২]

*** জেলেঃ** মধুপুর ব্যতীত সমগ্র জেলার ভূমি সমতল ও নিচু প্রকৃতির। টাংগাইল জেলার সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে রয়েছে নদী। এছাড়াও জালের মত আছে খাল-নদী-নদী।

*** কামারঃ** লৌহ নির্মিত গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নির্মাণ করে এই শ্রেণির পেশাজীবী। এদেরকে 'কামার' বলা হয়। সাধারণত বাজারের পাশেই এদের ঘর থাকে। কামারের তৈরি ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে দা, বটি, কাস্তে, লাঙলের ফলা, খুন্তি, পাঁচুন, কোদাল, কুঠার, হাতা ইত্যাদি। এসব তৈরি করার সময় কামার লোহাকে আগুনে গরম করে হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে কাজের উপযুক্ত করে থাকে।

*** কুলুঃ** কাঠের তৈর ঘানিতে তেল বেঙে বিক্রি করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কুলু বলে। গরীব হওয়ার কারণে কুলুরা নিজেরাই গরুর পরিবর্তে ঘানি টানে। যারা একটু স্বচ্ছল বর্ষাকালে এসব খাল-নদী প্লাবিত হয়। ফরে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছে মধ্যে রুই, কাতলা, বোয়াল, শোল, গজার, মাগুর, শিং, টেংরা, কই, আইর, টাকি, পুঁটি ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিল বাওরের তীরে জেলেদের বাস। বংশগত পদটি হিসেবে জেলেরা নিজেদের 'কৈবর্ত দাস' হিসেবে মনে করে। নিকট অতীতেও জেলেনিরা ঝাঁকার মধ্যে মাছ নিয়ে চালের বিনিময়ে গৃহস্থ বাড়ির বউদের নিকট বিক্রি করতো। তবে জেলেদের অবস্থা বর্তমানে তেমন ভালো না। জেলার বিভিন্ন স্থানে জেলেদের বাস। মির্জাপুর, দেলদুয়ার, নাগরপুর এর বিভিন্ন স্থানে জেলেরা বাস করে।[১৩৩] তারা ঘানি টানার কাজে গুরু ব্যবহার করে। টাংগাইলের মধুপুর উপজেলার গোপদ, ডিগরবাড়ি, লাউফুলা, আলোকদিয়া প্রভৃতি গ্রামে ঘানি আছে।

---

[১৩২] জামিলুর রহমান, ৫৫, মোমিনপুর, ধনবাড়ী, টাংগাইল, ১৪.০৩.২০১৯।

[১৩৩] মনোয়ার হোসেন, ৪৫, কাচপাই, নাগরপুর, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

*** কুমারঃ** মাটি দিয়ে হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন যারা তৈরি করে তারাই কুমার নামে পরিচিত। এ পেশায় মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকরাই জড়িত থাকে। ধনবাড়ি, গোপালপুরের বিভিন্ন স্থানে এদের বসবাস লক্ষ করা যায়।[১৩৪]

*** নাপিতঃ** যারা ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে নাপিত বলে। আদিতে নাপিত সম্প্রদায় দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। মুক্তশীল ও ভ্রষ্টশীল। উত্তম শ্রেণির নাপিত যারা নমশূদ্রদের ক্ষৌরকর্ম করত এরা মুক্তশীল নামেও পরিচিত। মুক্তশীল নাপিতরা নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের ক্ষৌরকর্ম করতে আপত্তি করলেও মুসলমানদের ক্ষৌরকর্ম করত। নমশূদ্রের জন্ম, বিয়ে এবং মৃত্যুর সময়ও নাপিতের প্রয়োজন হয়। টাংগাইল জেলায় সব উপজেলায় এ পেশাজীবির অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সম্প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়েরও এ কর্মে সম্পৃক্ততা দেখা গেছে। [১৩৫]

*** স্বর্ণকারঃ** সোনা দিয়ে নানা রকমের অলংকার তৈরি করে স্বর্ণকাররা। মধুপুরে স্বর্ণশিল্পের ব্যাপক চাহিদার কারণে এখানে এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এখানে অনেক লোক স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কারখানাও কাজ করে্ মধুপুর এর রায়পাড়া, মদনগোপালের আঙিনা, টেকিপাড়া, ও গোপালপুরের নন্দনপুর এলাকায় এসব স্বর্ণকারের বসবাস রয়েছে। এদের বেশির ভাগই হিন্দু। তবে অল্প কিছু মুসলিমও আছে।[১৩৬]

*** কাঠমিস্ত্রি/সূত্রধরঃ** কাঠ দিয়ে বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি ও তাতে নানা ধরনের কারুকাজ ফুটিয়ে তোরে কাঠমিস্ত্রিরা। কাঠের তৈরি বাড়ি-ঘর তৈরিতেও এরা কাজ করে। কাঠ সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করে এ অঞ্চলের কিছু মানুষ। দিগরবাইদ, লাউফুলা, রানিয়াদ, ফুলবাড়ী, চাড়ালজানী,

---

[১৩৪] গনেষ, ৩৫, উখারিয়াবাড়ি, ধনবাড়ী, টাংগাইল, ১৬.০৩.২০১৯।

[১৩৫] অমিত বিশ্বাস, ৩২, ভট্টবাড়ী, মধুপুর, টাংগাইল, ২৪.০৩.২০১৯।

[১৩৬] শ্রী পলাশ চন্দ্র কর্মকার, ৪০, আঙিনাপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল, ২৪.০৩.২০১৯।

টেকিপাড়া, কাকরাইদ, শোলাকুড়ী, রাধানগর, ভাইঘাট, ধনবাড়ী ও গোপালপুরে এরা বাস করে। [১৩৭]

*** মৌয়াল:** প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অবৈজ্ঞানিকভাবে সারা বছরই মধু সংগ্রহ করে আসছে। সহজে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহের জন্য চাকে আগুন দেওয়া হয়। এতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাজার হাজার মৌমাছি মারা যায়। অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে মধু সংগ্রহ করলে মৌমাছি ধ্বংস হতো না এবং মধুও বেশি সংগ্রহ হতো। ফলে মৌয়ালদের বাড়তি আয়ও হতো।[১৩৮]

৪.১২ লোকক্রীড়া:

মানুষ সার্বক্ষণিক কাজ নিয়ে থাকতে পারে না। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের অবসরের প্রয়োজন। আবার শুধু বিশ্রামও শরীর ও মনকে বিষিয়ে তুলতে পারে। তাই মানুষ অবসর সময়ে একটু আনন্দ বিনোদন করতে চায়। গ্রামের মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হলো– নাচ, গান, ভ্রমণ, শিকার ও খেলাধুলা ইত্যাদি। বৈচিত্রের দিক থেকে শরীর ও মন চাঙ্গা রাখার জন্য খেলাধুলাই উত্তম। গ্রাম প্রধান টাংগাইল জেলায় শিশু কিংবা বয়স্করাও বিভিন্ন লৌকিক খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লৌকিক খেলাধুরার মধ্যে রয়েছে – হাডুডু, গোল্লাছুট, তিন গুটি, ৪ গুটি, ১৬ গুটি, ধাপ্পা, কুত্‌কুত্‌, দাঁড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, পাঁচগুটি, গামছাবাড়ি, চড়ুইভাতি, ঘুড়ি উড়ানো খেলা ইত্যাদি।

*** লাঠি খেলা:** লোকজ খেলার মধ্যে অন্যতম উপভোগ্য খেলা হলো লাঠি খেলা। লাঠি খেলা গ্রামের মানুষের অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। সমগ্র টাংগাইলেই নানান আয়োজনেই এ খেলা প্রধান অনুষজ্ঞা হিসেবে থাকে। তবে টাংগাইলের গোপালপুর

---

[১৩৭] মোঃ বাবুল মিয়া, ৩৮, রাধানগর, মধুপুর, টাংগাইল, ২৪.০৩.২০১৯।

[১৩৮] সাইফুল ইসলাম, ৪৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২৪.০৩.২০১৯।

উপজেলার সূতি ভি এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে লাঠি খেলার আয়োজন করা হয় প্রতি বছর।

*** লাঠি খেলার ডাকঃ**

ডাক–১

পরথমে আল্লা বিসগোমিল্লা
নৈতে শুরু করলাম
অনাতেও নাত গো আল্লা
দয়া করবেন গুরুত।

২

বিসমিল্লাহ বলিয়া আমি
লাঠি নইলাম হাতে
যার মস্তকে মারবো বাড়ি
মস্তক যেন ফাঁটে।

৩

কিরে! কি কর গো ফাতেমা
পালভেক বসিয়া
তোমার পুত্র রণে যাচ্ছে
জয় দ্যাও আসিয়া।

৪

কিরে! আসমানে উঠিল চন্দ্র
সঙে নইয়া তারা
সিপাইগণ চলিল যেমন
করিয়া পায়তারা।[১৩৯]

[১৩৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৪৪৮।

সাধারণত দুই পক্ষের লাঠিয়াল বাহিনীর মধ্যে প্রশ্নোত্তরমূলকভাবে নিম্নের ‘লাঠিখেলার ডাক’ ব্যবহার হতে দেখা যায়।

প্রশ্ন–১

হাড়ের (ষাড়ের) অয়নাই
মুসলমানি
গাইয়ের অয়নাই বিয়া
দুধভাত খাও তুমি
কোন কালাম দিয়া।

উত্তর–

হাড়ের (ষাঢ়) হইছে মুসলমানি
গাইয়ের হইছে বিয়া
দুধভাত খাই আমি
বিসমিল্লাহ বলিয়া।[১৪০]

এভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সাথে নানান কৌশলে একে অপরের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে কসরত করে মানুষকে আনন্দ দান করে। গ্রাম বাংলার মানুষ অবাক নয়নে এই খেলা উপভোগ করে নির্মল আনন্দ লাভ করে।[১৪১]

*** হাডুডুঃ** টাংগাইলের লোকজ খেলার মধ্যে হাডুডু খুবই জনপ্রিয় হাডুডু খেলার জন্য মাঠ থাকে। খেলার উপযোগী করে দাড়ি দেওয়া হয়। উভয়পক্ষে ৭ জন করে খেলোয়াড় থাকে। খেলোয়াড় খেলোয়াড়ী পোশাক পড়ে মাঠে নামেন। একজন রেফারী ও একজন সহকারী রেফারি খেলা পরিচালনা করে থাকেন। খেলোয়াড়দের কাজ হলো মুখে হাডুডু, হাডুডু বলে দম দিয়ে বিরোধীদলের যে কোন একজন

[১৪০] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৪৪৮।
[১৪১] ঐ, পৃ. ৪৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ফেরত আসা। এতে করে ১ পয়েন্ট যোগ হয়। আবার বিরোধীদের কাউকে ধরে রাখতে পারলেও এক পয়েন্ট।

পয়েন্ট পাওয়া বা মারা যাওয়া উভয় নিয়মেই খেলা চলে। অর্থাৎ যারা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাবে অথবা যারা বিরোধী দলের সকল খেলোয়ারকে ধরে ফেলতে পারবে খেলায় তারাই জিতবে। হাডুডু খেলা সাধারণত বর্ষা মৌসুমে বেশি খেলা হয়। বর্তমানে এই খেলা বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। যার নতুন নাম কাবডি।[১৪২]

*** দাঁড়িয়াবান্ধাঃ** বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে বহুল প্রচলিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি লোকক্রীড়া। এতে ছেলেমেয়ে উভয়ই অংশ গ্রহণ করে। দাঁড়িয়াবান্ধা মূলত শিশু-কিশোরদের খেলা। এ খেলায় প্রথমে আয়তকার একটি দীর্ঘ বেত্র তৈরি করে বেত্রটির ঠিক সমদূরত্বে আড়াআড়িভাবে তিন বা চারটি দাগ কাটা হয়। এতে করে মূল বেত্রটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়। এটি দুই দলের খেলা খেলায় দুই দল বেত্রের বিপরীত পাশে দাঁড়ায়। খেলার মূল বিষয় হলো একজন খেলোয়াড়কে বিনা বাঁধায় এই ঘরগুলো বেড়িয়ে আসতে হবে। বিরোধীদলের কাজ হলো ঐ খেলোয়াড়কে বাঁধা দেওয়া। পা দিয়ে ঐ কেলোয়াড়ের পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত আঘাত করতে হবে তাহলেই ঐ খেলোয়াড় মারা যাবে। যাদের সবাই মারা যাবে তারা খেলায় হারবে।[১৪৩]

*** চড়ুই খেলাঃ** এই খেলাটি খেলতে কয়েকজন ছেলেমেয়ের মাটিতে হাতের আঙুল ফাঁক করে রাখতে হয়। একজন খেলোয়াড় ছড়া কেটে আঙুল স্পর্শ করে যার আঙ্গুলে ছড়া এসে শেষ হয় সে ঐ আঙ্গুল গুটিয়ে ফেলে এভাবে যার সবকয়টি আঙ্গুল গুটিয়ে যাবে সে হাত পেছনে নিয়ে আবার মুখের কাছে এনে চুমু খাবে এবং জিতে যাবে। এ খেলার ছড়াটি হলো–

চড়ুই পাখি বারটি

---

[১৪২] মোশারফ হোসেন, ৩৫, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ২৪.০৩.২০১৯।

[১৪৩] আঃ রহিম, ২২, দিঘলআটা, গোপালপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।০

Dhaka University Institutional Repository

ডিম পাড়ে তেরটি

একটা ডিম নষ্ট

চড়ুই পাখির কষ্ট।[১৪৪]

* **শিশু ঘন্টিঃ** এই খেলায় একজন চোর থাকে। তার কাছে গাছের নাম জিজ্ঞেস করে অন্যান্য খেলোয়াড়। চোর যে কোন একটি ফল গাচের নাম বলে। অন্যান্য খেলোয়াড়কে আম খাব না খাব কি?/কাঁঠাল খাব না খাব কি?/ জাম খাব না খাব কি? (এভাবে যে গাছের নাম বলা হবে ঐ গাচের নামে ছড়া কাটতে হবে) ছড়া কেটে দম না নিয়ে ঐ গাছের পাতা ছিঁড়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসতে হবে। না পারলে তাকে চোর হতে হবে। এভাবে খেলা শেষ হয়।[১৪৫]

* **গামছা বাড়ি খেলাঃ** এ খেলায় খেলোয়াড়েরা সামনাসামনি মুখ করে গোল হয়ে বসে। একজন খেলোয়াড় একটি রুমাল বা গামছা নিয়ে গোল হয়ে বসে থাকা খেলোয়াড়দের পিছ দিয়ে ঘুরে। ঘুরার সময় অতি কৌশলে একজনের পিছনে গাছমাটি ফেলে চলে আসে। যার পিছনে গামচা রেখে আসা হলো সে যদি টের না পায় তবে তাকে গামছার বাড়ি খেতে হয়। এটাই খেলার আনন্দ।[১৪৬]

* **পানি গোল্লাছুটঃ** এই খেলাটি নদীর কিনারা বা বিলের প্রান্তে খেলা হয়। খেলার নিয়ম গোল্লাছুটের মতই। গোল্লা বা দলনেতা গলা পানিতে একস্থানে গোল্লা স্থান ঠিক করে দাঁড়িয়ে থাকে। বিপক্ষদল পানির কিনারে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের ফাঁকি দিয়ে কিনারায় যেতে পারলেই জয় লাভ হয়। কিশোর কিশোরীদের মধ্যে এ খেলা বেশ জনপ্রিয়।[১৪৭]

---

[১৪৪] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৫২।

[১৪৫] এলিজা খাতুন, ১৪, কুলিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

[১৪৬] মামুন তরফদার, ৪৫, ঢেপাকান্দি, ফলদা, ভূঞাপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

[১৪৭] মামুন তরফদার, ৪৫, ঢেপাকান্দি, ফলদা, ভূঞাপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

* **বিয়া বিয়া খেলাঃ** ভাসমান যে কোন বস্তু পানিতে ছুঁড়ে মারা হয়। আগে থেকেই পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়রা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানি থৈ, থৈ করেন। বস্তুটি অন্যত্র গিয়ে ভেসে উঠে। এটা খুঁজে যে প্রথম ধরে ফেলে পানিতে ডুব দিতে পারবে তার এক বিয়া হয়ে গেল মানে জয় লাভ করল।[১৪৮]

* **টুনটুনি পাখি খেলাঃ** এই খেলায় নেচে ও অভিনয় করে ছড়া বলতে হয়। নাচানাচির চেয়ে ছড়ার আকর্ষণই যেন বেশি। ছড়াটি হলো–

টুনটুনি পাখি
নাচেন তো দেখি
না বাবা নাচব না
পরে গেলে বাঁচব না
বড় আপুর বিয়ে
নাক্স সাবান দিয়ে
নাক্স সাবান ভালো না
আপুর বিয়ে হলো না। [১৪৯]

এ খেলায় নেচে ও অভিনয় করে বিভিন্ন পর্ব পার করতে হয়।[১৫০]

* **চাক্কা খেলাঃ** সাইকেল, রিক্সার চাকা অথবা রিং অথবা টায়ার দিয়ে চাক্কা খেলে টাংগাইলের ছেলেরা। এবং একজন অন্যজনের সাথে প্রতিযোগিতাও লিপ্ত হয়।[১৫১]

* **গোল্লাছুটঃ** বাংলাদেশের সর্বত্র এ খেলা প্রচলিত। এটি দলগত খেলা। এ খেলায় দৌড় প্রতিযোগিতা হয় মূলত ৮-১০ জন সদস্যের দুইটি দল। এক পক্ষের কাজ হলে নির্দিষ্ট স্থান হতে অন্য স্থানে গিয়ে ফিরে আসতে হয়। বিরোধী দল মাঝখানে দাঁড়িয়ে

[১৪৮] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, ঐ
[১৪৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৪৫৪।
[১৫০] মামুন তরফদার, ৪৫, ঢেপাকান্দি, ফলদা, ভূঞাপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।
[১৫১] রাসেল মিয়া, ২২, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছুঁয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ছুঁয়ে দিতে পারলেই ঐ খেলোয়াড় মারা গেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়।[১৫২]

* **কুত্‌কুত্‌ খেলাঃ** মেয়েদের একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। এটি দ্বৈত বিনোদনমূলক খেলা। কুত্‌কুত্‌ খেলার জন্য মাটিতে দাগ কাটতে হয়। দাগ কেটে ঘর তৈরি করা হয়। মাটির হাড়ির ২ ইঞ্চি ভাঙ্গা টুকরা পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সর্বশেষ ঘরে নিতে হয়। যে আগে পারবে সে জিতবে।[১৫৩]

* **তিন গুটি/চার গুটি/ পাঁচ গুটি/ ১৬ গুটি খেলাঃ** এগুলো সবগুলোই দ্বৈত খেলা। গুটি দিয়ে (যেকোন জিনিস দিয়ে তৈরি হতে পারে) মাটিতে দাগ দিয়ে এ খেলা খেলতে হয়। দাবার মত খেলা এটি। এক পয়েন্টে থেকে মাঝখানে বিরোধীদলের গুটি রেখে অন্য পয়েন্টে যেতে পারলেই মাঝখানকার গুটি খাওয়া গুটির পরিমাণ ভেদে এ খেলার নাম পরিবর্তন হয়। ৩/৪/৫/১৬ গুটি ইত্যাদি। বৃষ্টির দিনে এ খেলা জমে উঠে।[১৫৪]

* **ধাপ্পা খেলাঃ** ধাপ্পা গ্রামীণ কিশোরীদের বিনোদনমূলক খেলা। ধাপ্পা খেলার জন্য ইট/পাথরের পাঁচটি গুটির প্রয়োজন হয়। এটি একটি দ্বৈত খেলা। প্রথমে একজন খেলোয়াড় গুটিগুলোকে উপরে ছুঁড়ে মারে গুটিগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিদ্বন্দ্বির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ৫টি গুটির মধ্যে যে কোন একটি গুটি তুলতে হবে। অতঃপর সমপরিমাণ শূন্যে ছুড়ে বাকী গুটিগুলো ধারাবাহিকভাবে নিয়মানুযায়ী শূন্যে ছুঁড়ে মারা গুটিগুলোকে ধরতে হয়। এবং মুখে মুখে ছড়া কাটতে হয়।

ছাড়টি হলো–

ফুলনা ফুলনা ফুলনাটি

একেতে দোলনাটি

---

[১৫২] জাহিদুল ইসলাম, ২২, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

[১৫৩] রুপা আক্তার, ১৪, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

[১৫৪] মুজিবুর রহমান, ৪২, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

জামোনা জামোনা জামোনাটি
একেতে জোড় জামোনাটি
বকুল বকুল বকুলটি
একেতে জোর বকুলটি।[১৫৫]

গুটি তোলার সাথে সাথে বিরোধী খেলোয়াড় 'থুক্কু' দিলে খেলোয়াড় তার দাইন চালনার ক্ষমতা হারাবে। এভাবে এই খেলা ৫টি গুটি ছড়া কেটে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।[১৫৬]

* **মার্বেল খেলাঃ** গ্রাম বাংলার কিশোরদের একটি অতি জনপ্রিয় খেলা গ্রামের দোকানে মার্বেল অন্যতম পণ্য। মার্বেল নানা রঙের হয়ে থাকে। মার্বেল খেলতে কয়েকজন খেলোয়াড় প্রয়োজন হয়। মার্বেল খেলা হয় মূলত লম্বা, পরিষ্কার ও সমতল রাস্তায়। কখনও মার্বেল খেলার প্রতিযোগিতা হয় মার্বেল গর্তে ফেলার মাধ্যমে। আবার গর্তে ফেলার মাধ্যমে। আবার কখনও প্রতিযোগিতা হয় দাগ কাটা ঘরে মার্বেল ফেরে আবার কখনও বিরোধী খেলোয়াড় মার্বেলের উপরে মার্বেল ফেলতে হয়। যিনি সঠিকভাবে সটিক জায়গায় মার্বেল ফেলতে পারবেন তিনি অন্য খেলোয়াড়ের কাছ থেকে মার্বেল জিতে নেয়।[১৫৭]

* **ষাঁড়ের লড়াইঃ** এক ষাঁড়ের সাথে অন্য ষাঁড়ের লড়াই। মাঝ মাঠে লড়াই হয় আর চতুর্দিকে মানুষ দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে লড়াই দেখে। মাঝ মাঠে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই চলে। বিজয়ী ষাঁড় পরাজিত ষাঁড় তাড়া করলে পরাজিত ষাঁড় মানব দেওয়াল ভেদ করে পালায়। বিজয়ী ষাঁড়ের মালিককে দেওয়া হয় পুরস্কার।[১৫৮]

---

[১৫৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬।
[১৫৬] আমিনা, ৩০, টুনিয়াবাড়ী, মধুপুর, টাংগাইল, ২৫.০৩.২০১৯।
[১৫৭] শাহআলম, ১৮, কুলিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২৬.০৩.২০১৯।
[১৫৮] আঃ মালেক, ৬০, আকাশী, মধুপুর, টাংগাইল, ২৬.০৩.২০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

* **মই দৌড়ঃ** গরুর কাঁধে জোয়াল বেঁধে জোয়ালের সাথে মই (টাংগাইলে এটি চঙ্গ নামে পরিচিত)। বড় মাঠের মধ্যে চঙ্গের উপর কৃষক দাঁড়িয়ে গরুকে তারা করেন। যে কৃষকের গরু সবার আগে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে ঐ কৃষক মই দৌড়ে প্রথম হন। বিভিন্ন গ্রামীন অনুষ্ঠানে এই মজার খেলাটি প্রতিযোগিতা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।[১৫৯]

* **নৌকা বাইচঃ** প্রাচীনকাল হতেই টাংগাইলে নৌকা বাইচের প্রচলন আছে। পূর্বে টাংগাইলের বিভিন্ন এলাকার জমিদারগণ এই প্রতিযোগিতার আয়জন করতেন। নদী তীরবর্তী ও বিল তীরবর্তী গ্রামে নৌকা বাইচ আগে হতেই জনপ্রিয়। বর্তমানে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকা বাইচ হয়। বাইচ অনুষ্ঠানে দূর দূরান্ত হতে মাঝিরা তাদের নৌকা সাজিয়ে নিয়ে আসে। সাথে আসে অনেক মাল্লা বা বাইচদার। সুরে সুরে গান গেয়ে বিভিন্ন ছন্দ আওড়িয়ে তারা বাইচে অংশ গ্রহণ করে। বিজয়ী নৌকার মালিক পান আকর্ষণীয় পুরস্কার।[১৬০]

* **ঘোড়াদৌড়ঃ** প্রাচীনকাল হতেই এ জনপদে ঘোড়াদৌড় একটি জনপ্রিয় খেলা। বর্তমানে ঘোড়াদৌড় বিভিন্ন উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ। টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার আকাশী গ্রামের ফাঁকা মাঠে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য ঘোড়া নিয়ে সওয়ারী আগমন করে। তিন দফা প্রতিযোগিকা মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া নির্বাচিত করা হয়। শ্রেষ্ঠ ঘোড়াকে প্রদান করা হয় পুরস্কার। এ ঘোড়াদৌড়কে কেন্দ্র করে উক্ত স্থান আশেপাশের কয়েক উপজেলার মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়।[১৬১]

৪.১৩ লোকগীতিঃ

গানের সাথে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক গান শুনলে মন ভাল হয় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বিরল। তাই প্রাচীনকাল হতেই মানুষ মনের গভীরে গানের চর্চা করে আসছে।

---

[১৫৯] মামুন তরফদার, ৪৫, ঢেপাকান্দি, ভূঞাপুর, টাংগাইল, ২৬.০৩.২০১৯।

[১৬০] ঐ

[১৬১] ফরিদ শেখ, ৩৮, আকাশি, মধুপুর, টাংগাইল, ২৬.০৩.২০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোন গীতি বিশেষ গীতিকারের সৃষ্টি আবার কোন গীতি বহু দিন যাবত লোকমুখে প্রচলিত। এমন বিশেষ বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন গান বা গীতিকা টাংগাইলের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত। নিচে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়গুলো আলোচনার প্রয়াস পেলাম–

*** মেয়েলি বিয়ের গীতঃ**

বিয়ে বাড়িতে কনের সামনে এই গীত পরিবেশন করা হয়।

ব্যার বাড়ি চন্দন গাছটি
সুতারে কাইটা বানায় ফিড়িলো
সেই ফিড়িতে গোসল করব
রাজার বেটা জামাল লো

গোসল আছল কইরারে পুত্র
কিসের সাজন সাজ রে
তোমার সঙ্গে দিমু আমি
একশ জন লোক রে
অনেক দূরে যাইয়ারে পুত্র
হাওয়াই বাজি ছাইড়ো রে
দ্যাশের ম্যানষে দেইখা বলব
ভাগ্যমানের ব্যাটা রে। [১৬২]

*** ভাটিয়ালি গানঃ**

ভাটির দেশ অর্থাৎ নদী প্রধান দেশের এক ধরনের গান হলো ভাটিয়ালি। বাংলাদেশের ভাটিয়াল অঞ্চলে প্রচলিত যে গান তাকেই ভাটিয়ালি গান বলে।

[১৬২] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, 'নদীর ভাটি দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে সাধারণত নৌকার মাঝিগণ যে গান গাইত তাকেই ভাটিয়ালি বলা হয়।[১৬৩]

টাংগাইল জেলার নদ-নদীতে এক সময় ভাটিয়ালি গানের কথা ও সুর ভাসত। এ জেলার যমুনা, ঝিনাই, ধলেশ্বরী, বৈরান, বংশী, ফটিকজানি ও লৌহজং নদীতে ভাটিয়ালি সুর শোনা যেত–

বন্ধুর নায়ে উটে লাল বাদাম
তুমি বন্ধু আসবে বইলে
পান মোর হলো বাসীরে
বন্ধু তুমি খেলে না মোর পান,
আষাঢ় মাসে নতুন পানি
কত নৌকা যায় উজানি
কত নৌকা এলো গেল (২)
বন্ধুর নৌকা এলো না বান॥

বন্ধু যায় মোর পানসি বাইয়ে
আমি ডাকি হাত উঠায়ে রে
ফির ফির ওহে বন্ধু (২)
শুনি তোমার মুখের গান॥ [১৬৪]

*** ঘাটু গানঃ**

প্রেমিক তার প্রেমিকার নিকট আকাঙ্খার ১৬ আনা নিবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু প্রেমিকা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বাঙ্গালি নারীর দেহগত সংস্কারের অনুপম প্রকাশ গানটিতে ঘটেছে–

---

[১৬৩] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২০১।
[১৬৪] ঐ, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যার জন্য হইছ পাগল
তাও তোমারে দিব না
তাও তোমারে দিব না গো। (২)
ঐ বুকের কাপড় তুলতে দিব
জোড় কমলা দেখতে দিব
হাতাহাতি করতে দিব
বন্ধু কোমল ধরতে দিব না॥(২) [১৬৫]

প্রেমিকা তার বন্ধুকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। প্রেয়সী তার বন্ধুর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সংস্কারমুক্ত নারীর ভোগবাদী চেতনা কোনভাবেই গোপন থাকে নি এ গানে–

সখা আমার বাড়ি গেলে
প্রেমের বাসক দেব খুলে॥
প্রেমের বাসক দেব খুলে
পালঙ্কের উপরে॥
ঘাট পালং ফুল বিছনা দিব
মুশরেরই তলে
গোলাপ জলে চান করাব
আতর দিবে চাইলে
প্রেমের বাসক দিব খুলে ॥[১৬৬]

এভাবে নারী-পুরুষের প্রেমের এবং তাদের পাওয়া, না-পাওয়ার ঘটনা, প্রিয়জনের সাথে কাটানো সময়ের বর্ণনা, তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা ও প্রিয়জনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার অঙ্গীকার নিয়েই এ ঘাটু গান তৈরি হয়েছে।

---

[১৬৫] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২০৪।
[১৬৬] ঐ, পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

* **জারি গানঃ** (জারি) ফারসি শব্দ। যার অর্থ বিলাপ। মূলত মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে জারি গানের সৃষ্টি কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে। জারি গান দীর্ঘ হয়। বর্তমানে এই জারি গান যে কোন বিষয় নিয়েই হয়। এ অঞ্চলে জারি গান ব্যাপক জনপ্রিয়। শুধু তাই নয় টাংগাইলের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় নিয়েই জারি গান প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলে জারিগান শুধু গান নয় টাংগাইলের মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জীবন্ত দলিল। একজন প্রধান গায়ক যাকে বলা হয় 'বয়াতি' তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে গান পরিবেশন করেন। বয়াতিই মূল গান করেন বাকিরা বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং প্রয়োজনে বয়াতির সাথে ঠোঁট মিলায়। বাহির বাড়িতে, জ্যোৎস্নার দিনে উঠানে বা বটগাছের নিচে এ গানের আসর বসে। পুরুষেরা বসে সামনে আর নারীরা পান-সুপারি নিয়ে বসে একটু দূরে। হ্যাজাকের মিটিমিটি আলোতে বয়াতি গান পরিবেশন করেন। মুগ্ধতা নিয়ে সে গান শোনে সবাই। ঘটনাটা যদি বেদনাদায়ক হয় কখন যে চোখ নিংড়ে গাল গড়িয়ে পানি পড়ে শ্রোতারা তা টেরই পান না। গান চলে ভোর রাত পর্যন্ত। গানের সাথে আছে হালকা নাচ। যিনি নাচেন তাকে 'দোহার' বলা হয়। নিচে টাংগাইল জেলাকে নিয়ে গাওয়া একটি জারি উল্লেখ করা হলো–

এই আশরে আছেন যত হিন্দু-মুসলমান
সবাইকে জানাই আমার সালাম ও প্রনাম।

এই আশরে আছেন যত জ্ঞানী আর গুরু
টাংগাইলের স্মৃতি দিয়া জারি করলাম শুরু।

টাংগাইলের স্মৃতি ভোলা দায় রে
বাংলাদেশে এমন জিলা আর বা
কোথায় পাওয়া যায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

মধুপুরে সস্তা মধু শাল গজারির বন
এই খানে তীর্থ করত মদন মোহন
লক্ষ্মীঝরার স্বচ্ছ পানি
কলকলাইয়া বইয়া যায় ॥

আতিয়াতের বড় একটা মসজিদ আছে ভাই
দশ টাকারও নোটে যাহার ছবি দেখতে পাই
শাহান শাহের মাজার গেলে
পাপ মুক্ত হওয়া যায় ॥

আলমনগর পাওয়া যায় নীলকমলের দই
বসুবাড়ি পাওয়া যায় বিন্নি ধানের খই
পোড়াবাড়ীর চমচম দেখলে
জিভে পানি রাখা দায় ॥

মির্জাপুরে বড় একটা হাসপাতাল আছে ভাই
দেশ-বিদেশের রোগীদের সুচিকিৎসা হয়
রনদা প্রসাদের নাম শুনলে
গর্বে বুকটা ভইরা যায় ॥
কাগমারীতে কাসার বাসন তৈরি হয় রে ভাই
ঐখানেতে বড় একটা দিঘী দেখতে পাই
মাওলানা ভাসানীর রওজায় গেলে
চোখে পানি রাখা দায় ॥

বাজিতপুরের তাঁতের শাড়ি তুলনা যায় নাই
দেশ-বিদেশে উহার খুবই কদর আছে ভাই

Dhaka University Institutional Repository

টাংগাইলের শাড়ি পড়লে

নতুন বউকে খুব মানায় ॥[১৬৭]/[১৬৮]

*** ধুয়াগানঃ** ধুয়াগান গ্রাম বাংলার নিজস্ব গান। যার ভাবে বিষয়ে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণে ও সুরের আকর্ষণে উদাস হয়ে যায় যে কোন মানুষের মন। ধুয়াগান অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি। এ গানের ইতিহাস প্রাচীন। সুরে সুরে অশিক্ষিত গায়েন তার কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলেন দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের কঠিন ও নিগূঢ় ব্যাখ্যা। সাধারণত মাঠে কাজ করার সময় একজন ধুয়া গান ক্ষেতের আইলে দাড়িয়ে পরিবেশন করেন আর বাকীরা কাজ করে।

নিচে পাগল বিষয়ক একটি ধুয়ার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো–

পাগল পাগল সবাই পাগল

তয় ক্যানে পাগলেরে খোটা

পাগল বিনে এই জগতে

ভালা হয় ক্যারা

এ্যাক পাগল হয় শিব সন্ন্যাসী

ত্যারজো কইরে কৈলাশ-কাশী

ভাং ধুতুরা সিদ্ধির গোটা

আরেক পাগল নারদ মুনি

বিনা কত্যায় বাজায় ন্যাটা

হরিলুটে পোলাপাইন পাগল

সঙ্গেতে তুলসীতলা রয় আটা ॥[১৬৯]

---

[১৬৭] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২১৪।

[১৬৮] জাহাঙ্গীর আলম, ৪৫, গোপীনাথপুর, মধুপুর, টাংগাইল, ২৬.০৩.২০১৯।

[১৬৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

*** নবান্নের গানঃ** নবান্নের গানে বাংলার কৃষি জীবনের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় কৃষক ধান কেটে মা থেকে বাড়িতে আনছেন। আর কৃষাণি সেই ধান নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাল বানায়। নবান্নের একটি গান উপস্থাপন করা হলো–

ও আমার মাইঝা ভাই সাইজা ভাই
কই গেলা রে (২)
চল যাই ক্ষেত্রের ধান কাটিতে ॥
কাঁচি লই হাতে মাথাইল লই সাথে
মুড়ি কিছু বাইঝা লও গামছাতে ॥
কাটিব পাকা ধান
আনন্দে নাচবে প্রাণ
বউঝিরা বানবে বারা ঢেঁকিতে ॥
কাটিয়া পাকা ধান
আনন্দে চিবাব পান
মাথাই কইরা আইনা দেব বাড়িতে
ধান কাটিয়া নেব
বউ-ঝিয়ে সারিব
পিঠা চিড়া পাকাইব হাড়িতে ॥[১৭০]

*** বারোমাসি গানঃ** আমাদের দেশ ৬ ঋতুর দেশ। এদেশে বার মাসে তের পার্বন। প্রতি উৎসবে থাকে গান বাজনার আয়োজন। নর-নারীর প্রেম, মিলন, বিরহজনিত অনুভূতিই বারোমাসি গানের উৎপত্তি।[১৭১]

[১৭০] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২৭১।

[১৭১] সুফিয়া বেগম, ৬০, মলাজানী, ঘাটাইল, টাংগাইল, ২৬.০৩.২০১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বার মাসে তের পার্বনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এমন একটি গান নিচে উপস্থাপন করা হলো–

আগুন মাসে নতুন খানা
পৌষ মাসে নাইয়র মানা
মাঘও মাস গেল রে নারীর শীত বুকে
হায় রে শীত বুকে।
ফাল্গুন মাসে রোদের জ্বালা
চৈত্র মাসে শরীল কালা
বৈশাখ মাসও গেল রে নারীর
বসন্তে হায় রে বসন্তে।
জৈষ্ঠী মাসে মিষ্টি ফল
আষাঢ় মাসে নতুন জলও রে
শাওন মাসও গেল রে নারীর
শয়নে হায় রে শয়নে।
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা
আশ্বিন মাসেও গেল রে নারীর
কাতরে হায় রে কাতরে
কতই পাশা খেলছ রে সাধু
বিদেশে হায় রে বিদেশে।[১৭২]

*** ভাটারা গানঃ** নারী নদীর ঘাটে এসেছে খেয়া পার হতে। তার প্রেমিক বন্ধু খেয়া ঘাটের পাড়ানি। বন্ধু যদি নদী পার করে দেয় তাহলে নারী তার বন্ধুকে তার দেহ দান করবে বলে প্রলোভিত করেছে।

---

[১৭২] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২৭৬।

উত্তরে সাজিল দেওয়া
প্রাণের বন্ধু দিসেরে খেয়া
আমি নারী না জানি সাঁতার রে
খেওয়ানীরে খাইছে বনের বাঘে রে ॥
যে আমারে করবে পার
তারে দিব গলারই হার
পার হইয়া যৌবন করব দান রে ॥ [১৭৩]

*** নাচারিঃ** 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এক ধরনের নৃত্যগীতের প্রচলন ঘটেছে যার নাম নাচারি। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে লোক-কবিরা গান তৈরি করে নৃত্যযোগে দর্শকের সামনে পরিবেশন করে। মনসা চাঁদের ছয় পুত্রকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছে এবং একমাত্র জীবিত পুত্রকে বাসর রাতে সর্প দংশনে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।

পুজা নয় হে দিলি রে চান্দু
পুজা নয় হে দিলি
কলঙ্কেরই ডালি রে চান্দু
মাথায় তুইলা নিলি।
ও কি চান্দু রে
দেখবো রে তোর কতই শক্তি আছে।
ছয়টি পুত্র খাইছি রে চান্দু কালিদর সাগরে
লক্ষিন্দরকে কাটবো আমি
লোহার বাসর ঘরে ॥[১৭৪]

---

[১৭৩] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২৭৭।
[১৭৪] ঐ, পৃ. ২৭৮।

*** ছাদ পেটানোর গানঃ** আগে ছাদ পেটানোর কাজ একদিনে করা হতো। এটা এখনও অনেকেই মানে। ছাদ পেটানোর সময় এবং পরে শ্রমিকদের উজ্জীবিত করতে এক ধরনের গান করা হয় যেগুলো ছাদ পেটানোর গান নামে পরিচিত।

ছেড়ি লো কস্না কথা ঝগড়ার কি কারণ
তুইতি কইলি আমার নাগর পাগল
ছেড়ি লো কস্না কথা ঝগড়ার কি কারণ।
কাঞ্চা চুলে দাঁতে মেসি চোখেতে কাজল
তুইতি কইলি আমার হামিদা পাগল
ছেড়ি লো কস্না কথা ঝগড়ার কি কারণ ॥[১৭৫]

*** ধান ভানার গানঃ** গ্রামীণ সমাজে ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানা একটি পুরাতন রীতি। যৌথ পরিবারে শাশুড়ির সাথে ছেলের বউরা ধান ভানত। আর গীত গাইত–

বাড়া সব বাড়ির বউ জানে না গো
সব বাড়ির বউ পারে না
বাড়া বানা বড়ুই যন্ত্রণা (২)
শাশুড়ি বউকে ডেকে কয়
সাধের বাড়া বানবি যদি আয়।[১৭৬]

*** নাক, কান ফুঁড়ানোর গানঃ** দাদি নানিরা নাতিনের কাক বা কান ফুঁড়ানোর সময় গান গেয়ে থাকে। এ সময় তারা সিন্নির আয়োজন করে থাকে। রঙ্গরস করার জন্য নাতিন জামাইকে উদ্দেশ্য করে গান করে থাকে।

সাধের নাতিন জামাই রে
কুড়াল ভাইঙ্গা নথ বানাইয়া
নাতিন রে দে

---

[১৭৫] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ২৮৪।
[১৭৬] ঐ, পৃ. ২৮৪।

নাতিন নাক ফুঁড়াইছে তারে গয়না
গড়াইয়া দে
কোদাল ভাইঙ্গা বোলাক বানাইয়া নাতিন রে দে
সাধের নাতিন জামাই রে ॥[১৭৭]

*** একদিল গানঃ** একদিল গান মূলত কাহিনী নির্ভর এক ধরনের করুন পালাগান। এগুলো আগাগোরা নিরেট সঙ্গীত নয়। কোনো করুণ কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছেদ জাতীয় এক ধরনের গান। যা নারীর হৃদয়ের মাতৃত্বের হাহাকার সম্বলিত বিলাপ মাত্র। এ গান সন্তান হচ্ছে না বা সন্তানের বিপদ মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ মানত করে থাকে। এটি সারা রাত ভর চলা আসর কেন্দ্রিক গান। প্রধান গায়ক ও তার সঙ্গীরা অদ্ভুত পোশাক পরে ও নেচে নেচে গান গায়।

নিচে একজন কামাতুর নারীর সন্তান লাভের আশায় তার পতির নিকট সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

আমি এই বয়সের নারী গো
যৌবন জ্বালায় জ্বইলা মরি
পতি আইসো তারাতারি ॥
আইসো আমার প্রাণের পতি
খাও গো বাটার পান
এই রূপ সোনার যৌবন
তোমায় করব দান ॥
পান খাও, প্রাণপতি
ছাবা দেও গো খাই–

[১৭৭] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২৮৮।

এই রূপ সোনার যৌবন

তোমায় দিতে চাই ॥[১৭৮]

*** বাউল গানঃ** বাউল গান সারা দেশ ব্যাপী প্রচলিত ও ব্যাপক জনপ্রিয়। বাউল গান মূলত ২ দলের মধ্যে পালা করে যে কোন একটা বিষয় নিয়ে গাওয়া হয়। আবার শুধু বাউলদের একক দলও যে কোন একটা বিষয় নিয়ে দর্শকেদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেন। বাউল গানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো বাউলরা যে কোন বিষয় নিয়ে সাথে সাথে গান বাঁধতে পারে। যেমন নামাজ সম্পর্কে জানতে চাওয়া একজন দর্শকের প্রশ্নের জবাব–

নামাজে আছে মজা

শুন বে-বুজা বলি তারে, নামাজে ...।

ও তুই রসগোল্লার স্বাদ কী পাবি

চিড়া গুড় চিবাইলে পরে

নামাজে আছে মজা

নামাজ অইলো বেহেশতের চাবি

সেইখানে চিরকাল রবি

হুর গেল মান সবি দিব তরে। (২)

ওরে হাজির নাজির যেনে

তারে সেজদা কর কাবাঘরে। (২) [১৭৯]

*** মুর্শিদি গানঃ** এগুলো হলো ভাবতত্ত্বের গান। আল্লাহ্ এবং তার রাসুলের প্রতি ভালবাসার গান। কোন কাজ করলে দুনিয়াতে আল্লাহ্র সান্নিধ্য পাওয়া যাবে, কোন কাজ করলে দুনিয়ায় মহানবীর দেখা পাওয়া যাবে। এমন করণীয় নিয়ে ভাববাদী গান হলো মুর্শিদি গান।

মুর্শিদ তোমার প্রেমের নদীতে

কেমনে দেই পারি ॥

---

[১৭৮] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৩০২।

[১৭৯] ঐ, পৃ. ৩১০।

ঐ নদীর নোনা জলে
জাহাজ পড়লো কাকড়ার তলে রে
আমার তরীতে লাগিয়া রে নোনায়
কখন যেন ডুই বা মরি ॥
দীনহীনের ভাঙ্গা তরী
পাপের ভরে হইছে ভারী
চড়তে ভয় করি
তুমি নিজ গুণে দয়ারে কর
দাও হে তোমার চরণ তরী ॥[১৮০]

*** যাত্রাঃ** অর্জিত সাহার 'চালন্তিকা নাট্য সংস্থা' ছাড়া টাঙ্গাইলে আর কোন যাত্রা দলের তথ্য পাওয়া যায় না। গোলাম আম্বিয়া নূরীর প্রবন্ধ থেকে জানা যায়– এই শতাব্দীর গোড়ায় টাঙ্গাইলের বেশ কয়েকটি অঞ্চলেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৌখিন পালাদলের যাত্রা সমষ্টির বিবরণ জনশ্রুতি থেকে পাওয়া যায়। ভুঁঞাপুরের সয় গ্রামের একটি দল, নিক রাইলের একটি দল, টাংগাইলের পাতরাইল গ্রামের একটি দলের কথা শোনা যায় যারা অত্র অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তৎকালীনে টাংগাইলের নগরপুর গ্রাম যাত্রার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ত্রিশের দশকে টাঙ্গাইলের পোড়া বাড়িতে একটি পেশাদার যাত্রা দল গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িকালের শিবপুর ও ঘারিন্দাতেও দুইটি খ্যাতিমান যাত্রা সমষ্টি গড়ে উঠেছিল।

টাংগাইল জেলার খ্যাতিমান যাত্রাভিনেতা যাঁরা ছিলেন, তাদের মধ্যে বোয়ালির বাঁশি মিয়া, কলিপুরের বিনোদ সাহা, নগরপুরের নিকুঞ্জ সাহা, বিশ্বাস বেতকার কার্তিক চন্দ্র শীল, করটিয়ার ঠাকুর দাস পাল, আকুরটাকুরের আনিল বাগচি ও সুনীল বাগচি

[১৮০] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৩৪২।

পোড়াবাড়ির মাতিলাল গৌড়, কাঞ্চনপুরের সিরাজুল ইসলাম খান মালা, শিবপুরের শিশির ভৌমিক এবং সন্তোষের গোপাল কর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১৮১]

* জনপ্রিয় কয়েকটি যাত্রাপালার নাম–

টাংগাইলের জনগণ যাত্রা দেখতে অনেক ভালবাসে। যে কোন উৎসবে এবং শীতের দিনগুলোতে যাত্রা না হলেই না। নিচে জনপ্রিয়তা অর্জন করা কয়েকটি পালার নাম দেওয়া হলো–

১. রূপবান
২. কমলার বনবাস
৩. চাবুকের আঘাত
৪. বাহরাম বাদশা
৫. রহিম বাদশা
৬. প্রেমের প্রতিদান
৭. জরিনা সুন্দরী[১৮২]

* এককালে রূপনা যাত্রাসহ সব রকম যাত্রাই জনপ্রিয় ছিল এবং এখনো এটি একটি জনপ্রিয় আনন্দ মাধ্যম। নিরক্ষর লোক সমাজে জরিনা সুন্দরী আলাল, দুলাল প্রভৃতি যাত্রা বিশেষভাবে সমাদৃত এমনকি রূপবান কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের পরেও এ যাত্রার কদর কমেনি। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বেতার টেলিভিশন ও সিনেমার প্রভাব লোক সাহিত্যের সকল শাখার উপর কিছু না কিছু না কিছু প্রভাব ফেলেছে। এ জেলায় যাত্রা ও লোকসংগীতের আসর কৃষকদের অবকাশ মুহূর্তকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। বর্তমানে অত্যাধুনিক মোবাইল, বিভিন্ন টেলিভিশনের সহজলভ্যতার ফলে এবং প্রযুক্তি মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে হওয়ায় যাত্রা শিল্প হুমকীর সম্মুখীন।

---

[১৮১] তরফদার, মামুন, লোক সাহিত্যে টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ১৫৭।

[১৮২] হেলাল উদ্দিন, ৪৫, হাসনই, মধুপুর, টাংগাইল, ০৮.০৪.২০১৯।

৪.১৪ লোকবাদ্যযন্ত্র

টাংগাইল জেলায় প্রায় সব গ্রামেই দুই-চার জন লোক গায়কের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সব গায়করা নিজস্ব ভঙ্গীতে এবং বাদ্যযন্ত্রের তারে গান গায়। গানকে মোহনীয় করতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। নিচে গান গাওয়ার জন্য টাংগইলের গায়করা ব্যবহার করে এমন কতগুলো লোক বাদ্যযন্ত্রের নাম পরিচয় আমরা জানার চেষ্টা করব। ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে কতগুলো লোকবাদ্যের নাম উল্লেখ করেছেন–

* **বাঁশি:** পল্লীগীতির প্রধান অনুসঙ্গ হলো বাঁশি। এক সময় টাংগাইলের প্রতি গ্রামেই দুই-চার জন বংশীবাদক দেখা যেত। জ্যোৎস্না রাতে ভবঘুরে কৃষক বাঁশি বাজাতো এতে ঘর ছাড়ত বহু গৃহস্থের ঝি।

* **একতারা:** একতারা এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। তবে এর ব্যবহার টাংগাইল অঞ্চলে কম।

* **হারমোনিয়াম:** এটি একটি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। ১৮৪২ সারে আলেকজান্ডার ডেবিয়ান এটি আবিষ্কার করেন। সব ধরনের সংগীতে এই যন্ত্র ব্যবহার হতে দেখা যায়।

* **ঘুঙুর:** সারি, জারি ও একদিল, নাচারি ও লাঠি খেলায় গায়ক ও খেলোয়াড়দের পায়ে ঘুঙুর ব্যবহৃত হয়। ঢোলের তালে তালে ঘুঙুর নাচিয়ে গায়ক গান করেন।

* **ঢোল:** টাংগাইলের সকল লোক গানে ঢোলের ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে বাউল, জারি, একদিল গানে ঢোল অপরিহার্য। তাই ঢুলির দাম এ অঞ্চলে একটু বেশি।

* **খোল:** গ্রামাঞ্চলে সাধারণত কীর্তন ও ভজন গানে খোল বাজিয়ে গান করা হয়।

*** জুড়ি ও মন্দিরাঃ** প্রত্যেক লোক গানেই জুড়ি ও মন্দিরার ব্যবহার আছে। মন্দিরা গানের তাল, ছন্দ ও লয়কে প্রাণবন্ত করে তোলে।

*** টিকারাঃ** বাইচের নৌকায় টিকারা নামক বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। বাইচের তাল ও ছন্দকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য টিকারা ব্যবহৃত হয়।

*** কাশরঃ** বাইচের নৌকায় কাশর ব্যবহৃত হয়। সারি গানের তালের সাথে কাশরের শব্দের একটা মিল আছে।

৪.১৫ বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

টাংগাইলে অনেক খ্যাতনামা, গায়ক, শিল্পী ও কবিয়াল জন্মগ্রহণ করেছেন। গান রচনা ও গায়কীতে তাদের ছিল মুন্সিয়ানা ও বিশেষ ঢং। টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি নামক অভিসন্দর্ভে এ জেলার বিখ্যাত গায়ক, শিল্পীদের পরিচয় তুলে ধরা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল জেলা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

*** আবুল কাশেম বয়াতি (১৯২৯-৯৩)ঃ** বাউল শিল্পি আবুল কাশেম বয়াতি টাংগাইলের করটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের সাধনায় দেশ বরেণ্য বাউলে পরিণত হন এবং অর্জন করেন অনেক পুরস্কার।[১৮৩]

*** নিশান আলী বয়াতি (বাংলা-১৩০০-অজানা):** সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন নিশান আলী বয়াতি। ওস্তাদ নাদের আলীর কাছে গানের হাতে খড়ি। পরবর্তীতে ওস্তাদ চাঁন মিয়ার কাছ থেকে জারি গানের তালিম নেন। নিশান আলী বয়াতির সঙ্গীতে অনেক খ্যাতি ছিল। ১৯৭৬ সালে টাংগাইলের ভাসানী হলে অনুষ্ঠিত 'সুরের নদী বংশাই' অনুষ্ঠানে তাঁর গান বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়।[১৮৪]

---

[১৮৩] আলম, জাফর, স্মরণীয়-বরনীয়, পৃ. ৬৯।

[১৮৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, ঐ, পৃ. ৭০।

*** আমীর আলী সরকার (১৯২৫-৭৯):** টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার হাজরাবাড়ি গ্রামে জমশের আলীর গৃহে আমীর আলী সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধুয়াগানের রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন।[১৮৫]

*** মোঃ মছলিম উদ্দিন বাউল:** টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় সুন্দর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বছির উদ্দিন। ওস্তাদ নুর মোহাম্মদের নিকট গান শেখেন তিনি। তিনি বাউল ও জারিগানে পারদর্শী ছিলেন।[১৮৬]

*** গনেশ রক্ষিত (১৯০১-২০১৭):** টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার শাখারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিগান ও ধুয়াগান রচনা করতেন, সুর দিতেন এবং গাইতেন।[১৮৭]

*** নিবারণ চন্দ্র ভৌমিক:** টাংগাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলায় জন্ম। তিনি সার্কাস শিল্পী ছিলেন। দেশ বিখ্যাত রয়েল টাইগার সার্কাস নামে একটি সার্কাসের পরিচালক ছিলেন।[১৮৮]

*** খন্দকার মকবুল হোসেন (মৃ-১৯৯১):** ভূঞাপুরের গোপিনাথপুরে জন্ম। তিনি নবীতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সাঁইতত্ত্ব, মুর্শিদি, মারফতি, বিচ্ছেদি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য গানের সৃষ্টা। তাঁর লেখা একটি গানের মুখপারা হলো–

চলতে চলার পথে হুসে চলো
ডান পা ফেলিতে আল্লাহ সুখেতে
বাম পা ফেলিতে হু বাঁশি তোল
চলতে চলার পথে হুসে চলো।[১৮৯]

---

[১৮৫] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ২৮৩।
[১৮৬] ঐ, পৃ. ২৮৩।
[১৮৭] ঐ, পৃ. ২৮৩।
[১৮৮] আলম, জাফর, স্মরণীয়-বরনীয়, পৃ. ৪৩।
[১৮৯] বাংলাদেশের লোকজ-সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ২৮৩।

*** হায়দার আলী জমাদ্দারঃ** ভূঞাপুর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হায়দার আলী জমাদ্দার। ধুয়াগানের স্রষ্টা ও শিল্পী হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তবে শেষ জীবনে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালিয়েছেন। তার রচিত একটি ধুয়াগানের মুখপয়ার হলো–

পাগলা নদীরে
ভাঙ্গিয়া করিলা দেশান্তরি
কারুর ভাঙ্গলা দালান বাড়ি
কারুর ভাঙ্গলা টিনের চৌরি
কারুর ভাঙ্গলা নবীন পীরিতি। [১৯০]

*** কাসেম বয়াতি (মৃ- ২০০৯)ঃ** ভূঞাপুর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাসেম বয়াতি জারিগানের স্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন।

*** মেধু বয়াতি (মৃ- ১৯৬২)ঃ** ভূঞাপুরের ভারই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মেধু বয়াতি। তিনি ধুয়াগানের স্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে তার লেখা বেশ কয়েকটি ধুয়াগান এখনো এলাকায় প্রচলিত আছে।[১৯১]

৪.১৬ সংবাদপত্র

যে কোন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয় তথা সার্বিক অবস্থা প্রকাশ ও বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। ইতিহাস গঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যালোচনার বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের অবদান অনস্বীকার্য। টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য পেতে সংবাদ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য পেতে সংবাদ পত্রের কোন বিকল্প নেই। আমরা জানি টাংগাইল এর সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। তাই এই অঞ্চলে

---

[১৯০] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪।

[১৯১] তরফদার, মামুন, লোকসাহিত্যে টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ২৮১।

তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের যাত্রাও প্রাচীন। বাংলায় কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকেই সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয়।[১৯২]

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র সীমায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'রংপুর বার্তাবহ'। ১৯৪৮ সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এই সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়।[১৯৩]

১৮৫৭-১৯০০ সারে ব্রজেন্দ্রনাথ এর হিসাব অনুযায়ী বাংলায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৯০৫টি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত ১৮০ টি। কিন্তু এছাড়াও আরও ৬১টি সাময়িক পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে ফলে ঐ সময় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা ছিল ২৪১টি। এর মধ্যে 'ঢাকা প্রকাশ' নামক সংবাদপত্রটি ছিল বহুদিনের এবং পাঠকপ্রিয়। এছাড়া কালিপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'মাসিক বান্ধব'কে বলা হতো দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন।[১৯৪]

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পত্রিকা কখন প্রকাশিত হয় সে খবর জানা গেলেও তা কখন লুপ্ত হয় তা জানা যায় না। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোকজন ছিল দরিদ্র তাই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য প্রেস, দক্ষ সংবাদকর্মী ছিল না।

কলকাতার অনেক সংবাদপত্রকে রক্ষা করেছে ধনী ব্যবসায়ীরা। আর পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে আইনজীবি, শিক্ষক ও সমাজসেবকগণ। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি মালিক সম্পাদক, লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন।[১৯৫]

---

[১৯২] বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: সুব্রত সংকর ধর এর বাংলাদেশের সংবাদপত্র (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ১৫-৩৫।

[১৯৩] মুনতাসীর মামুন, বরেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্র; আদিপর্ব পৃ. ১০০।

[১৯৪] মুনতাসির মামুন, ১৯ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫) (ঢাকা নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৫) পৃ. ২৩৯।

[১৯৫] মুহাম্মদ মাছুদুর রহমান, বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৪৪।

পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ পত্রিকাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সমিতি থেকে প্রকাশিত হতো। যতদিন প্রতিষ্ঠান বা সমিতিটিকে থাকতো পত্রিকাও ঠিক ততদিনই প্রকাশিত হত। এসব পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবি ছিলেন।[১৯৬] তবে সমস্যা যাই থাকুন পূর্ব বাংলায় অল্প সময়ে সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

*** টাংগাইল জেলায় সংবাদপত্রের বিকাশঃ**

পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্রের বিকাশের সাথে টাংগাইল জেলায় সংবাদপত্রের বিকাশ অনেকটা মিল রয়েছে। মূলত বনেদি পরিবারের সন্তান যারা মূলত শিক্ষা ও আইনপেশায় ছিলেন তাদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে সংবাদপত্রের হাতে খড়ি ঘটে।[১৯৭] বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে এই অঞ্চলের মানুষ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে থাকে। প্রথম দিকে শিক্ষিত হওয়া এই শ্রেণির হাত ধরে বিংশ শতাব্দীর ৯০ এর দশকে টাংগাইলের সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। ইতিহাস ও দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যায় প্রথম প্রকাশিত হয় আখবারে ইসলামিয়া মাসিক পত্রিকা ১৮৮৩ সালে এরপর 'মাসিক নবনূর' ও মাসিক 'নববিধান' নামক দুইটি পত্রিকা টাংগাইলে থেকে ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। অনেক আগেই মাসিক এই পত্রিকাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এগুলো সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না।[১৯৮]

১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় 'নব মিহির পত্রিকা'। উপরিউক্ত মাসিক পত্রিকার সমসাময়িক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাংগাইল হিতৈষি, প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। বর্তমানে এই পত্রিকাগুলোর কোনটিই চালু নেই। মূলত এভাবেই প্রথম দিকে টাংগাইলের সংবাদপত্রের শুভ পদযাত্রা শুরু হয়। যা আর কখনো থেমে না গিয়ে বরং

---

[১৯৬] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমি, ঐ, পৃ. ১৪৪।

[১৯৭] শামছুন নাহার, বাংলার মুসলমানদে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা, পৃ. ৪৭।

[১৯৮] ঐ, পৃ. ৪৮।

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যায়। এর কারণ দিন যত বাড়তে থাকে মানুষ তত শিক্ষিত হতে থাকে এতে করে অধিক সংবাদপত্র পাঠক সৃষ্টি হেতু সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ বাড়তে থাকে। [১৯৯]

পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সংবাপত্র প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ তত দিনে এ অঞ্চলে একটা শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৩৬ সালে সাপ্তাহিক 'হককথা' ও 'সমাচার' নামক দুইটি পত্রিকা এবং পাক্ষিক রায়ত প্রকাশিত হয় এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। [২০০]

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জনতা' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[২০১] এরপর ১৯৬৯ সালের ১লা ডিসেম্বর টাংগাইলে জেলা প্রতিষ্ঠিত হলে সংবাদপত্র আরো বিকশিত হয়। এ সময় প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্য পত্রিকা বালার্ক (১৯৭০), সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' (১৯৭১), পাক্ষিক 'সংকেত' (১৯৭৩)।[২০২]

এই পত্রিকাগুলো প্রকাশের মাধ্যমেই বলা চলে টাংগাইল আধুনিক সংবাদপত্রের যুগে প্রবেশ করে। এরপর পাঠক, সম্পাদক, পৃষ্ঠপোষক ও সাংবাদিক সবকিছুই বেড়ে যেতে থাকে। সাংবাদিকতা হয়ে উঠে জনপ্রিয় পেশা। এরপর শেষ ধাপে একবিংশ শতকের ৮০-র দশক থেকে টাংগাইলে বর্তমানে বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ যাত্রা শুরু করে। সব ধরনের সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও পাঠক মিলিয়ে নিঃসন্দেহে টাংগাইলকে 'সচেতন পাঠকদের নগরী' বলে অভিহিত করা যায়।

*** টাংগাইলের সংবাদপত্রের ধরনঃ**

---

[১৯৯] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ৫০।

[২০০] বাংলা নিউজ ২৪.কম।

[২০১] বাংলা নিউজ ২৪.কম।

[২০২] উইকিপিডিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮।

প্রকাশের সময় ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে সংবাদপত্র বিভিন্ন ধরনের হয়। এ ক্ষেত্রে মোদ্দাকথা হলো প্রায় সব ধরনের সংবাদপত্র টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয়।

i) দৈনিক

ii) সাপ্তাহিক

iii) পাক্ষিক

iv) মাসিক

এছাড়া প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও ক্রিয়া পত্রিকা।[২০৩]

*** অবলুপ্ত সংবাদপত্রঃ**

অর্থাৎ যে সংবাদপত্রগুলো পূর্বে প্রকাশিত হত কিন্তু এখন বন্ধ আছে অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। মূলত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, কারিগরি ত্রুটি, দক্ষ সংবাদকর্মী এবং পাঠকের অভাবে বহু পত্রিকা চালানো সম্ভব হয়নি তাই এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। আর এখন আমরা জানব টাংগাইল থেকে প্রকাশিত এমন কতগুলো পত্রিকার নাম যেগুলো নানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে পত্রিকাগুলো ঠিক করে বন্ধ হয়ে যায় তা জানা যায় না।

i) সাপ্তাহিক পত্রিকা–

- হিতকরী
- সমাচার
- হককথা
- বুলেটিন বাংলা খুৎবা
- সত্যকথা
- জনতা
- টাংগাইল হিতৈষি
- নব মিহির
- প্রবাহ

---

[২০৩] www.Tangail.com

- দুরবীন
- জয়বাংলা
- পূর্বাকাশ
- লৌহজং
- খামোশ
- মৌবাজার
- বিদ্রোহী কণ্ঠ
- প্রযুক্তি
- মূল স্রোত
- টাংগাইল বার্তা
- সাহিত্য পত্রিকা বালার্ক

ii) পাক্ষিক পত্রিকা

- সংকেত
- আহাম্মদী
- হিতকরী
- রায়ত

ii) মাসিক পত্রিকা

- আখবার ই-ইসলামিয়া
- নবনূর
- নব বিধান
- প্রজাশক্তি[২০৪]

*** টাংগাইলের জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা সংবাদপত্র ও সাময়িকীঃ**

[২০৪] টাংগাইল জেলা, উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

১৮৮২ সালে টাংগাইলে যে সংবাদপত্রের পদযাত্রা তা ২০১৯ সালে এসে সমৃদ্ধ হয়েছে। এগিয়েছে সংবাদপত্রের সংখ্যা, বেড়েছে পাঠক এবং সংবাদকর্মী। সংবাদ মানুষকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করে আর তাই মানুষ সংবাদপত্রের প্রতি ব্যাপক আগ্রহী দিন দিন সভ্যতা বিকাশের কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকী। টাংগাইল শহর থেকে এবং কয়েকটি উপজেলা থেকে খ্যাতনামা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে থেকে পাঠক সমাদৃত কিছু সংবাদপত্র ও সাময়িকী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:-

*** দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ:**

টাংগাইল শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোর মধ্যে 'দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ' পত্রিকাটি বেশ পাঠক সমাদৃত। এটি টাংগাইল শহর থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশ শুরু করে। বর্তমানে এর পাঠক সংখ্যা অনেক শুধু শহর নয় জেলার বিভিন্ন উপজেলায়ও আছে এর চাহিদা। জাফর আহমেদের সম্পাদনায় পত্রিকাটি তার সত্য ও ন্যায়ের পথের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। জাতীয়, আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক, খেলাধুলা, বিনোদন, বাণিজ্য সব ধরনের খবর প্রচার করে থাকে সংবাদপত্রটি।[২০৫]

*** দৈনিক প্রগতির আলো:**

৯০ এর দশকে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে বিশুদ্ধ ও পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশন এর মাধ্যমে জনগনের মন কাড়া পত্রিকা দৈনিক প্রগতির আলো। টাংগাইলের নিরালা মোড় থেকে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত ইমরান। সব ধরনের সংবাদের জমজমাট আয়োজন থাকে প্রতিদিনের প্রগতির আলোর প্রতি পাতায়।

---

[২০৫] বাংলা নিউজ ২৪ ডট কম

তবে বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ আছে।[২০৬]

*** দৈনিক টাংগাইলের খবরঃ**

ওয়ারেছুল ইসলামের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত একটি জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক টাংগাইলের খবর। বস্তুনিষ্ঠ ও আঞ্চলিক সংবাদ প্রাধান্য পাওয়ায় পত্রিকাটি বেশ পাঠক সমাদৃত।[২০৭]

*** দৈনিক দেশের পত্রঃ**

সংবাদ সরবরাহ করে টাংগাইলের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও সম্যক বিষয় সম্পর্কে অবহিতকরণের মাধ্যমে জনসেবা করছে যে পত্রিকাটি তার নাম 'দৈনিক দেশের পত্র'। রোফায়দা পন্নীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, খেলাধুলা, বিনোদন, বাণিজ্যসহ সকল বিষয়ের সংবাদ উপস্থাপন করে। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকা অবস্থিত।[২০৮]

*** দৈনিক বজ্রশক্তিঃ**

সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার দৈনিক বজ্রশক্তি পত্রিকা। এস এম সামছুল হুদার সম্পাদনায় প্রকাশিত এ পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশ করছে।[২০৯]

*** দৈনিক প্রগতির আলোঃ**

নাজমুছ ছাদাত নোমান কর্তৃক সম্পাদিত ও কলেজ পাড়া থেকে প্রকাশিত এ সংবাদপত্র হাজারো সংবাদ শিকারী মানুষের সংবাদের তৃষ্ণা মেটায়। এটি জনপ্রিয় পত্রিকা।[২১০]

---

[২০৬] এক নজরে টাংগাইল, সংবাদপত্র।

[২০৭] সংবাদপত্রে টাংগাইল জেলা, বাংলা পিডিয়া (www.Tangail.com)

[২০৮] ঐ

[২০৯] ঐ

[২১০] টাংগাইল প্রতিদিন (অনলাইন সংবাদপত্র, ২৩.৩.২০১৯)

*** দৈনিক দেশ কথাঃ** টাংগাইল থেকে প্রকাশিত আরো একটি দৈনিক হলো দৈনিক দেশ কথা। এটিও বেশ পাঠক সমাদৃত।

এছাড়া টাংগাইল থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক হলো:

- দৈনিক মফস্বল
- দৈনিক বংশাই
- মধুপুর বার্তা
- ধনবাড়ি বার্তা
- দৈনিক কালের স্রোত প্রভৃতি।[২১১]

*** সাপ্তাহিক পূর্বকাশঃ**

সাপ্তাহিক পত্রিকা পূর্বাকাশ বেশ পাঠক সমাদৃত। টাংগাইলের সবচেয়ে বড় বড় সাংবাদিকদের কাগজ পূর্বাকাশ। পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে আছেন খান মোহাম্মদ খালেদ। সপ্তাহের একদিন পাঠকরা এই পত্রিকার জন্য উন্মুখ থাকেন।

পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৯৪** সালে।[২১২]

*** জনতার কণ্ঠঃ** সাপ্তাহিক জনতার কণ্ঠ পত্রিকাটি **১৯৯২** সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সকল আয়োজন নিয়ে সপ্তাহে একদিন হাজির হয় এই পত্রিকা।[২১৩]

*** মধুপুর বার্তাঃ** মধুপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা হলো মধুপুর বার্তা। এটি মধুপুরবাসীর জাতীয় জীবনের দর্পন। সচেতনতা, সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অন্য নাম মধুপুর বার্তা। এছাড়া টাংগাইল শহর ও উপজেলা থেকে প্রকাশিত হয় আরো কতগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকা। যেমন-

i) ধনবাড়ী বার্তা

---

[২১১] এক নজরে টাংগাইল, উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[২১২] E-barta.com

[২১৩] E-barta.com

ii) সামান

iii) মধুবানী

iv) গণবিল্পবী প্রভৃতি।[২১৪]

*** পাক্ষিক মধুবানীঃ**

প্রতি ১৫ দিনে ১ বার প্রকাশিত হয় যে পত্রিকা তাকে বলে পাক্ষিক পত্রিকা। টাংগাইলের বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকা মধুবানী। যা বহুদিন যাবত মানুষের সংবাদের খোরাক মিটাচ্ছে।[২১৫]

*** ত্রৈমাসিক আদালতঃ** তিন মাস পর পর একবার প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। এই পত্রিকা ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। যে কয়েকটি পত্রিকা পুরো টাংগাইলের মননের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছে তার মধ্যে আদালত একটি। বস্তুনিষ্ঠ ও বিষয়ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশই এর মূল বৈশিষ্ট্য।[২১৬]

*** অনলাইন নিউজ পোর্টালঃ**

প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে সবকিছুই যখন চলে এসেছে মানুষের হাতে হাতে তখন সংবাদই বা বাদ থাকবে কেন? তাই জন্ম হয়েছে অনলাইনে সংবাদ পাঠের অভ্যাসের। পাঠকের এই চাহিদা পূরণে টাংগাইল কেন থাকবে পিছিয়ে? টাংগাইলের সংবাদ পাঠবাদের জন্য যাত্রা শুরু করেছে কয়েকটি অনলাইন সংবাদ মাধ্যম।

জনপ্রিয়তার শীর্ষের কয়েকটির পোর্টালের তথ্য উপস্থাপন করা হলো–[২১৭]

*** টাংগাইল দর্পণঃ** টাংগাইলে জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল টাংগাইল দর্পণ। 'সব সময় সব খবর সবার আগে'– স্লোগানকে মূলমন্ত্র হিসেবে নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই

---

[২১৪] E-barta.com

[২১৫] E-barta.com

[২১৬] T news.com

[২১৭] T news.com

পোর্টালের সম্পাদক ও প্রকাশক আবু তাহের। নিরালা মোড় থেকে প্রচারিত হয় এই ই নিউজ। নিয়মিত সব বিভাগের পাশাপাশি স্বাস্থ্য টিপস্, ফ্যাশন, আই টি সহ সব সংবাদ সবার আগে পাওয়া যায় এই নিজউ পোর্টালে। সুখ্যাতিও তাই সবার থেকে বেশি।[২১৮]

*** টাংগাইল প্রতিদিনঃ** আরেকটি দর্শক ও পাঠক প্রিয় নিউজ পোর্টাল হলো টাংগাইল প্রতিদিন। ই নিউজটির প্রকাশক ও সম্পাদক মোঃ মোস্তাক হোসেন, রেড ক্রিসেন্ট ভবন, টাংগাইল থেকে এই পোর্টালটি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সকল সংবাদ অল্প সময়ে কম্পিউটার বা মুঠোফোনে পেতে টাংগাইল প্রতিদিন নিরলসভাবে কাজ করছে।[২১৯]

*** কারক নিউজ ডট কমঃ**

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা শুরু করেছে এ পোর্টালটি। তবে ইতোমধ্যে সংবাদ পরিবেশনে মাধ্যমে সবার নজরে এসেছে। সম্পাদক মোঃ আমিনুল আলম।

*** টি নিউজ বিডিঃ**

'আমরা নিরপেক্ষ নই, স্বাধীনতার পক্ষে' – স্লোগানকে সামনে রেখে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করছে ই নিউজ পোর্টাল টি নিউজ বিডি। এটি বেশ জনপ্রিয়।[২২০]

*** বিশিষ্ট সাংবাদিকঃ**

১৮৮৩ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টাংগাইলের সংবাদ পত্রের যে অপ্রতিরোধ্য যাত্রা এই যাত্রায় সহযোদ্ধা ছিলেন অনেকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ টাংগাইল সংবাদপত্রের নগরীতে পরিণত হয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনেক প্রতিথযশা সাংবাদিক

---

[২১৮] www.Daily.Ettefaq.com

[২১৯] www.Tangail.com

[২২০] www.E barta.com.

সম্পর্কেই জানা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তারপরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক সম্পর্কে জানাতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

*** মাওলানা আঃ হামিদ খান ভাসানীঃ** মাওলানা ভাসানী শুরু আধুনিক টাংগাইলের রূপকারই নয় তিনি নিজেই একজন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক এবং সাংবাদিক। প্রাথমিক পর্যায়ে অল্প কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক এবং সম্পাদকের মধ্যে তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তি। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'হক কথা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় **১৯৩৬** সালে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও সংবাদ প্রদানে তার পত্রিকার কোন জুঁড়ি ছিল না। পরবর্তী যদিও সংবাদ পত্রটি বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি।[২২১]

*** আঃ মান্নানঃ** দেশের নন্দিত রাজনীতিবিদ ও সম্পাদক আঃ মান্নান। মহান মুক্তিযুদ্ধ তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। তিনি মুজিবনগর সরকারের একমাত্র মুখপাত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি টাংগাইলের সংবাদপত্রের উন্নয়নেও অবদান রাখেন।[২২২]

*** রফিক আজাদঃ** বিশিষ্ট কবি, সম্পাদক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক আজাদ। তিনি বাংলা একাডেমীর মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' এর সম্পাদক ছিলেন। 'রোববার' পত্রিকাতেও তিনি সম্পাদনার কাজ করেছেন। তিনি টাংগাইলের সাংবাদিকতার অন্যতম দিকপাল।[২২৩]

*** জাফর আহমেদঃ** টাংগাইলের প্রথিতযশা সাংবাদিক জাফর আহমেদ তিনি বহুদিন যাবত সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি 'মজলুমের কণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক।[২২৪]

---

[২২১] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৬৫

[২২২] ঐ, পৃ. ৭২।

[২২৩] আলম, জাফর, স্মরণীয়-বরনীয়, পৃ. ১৪৪।

[২২৪] ঐ, পৃ. ১৬৪।

*** ওয়ারেছুল ইসলামঃ** এ অঞ্চলের আর একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ওয়ারেসুল ইসলাম। তিনি অনেক সাধনার মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে করেছেন শানিত। বর্তমানে তিনি টাংগাইলের খবর পত্রিকার সম্পাদক।[২২৫]

*** মোঃ হাবিবুর রহমান সরকারঃ** আরেকজন বড় মাপের সাংবাদিক মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার তিনি 'সাপ্তাহিক যুগধারার' সম্পাদক।[২২৬]

*** কামনাশীষ শেখরঃ** সাপ্তাহিক পূর্বাকাশ পত্রিকার বার্তা প্রধান কামনাশীষ শেখর একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক।[২২৭]

এছাড়া আরো কয়েকজন সাংবাদিকের কথা না বললেই নয়। তারা হলেন–

i) নাজমুছ ছাদাত নোমান

ii) মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত ইমরান

iii) রোফায়দা পন্নী

iv) এস এম শামছুল হুদা

v) মোঃ আমিনুল ইসলাম

vi) মোহাম্মদ মোস্তাক হোসেন

vii) মাহবুব আলম বুলবুল প্রমুখ।[২২৮]

---

[২২৫] ঐ, পৃ. ১৬৫।

[২২৬] E barta.com

[২২৭] Tangail.com

[২২৮] টাংগাইল প্রতিদিন (অনলাইন সংবাদপত্র, ২৩.১.২০১৯)

পঞ্চম অধ্যায়

টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা

একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষা মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। যে কোন জেলার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে আলোচনা করতে গেলে সে অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। আলোচ্য অধ্যায়ে টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৫.১ টাংগাইল জেলার শিক্ষার প্রেক্ষাপট

পূর্বে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তখন স্থানীয় ব্যবস্থার অধীনে পাঠশালা এবং গুরুগৃহে শিক্ষা দেওয়া হতো। পরবর্তীতে মুসলমান শাসনাধীনে স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা মসজিদ কেন্দ্রিক আরবি, বাংলা ভাষা, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো।

পরবর্তীতে সুলতানী, পাঠান ও মোগল আমলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন না হলেও বহু স্থানে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। টাংগাইলের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া পত্তনও ঠিক এভাবেই। অর্থাৎ মক্তব, মসজিদ ভিত্তিক যে শিক্ষা কার্যক্রম মধ্যযুগ থেকে প্রচলিত ছিল। তবে সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতার উন্নতি, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপসহ নানাবিধ কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির আমূল পরির্তন ঘটে। বর্তমানে টাংগাইলের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে উন্নতি তার সূচনা ওখান থেকেই সংগঠিত হয়েছে।

৫.২ টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ২০১৯ সাল পর্যন্ত টাংগাইল জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিকাশকে মোট ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. প্রাথমিক

২. মাধ্যমিক

৩. উচ্চতর

৪. নারী শিক্ষা

৫. মাদরাসা শিক্ষা

৬. বিশেষ শিক্ষা [১]

এসব শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠাগুলো প্রধানত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মোতাবেক সরকারি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত আর্থিক সাহায্যের উপর গড়ে উঠে ও শিক্ষা বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়।[২]

৫.৩ প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত। ১৯ শতাব্দীতে একে প্রাথমিক/ মৌলিক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হতো। ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (Indian Education Commission) দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে কিভাবে এ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা যায় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৩]

১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Primary Education Act VI of 1919) অনুযায়ী ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯১৯ সালের শিক্ষা আইনে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাধ্যতামূলক করা হয়।[৪]

---

[১] খান, মাহবুব, টাংগাঈল জেলা পরিচিতি, পৃ. ৩৪।

[২] Government of Bengal, Reports on the public Instruction of Bengal (1904-1905 (Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1905) Pp 4-5 (here after Report on education.

[৩] Government of Bengal, Reports of the Progress of Education in Bengal, 1882 (Kolkata: Bengal Secretariat Book Depo. 1884) P.22

[৪] B.R Purkait, Administration of Primary Education in West Bengal (Kolkata; Firma K.L.M. 1984) P. 45

এই আইনের ফলে পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হয়। সরাসরি ব্রিটিশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে কাজ শুরু করলে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে।

টাংগাইল জেলায় মানব বসতি ও সভ্যতার ইতিহাস যেহেতু পুরাতন তাই সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে দ্রুত পাল্টাতে থাকে টাংগাইল জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। উনবিংশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে পুরো টাংগাইলে প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হয়। ১৯৬৯ সালের ১লা ডিসেম্বর টাংগাইল জেলা ঘোষিত হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরো বেগ লাভ করে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে আর এই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি।[৫]

ঢাকার অদূরে অবস্থিত টাংগাইল জেলা সকল পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই ভাল। এর ধারবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও অনেক উঁচুতে অবস্থান করছে।

সহজ দূরত্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়, অভিভাবকদের সচেতনতা ও যোগ্য শিক্ষকদের কল্যাণে টাংগাইলের প্রাথমিক শিক্ষার মান ঈর্ষণীয়।

নিচে টাংগাইল জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি তালিকা:

উপজেলা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১. মধুপুর	১০৩ টি
২. ধনবাড়ি	৭৩ টি
৩. গোপালপুর	১৩৫ টি
৪. ঘাটাইল	১৫৯ টি
৫. কালিহাতি	১৭০ টি
৬. ভূঞাপুর	৯৭ টি

[৫] আঃ রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ১৬৩।

উপজেলা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
৭. সদর	১৫৯ টি
৮. নাগরপুর	১৫৭ টি
৯. দেলদুয়ার	১৫৪ টি
১০. বাসাইল	১৫৪ টি
১১. সখিপুর	১২৭ টি
১২. মির্জাপুর	১৬২ টি

[৬]

প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার খুবই কম। প্রাথমিকে ছেলেমেয়ের অনুপাত সমান।

৫.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা

উচ্চতার ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে। বৃটিশ আমলে মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি স্তর ছিল। যথা-

i. উচ্চ ইংরেজি (High English)

ii. মধ্য ইংরেজি (Middle English)

iii. মধ্যমাতৃভাষা (Middle Vernacular School)[৭]

উচ্চ ইংরেজি স্কুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সমমানের বিষয়াদি ইংরেজিতে পড়ানো হতো। মধ্য ইংরেজি স্কুলের উচ্চতর চার শ্রেণিতে ইংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল।[৮]

আজকের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে আমরা যেটা বুঝি, বস্তুত তার ভিত্তি রচিত হয় **১৯১১** সালের 'শিক্ষা কমিশন' (স্যাডলার কমিশন) এর রিপোর্টে। এ রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয় আজ আমাদের দেশে যে পৃথক পৃথক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে তা স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের পরম্পরা

[৬] এক নজরে টাংগাইল, ইউকিপিডিয়া।

[৭] Report on Public Instruction, 1902-1903, P. 16

[৮] Education in Bengal, 1902-1903, P. 33

অনুসারে সৃষ্টি। ব্রিটিশ মিশনারীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতার চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতার চতুর্দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। ঐ সময়ই পূর্ববঙ্গে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠে।

ব্রিটিশ শাসনামলেই রাজা-জমিদারদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় টাংগাইলে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অনেক প্রতিষ্ঠান।[৯]

প্রাথমিক শিক্ষার উচ্চ হারের যে ধারাবাহিকতা তার রেশ ধরেই টাংগাইলের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নত। নিচে টাংগাইল জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা:

উপজেলা	মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১. মধুপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২৪টি
২. ধনবাড়ী	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২৭টি
৩. গোপালপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪৪টি
৪. ঘাটাইল	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪৩টি
৫. কালিহাতি	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪৪টি
৬. ভূঞাপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২৭টি
৭. সদর	সরকারি – ২টি বেসরকারি – ৫১টি
৮. নাগরপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৩০টি

[৯] আল বেরুনি, মোঃ সোহেল, নওয়াব আলী, শিক্ষা ও সমাজ সেবা, পৃ. ৬৪।

উপজেলা	মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৯. দেলদুয়ার	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২৯টি
১০. বাসাইল	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২৪টি
১১. সখিপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪৫টি
১২. মির্জাপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪৫টি

[১০]

*** মাধ্যমিক পর্যায়ের খ্যাতনামা ও পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

টাংগাইলের মাটিতে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে আলো ছড়াচ্ছে পুরাতন ও খ্যাতনামা কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিচে তেমনই কিছু পুরাতন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

*** সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়**

১৮৭০ সালে টাংগাইলের সন্তোষ ছয় আনির জমিদার শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরানী অত্র এলাকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জমিদারীর অর্থে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় প্রায় ৪.৫০ একর জমিতে তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠা করেন 'সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়'। এটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ২য় এবং টাংগাইলের সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি 'পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের' পরামর্শে ও পরিকল্পনায় ৩০০ ফুট দীর্ঘ চুন, সুরকীর পাকা ইমারত নির্মাণ করেন। ভবনের সামনে খনন করেন দিঘী। যা এই বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছিল। জাহ্নবী দেবী তার নিজস্ব অর্থ দ্বারা একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। এতে করে সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।[১১]

---

[১০] জাতীয় তথ্য বাতায়ন, টাংগাইল জেলা, শিক্ষা ব্যবস্থা।

[১১] আল বিরুনি, মো: সোহেল, নবাব আলী: শিক্ষা ও সমাজ সেবা, ঐ, পৃ. ৪৭।

এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে মহিম ঘোষ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ১ম স্থান, ১৯২৬ সালে দেবেন্দ্র নাথ মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ১৯৬৫ সালে ঢাকা বোর্ডে নিতাই পাল এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ১৯৬৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে আশীষ পাল প্রথম স্থান অর্জন করেন। [১২]

পুরো বিদ্যালয় ভবনটি জানালাবিহীন হওয়ায় পাক হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে এই ভবনের দরজা ভেঙ্গে ভুলবশত আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১৩]

দেশ-বিদেশের বহু মনীষী এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, মীর মোশাররফ হোসেন, শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, নলীনী মোহন।

সুবিখ্যাত ও বহুল পরিচিত গ্রন্থ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র লেখক দক্ষিণাচরণ মিত্র মজুমদার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। [১৪]

*** শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

টাংগাইলের গোপালপুর উপজেলার সুবর্ণখালি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র চৌধুরী ২০ একর জমিতে বিমাতার নামে ১৯০০ সালে শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ১১৯ বছর ধরে এই বিদ্যালয় হেমনগর তথা পুরো গোপালপুরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। টাংগাইলের বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে এটি অনেক প্রাচীন।[১৫]

---

[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭।

[১৩] ঐ, পৃ. ৪৭।

[১৪] ঐ, পৃ. ৪৮; আঃ রহিমের, টাংগাইলের ইতিহাস।

[১৫] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ৬৭।

*** গোপালপুর সুতী ভি এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

১৯২০ সালে হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এই বিদ্যালয়টি গোপালপুর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। ৯৯ বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। এই বিদ্যায় থেকে পড়ালেখা করে অনেকে আজ দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।[১৬]

*** বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

টাংগাইলেলর মেয়েদের শিক্ষিত করতে ১৯২১ সালে টাংগাইল শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিন্দুবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়। এটি এখন সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। প্রথমদিকে মানবিক ও বিজ্ঞানে পাঠদান করালেও এখন বাণিজ্য বিভাগেও পাঠদান হয়। টাংগাইলের নারী শিক্ষার উন্নয়নে এ বিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান বিদ্যমান।[১৭]

*** জামুর্কি নবাব স্যার আবদুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

টাংগাইলের প্রাচীন বিদ্যাপিঠের একটি হলো জামুর্কি নবাব স্যার আবদুল গণি উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯১৪ সালে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। জেলার বাইরের মানুষও এ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। [১৮]

*** মৈশামুড়া বসন্তকুমারী উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

মির্জাপুর উপজেলার মৈশামুড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মৈশামুড়া বসন্তকুমারী উচ্চ বিদ্যালয়। এটি একটি খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে ক্ষেত্র নাথ বোস তার স্ত্রীর নামে নিজ গ্রামে এ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিরক্ষর মানুষের শিক্ষা বিস্তারে এই বিদ্যালয় ভূমিকা রয়েছে। [১৯]

*** এম আজহার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

১৯৩১ সালে লাউহাটির প্রাণ কেন্দ্রে এম আজহার মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় নামে এম আরফান খান প্রতিষ্ঠা করেন স্বনামধন্য বিদ্যাপিঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রয়াণে

---

[১৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

[১৭] টাংগাইল বার্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

[১৮] ঐ।

[১৯] ঐ।

শোকাতুর বড় ভাই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাই এর নাম চিরস্মরণীয় করার প্রয়াস নিয়েছেন। উত্তর টাংগাইলে ফলাফলের দিক দিয়ে স্কুলটি সেরা।[২০]

*** মধুপুর রাণীভবানী মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

১৯৩৯ সালে মধুপুরে রাজশাহীর জমিদার দিনমনি দেবী চৌধুরানী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর টাগাংইলের মানুষের শিক্ষার আলো ফোটাতে এই বিদ্যালয়ের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বিদ্যালয়টিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ দান করা হয়। এছাড়া ভোকেশনাল পড়ার ব্যবস্থাও আছে। ২০০০ জন এর অধিক শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি সরকারি।[২১]

*** ভারতেশ্বরী হোমসঃ**

এটি মেয়েদের আবাসিক শিক্ষালয়। ঢাকা থেকে ৬৫ কি.মি. দূরে এবং টাংগাইল জেলা সদর হতে ৩৫ কি.মি. দূরে মির্জাপুরে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা প্রপিতামহী ভারতেশ্বরী দেবীর নামে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মেয়েদের চরিত্রবান, সৎ ও আদর্শবান নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। ১৯৯৭ সালে ভারতেশ্বরী হোমসে দেশের সর্ববৃহৎ শিশু কিশোর ও তরুণদের সংগঠন 'গার্ল ইন স্কাউট' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২]

*** বরাটী নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

শ্রী দুঃখীরাম রাজবংশী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। নরদানা গ্রামের ধলু মিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দুঃখীরাম রাজবংশী এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ সালে। প্রতিষ্ঠাকালীন বিদ্যালয়টির নাম ছিল বরাটী নরদানা পাকিস্তান উচ্চ বিদ্যালয়।[২৩]

---

[২০] আল বিরুনি, মো: সোহেল, নবাব আলী: শিক্ষা ও সমাজ সেবা পৃ. ১৭২।

[২১] প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৭১।

[২২] রনদা প্রসাদ সাহা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

[২৩] আবু হানিফ, ৫৫ নলগংগা, কালিহাতি, টাংগাইল।

অশিক্ষা কুশিক্ষা থেকে পুরো এলাকার মানুষকে রক্ষা করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করেছে এই বরাটী নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়।[২৪]

*** হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাই স্কুলঃ**

১৯৬৮ সালে গোপালপুর উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত হয় সূতি জিন্নাহ মেমরিয়াল হাই স্কুল। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গোপলপুর ভূঞাপুর থেকে নির্বাচিত এমপি হাতেম আলী তালুকদার জিন্নাহর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করতে বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পাঠালে বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর অনুমতি চান। বঙ্গবন্ধুর অনুমতি আনতে হাতেম আলী তালুকদার নিজে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে ঘটনা খুলে বললে শেখ মুজিব বলেন- আমার নামের পরিবর্তে মরহুম হোসেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নাম সন্নিবেশিত করলে আমি বেশী খুশি হবো।[২৫]

২০১৪ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকার মধ্যে ৭ম স্থান অর্জন করে হোসেন সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বিদ্যালয়।[২৬]

*** মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

মধুপুরে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানকারী ব্যক্তিদের নাম চির স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৭২ সালে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় শুধু শহীদদের নামই চির স্মরণীয় করে রাখেনি পাশাপাশি জ্ঞানের দ্বীপ জেলেছে সমগ্র উত্তর টাংগাইলে। বিভিন্ন জেলা থেকে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে। ফলাফলের দিক থেকে উত্তর টাংগাইলে এই বিদ্যালয় সবার সেরা।[২৭]

---

[২৪] সিরাজ উদ্দিন, ৬০ বল্লা, কালিহাতি, টাংগাইল।

[২৫] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৯।

[২৬] জাতীয় তথ্য বাতায়ন, টাংগাইল জেলা ।

[২৭] মধুপুর বার্তা (অনলাইন সংবাদপত্র, ২৩.১.২০১৯)

*** বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্থায়ী অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়।[২৮]

*** টাংগাইল কালেক্টরেট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজঃ**

টাংগাইল শহরের মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তরান্বিত করতে প্রতিষ্ঠিত হয় টাংগাইল কালেক্টরেট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। প্রথম থেকেই নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে প্রতিষ্ঠানটি। পরবর্তীতে স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করা হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কলেজটি অনন্য।

*** সাধুটী মিডল ইংলিশ হাই স্কুলঃ**

প্রথমদিকে টাংগাইলে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে যে অল্প কয়টি ইংলিশ হাইস্কুল ছিল তার মধ্যে সাধুটী ইংলিশ হাইস্কুল অন্যতম। ইংরেজ শাসনের সময় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছে হাইস্কুলটি। বিখ্যাত সাহিত্যিক রফিক আজাদ এই হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন।[২৯]

*** রামগতি শ্রীগোবিন্দ হাই-ইংলিশ স্কুলঃ**

রামগতি শ্রী গোবিন্দ হাই ইংলিশ স্কুলটি কালিহাতিতে অবস্থিত। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অনেক। এখানে পড়ালেখা করেছেন অনেক গুণিজন। এদের মধ্যে রফিক আজাদ অন্যতম।

*** শিবনাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ঃ**

এই প্রাচীন বিদ্যালয়টি কৈজুড়ি গ্রামের নব কুমার রায় প্রতিষ্ঠা করেন।

টাংগাইলের শিক্ষা বিস্তারে এই কলেজটি অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।[৩০]

---

[২৮] টাংগাইল বার্তা (অনলাইন সংবাদপত্র, ২৩.২.২০১৯)

[২৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, টাংগাইল, পৃ. ৬৮।

[৩০] ঐ, পৃ. ৬৯।

*** বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

শিক্ষা নগরী টাংগাইলের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়। অশিক্ষিত মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো জালাতে বিবেকানন্দের নামে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিদ্যালয়টি কয়েক যুগ ধরে জ্ঞান বিতরন করে যাচ্ছে। অনেক জ্ঞানী গুণী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন।

৫.৫ উচ্চতর শিক্ষা

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রথম ও ২য় এ দুই শ্রেণির কলেজ ছিল। প্রথম শ্রেণির কলেজে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদান এবং কখনও কখনও এম এ ও এম এস সি ডিগ্রী প্রদান করা হতো। দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হতো। পরে প্রথম শ্রেণির কলেজে ভর্তি হয়ে ডিগ্রী গ্রহণ করতে হতো। ব্যক্তিগত তহবিল ও সরকারি অনুদানে কলেজ পরিচালিত হতো।[৩১]

বাংলায় স্থাপিত কলেজ সমূহের অধিকাংশই ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির। প্রথম শ্রেণির কলেজের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। সাধারণত এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল অসম্পূর্ন। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছিল ক্লাশ রুম এবং শিক্ষকের সংকট। সরকারি কলেজগুলোর ছিল এই অবস্থা। বেসরকারি কলেজের অবস্থা ছিল আরও করুন।

উপরে পুরো বাংরার উচ্চ শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। টাংগাইল এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। তবে ১৯২০ সালের পর থেকেই টাংগাইলে উচ্চ শিক্ষার উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯২৬ সালে প্রাচ্যের আলীগড় নামে খ্যাত বিখ্যাত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চ শিক্ষার পথ অনেকটা সহজ হয়। আস্তে আস্তে আরো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় টাংগাইলের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাও অনেকটাই উন্নত। শিক্ষায়, দীক্ষায় টাংগাইল অনন্য স্থান অধিকার করেছে।[৩২]

---

[৩১] Report on public instruction, 1904-05, p. 4-5.

[৩২] টাংগাইলের শিক্ষা ব্যবস্থা, E-Barta.com.

উপজেলা	মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১. সদর	সরকারি – ৪টি বেসরকারি – ১০টি
২. মধুপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৬টি
৩. ধনবাড়ী	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৭টি
৪. গোপালপুর	সরকারি – ৭টি বেসরকারি – ৪টি
৫. ঘাটাইল	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৬টি
৬. ভূঞাপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৬টি
৭. কালিহাতী	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৬টি
৮. নাগরপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২টি
৯. দেলদুয়ার	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪টি
১০. বাসাইল	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ২টি
১১. সখিপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৪টি
১২. মির্জাপুর	সরকারি – ১টি বেসরকারি – ৬টি

উপজেলা	বিশ্ববিদ্যালয়
সদর উপজেলা	মাওলানা আবদুল হামিদ খান বিজ্ঞান ও ভাসানী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

[৩৩]

উপরে উল্লেখিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাংগাইলে বিস্তৃত হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা।

*** টাংগাইলের বিখ্যাত ও প্রাচীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ**

যে সব প্রাচীন ও খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাংগাইলে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে সে সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

*** সরকারি সা'দত কলেজঃ**

প্রাচ্যের আলীগড় (বাংলা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে এটাই মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের জন্য প্রথম কলেজ) বাংলার পশ্চাপদ মুসলমান জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয় এই কলেজ। পড়ালেখার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পিঠস্থানের পরিণত হয় কলেজটি। বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্র সম্প্রদায় এর মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করার জন্য আলীগড় আন্দোলনের সাথে তুলনা করে এই কলেজকে 'প্রাচ্যের আলীগড়' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৩৪]

প্রাচ্যের আলীগড় হিসেবে খ্যাত সরকারি সা'দত কলেজ টাংগাইলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ। টাংগাইলের জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ও সাহিত্যিক প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ১৯২৬ সালে টাংগাইলের করটিয়ায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫]

জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী তাঁর দাদা সা'দত আলী খান পন্নীর নামে কলেজটি নামকরণ করেন। বাংলা ভাষী মুসলমানদের জন্য এটিই প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

---

[৩৩] www.Tangail.gov.bd.com.

[৩৪] আহমেদ, তোফায়েল, আঁটিয়ার চাদ পৃ. ৬২।

[৩৫] প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁ, উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি সার্বিক দিকে সচেতনতা ও দাবি আদায়ের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'প্রাচ্যের আলীগড়' নামে অভিহিত করা হয়।[৩৬] প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ১৯২৬-১৯৪৭ পর্যন্ত একই পদে বহাল ছিলেন।[৩৭]

টাংগাইল থেকে ৭ কি.মি. দূরে ৩৮ একর জমির উপর এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উক্ত কলেজ পরিদর্শনে আসেন তখন কলেজটি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়।[৩৮]

জ্ঞানের আলো ছড়ানো এই প্রতিষ্ঠানে মোট ২৬,০০০ শিক্ষার্থী আছে। মোট ১৮ টি বিষয়ে অনার্স ও ১২ বিষয়ে মাস্টার্স চালু আছে।

মোট পাঁচটি একাডেমিক ভবন, ২টি হিন্দু হোস্টেল, দুইটি ছাত্রী হোস্টেল, ২টি ছাত্র হোস্টেল রয়েছে। আছে হাতে লেখা কোরআন শরীফ সহ বহু মূল্যবান বই নিয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত নজরুল কুটির। এছাড়াও আছে দুইটি পুকুর। যা পুরো কলেজের পরিবেশকে করেছে অতীব মনোরম। রয়েছে সুবিশাল মসজিদ, মেডিকেলসহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। রয়েছে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।[৩৯]

*** মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজঃ**

মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ টাংগাইল শহর থেকে ৩ কি.মি. দূরে কাগমারীতে অবস্থিত। এটি কাগমারী কলেজ নামেই অধিক পরিচিত। তবে একে সংক্ষেপে "এম এম আলী কলেজ" বলা হয়। কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু ও খেলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০]

---

[৩৬] পূর্বোক্ত, ঐ।

[৩৭] ঐ।

[৩৮] ঐ।

[৩৯] www.edu.gov.com.

[৪০] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৬৮।

১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে কলেজটি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। একটি সরকারি পরিত্যক্ত ভবনে অফিস ও ক্লাসরুম চালু করা হয়।[৪১]

১৯৭৫ সালে কলেজটি সরকারি করা হয়। বর্তমানে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান ছাড়াও কলেজটিমে ১৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে। কলেজটির রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। ছিমছাম মনোরম পরিবেশ। যা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন নিবিষ্ট করতে সহযোগিতা করে। ছাত্রদের জন্য আছে একটি হোস্টেল। কলেজটি গরীব ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও মেধা বিকাশে কাজ করে আসছে।

*** কুমুদিনী কলেজঃ**

দেশে নারী শিক্ষার বিস্তারে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ১৯৩৩ সালে তাঁর মায়ের নামে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক ছিল পরে ১৯৪৭ মালে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়।[৪২]

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কলেজের সকল ব্যয়ভার বহন করে।

বাংলাদেশের জনকল্যানকর সংস্থাগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম ও প্রাচীনতম। ট্রাস্টের নিবন্ধনকৃত নাম "কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড"। শিল্পপতি ও সমাজসেবক শহীদ রণদা প্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ১৯৪৭ সালে তাঁর মায়ের নামে এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করে থাকে। আর পি সাহার মা তার যখন ৭ বছর বয়স তখন বিনা চিকিৎসায় মারা যান। দারিদ্রের কারণে লেখাপড়া না করতে পারলেও তার ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ভাগ্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মনেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি জনসেবায় কিছু করতে চান।

সে লক্ষেই তিনি তাঁর সকল সংস্থা ১৯৪৭ সালে একটি ট্রাস্টের অধীনে আনেন। উদ্দেশ্য ব্যবসার লভ্যাংশ অসহায় মানুষের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। তিনি এই ট্রাস্টের নাম দেন "কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড"।[৪৩]

---

[৪১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

[৪২] টাংগাইলের শিক্ষা ব্যবস্থা, বাংলা-পিডিয়া।

[৪৩] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬/৫/১৫ ।

বর্তমানে কলেজটি সরকারি। এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত একটি কলেজ। ১৯৪৪ সালে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়।

১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহে মুমিনুন্নেচ্ছা কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে এটি পাকিস্তানের একমাত্র মহিলা কলেজ ছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী, অনার্স মাস্টার্স সকল পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এ কলেজে আছে। মোট ২৩,০০০ ছাত্রী পড়ালেখা করে এ কলেজে।

টাংগাইলের "নারী শিক্ষার বাতিঘর" হিসেবে কাজ করছে কলেজটি।

*** হেমনগর ডিগ্রী কলেজঃ**

হেমচন্দ্র চৌধুরীর পিতা কালিচন্দ্র চৌধুরী তদানীন্তন ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর থানার অর্ন্তগত আম্বারিয়া এস্টেটের জমিদার ছিলেন। হেমচন্দ্র চৌধুরী আম্বারিয়া হতে যমুনা নদীর পূর্ব তীরে গোপালপুর উপজেলার সুবর্ণখালী গ্রামে জমিদার বাড়ি স্থানান্তর করেন। এ বাড়িটি নদী ভাঙ্গনে বিলীন হলে শিমলাপাড়ায় নতুন বাড়ী নির্মাণ করেন। তাঁর নামে এ গ্রামের নাম হয় হেমনগর। হেমচন্দ্র চৌধুরী শিক্ষা বিস্তারে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ১৯৫২ সালে তিনি কাশিতে মারা যান।[৪৪]

জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর বিশাল পরিত্যক্ত বাড়িতে ১৯৭৯ সালে এলাকাবাসীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় হেমনগর ডিগ্রী কলেজ। এতে করে জমিদার বাড়ি যেমন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ঠিক তেমনি গোপালপুরবাসীর উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত হেমনগর ডিগ্রী কলেজ মানুষের জ্ঞানের খোরাক মেটাচ্ছে।

*** গোপালপুর কলেজঃ**

গোপালপুর কলেজ উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কলেজটি ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উত্তর টাংগাইলের একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। কলেজটিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে কলেজটি জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়। এই কলেজটি উত্তর টাংগাইলের একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

[৪৪] প্রগতির আলো, গোপালপুর।

হওয়ায় বহু দূর থেকে এখানে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতো। যা কলেজটি নিঃস্বার্থ ভাবে এখনও করে চলেছে। বর্তমানে কলেজটি সকল আধুনিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীদের পরম মমতায় শিক্ষা দিচ্ছে।[৪৫]

*** ঘাটাইল জিবিজি কলেজঃ**

টাংগাইলের ঘাটাইল উপজেলায় অবস্থিত জিবিজি কলেজ ঘাটাইলের প্রথম কলেজ। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে কলেজটি ঘাটাইল উপজেলায় আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে। এটি ঘাটাইলের প্রথম ও সবচেয়ে প্রাচীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঘাটাইল উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে এই কলেজ অবস্থিত। উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী, অনার্স, মাস্টার্স সব ডিগ্রীই দেওয়া হয় এই কলেজ থেকে। এটি এই অঞ্চলের বাতিঘর। বর্তমানে কলেজটি সরকারি।[৪৬]

*** মধুপুর ডিগ্রী কলেজঃ**

১৯৭২ সালে মহেন্দ্র লাল বর্মণ নামক এক ব্যক্তি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মধুপুর শহর থেকে ১ কি. মি. দূরে বংশী নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজটি। উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স, ডিগ্রী, মাস্টার্সও পড়ানো হয় এই কলেজে। ৫০০০ এর বেশী ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে এই কলেজে। বর্তমানে কলেজটি সরকারি।[৪৭]

*** মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজঃ**

ফলাফলের দিক থেকে বাংলাদেশের ১ নম্বর ক্যাডেট কলেজ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। এটি বাংলাদেশের তৃতীয় ক্যাডেট কলেজ। জাতীয় পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি ক্যাডেটদের শারীরিক, মানুষিক বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা সম্পূরক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মির্জাপুর সদর থেকে ৮ কি.মি. দূরে এ কলেজ অবস্থিত। কলেজটি ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[৪৫] জাফর, আলম, স্মরণীয় বরনীয়, পৃ. ১৭২।

[৪৬] সজিব হোসেন, ২২ জামুরিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল।

[৪৭] খাইরুল ইসলাম, ২০, লোকদেও, মধুপুর, টাংগাইল।

মাইকেল উইলিয়াম পিট হলো এর প্রথম প্রধান শিক্ষক। মোট ৯৫ একর জমির উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত।[৪৮]

'বিদ্যাই বল' এই মূলনীতিকে বুকে ধারণ করে ৭ম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা করা হয় এই কলেজে। এর আসন সংখ্যা মোট ৫২টি। কলেজটি সামরিক বাহিনী পরিচালনা করে।

*** ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজঃ**

ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট কলেজটি ঘাটাইলের শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাসে অবস্থিত। টাংগাইল জেলা সদর হতে ৩৬ কি.মি. দূরে মনোরম পরিবেশে এই কলেজটি অবস্থিত। কলেজটি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। "বিকশিত হও, ভবিষ্যতের জন্য"– এই শ্লোগানকে মূলনীতি হিসেবে নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য এই কলেজে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ দান করা হয়। লেফ. কর্ণেল পদের একজন অফিসার এর অধ্যক্ষ। কলেজের ফলাফল ঈর্ষণীয়।[৪৯]

*** মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়টি সন্তোষ জমিদার বাড়িতে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সন্তোষের জমিদারগণ দেশ ত্যাগ করেন। মাওলানা ভাসানী এই পরিত্যক্ত বাড়িতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। সন্তোষের সেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত জায়গায় মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫০]

বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯৯ সালে টাংগাইলের সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত হয়। নামকরণ করা হয় বাংলার কিংবদন্তি রাজনৈতিক নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে। মোট ৫৭ একর জমির উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত।

মোট ৫টি অনুষদের অধীনে ১৫টি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

---

[৪৮] টাংগাইলের অহংকার, উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[৪৯] সজিব হোসেন, ২২, জামুরিয়া, ঘাটাইল, টাংগাইল।

[৫০] জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

সুন্দর, মনোরম ও ছাত্র রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা লাভ করতে আসে।

৫.৬ নারী শিক্ষাঃ

বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগেও এদেশে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসনামলেও নারী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হতো। তবে এ শিক্ষা ব্যবস্থাটা শুধু উচ্চবিত্ত পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম নারী শিক্ষার জন্য সরকারি প্রচেষ্টার কথা বলা হয়। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। [মোছাঃ মেহের উননেছা বেগম, খুলনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৮৮২-১৯৪৭ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, (রাজশাহীঃ অপ্রকাশিত পিএইচ ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-২০১০) পৃ. ১৭১]

এরপর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এগিয়ে যেতে থাকে নারী শিক্ষা। টাংগাইলের নারীরাও অন্যান্য অঞ্চলের নারীদের মত পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে প্রথম দিকে বিত্তশালী ও সচেতন পরিবারের মেয়েরাই লেখাপড়া করার সুযোগ পেত। স্বাধীনাত পূর্ব কালে যে কয়জন নারী ডানা মেলে উড়বার অর্থাৎ লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তারাই পরবর্তী কালে নারী শিক্ষার ব্রতী হয়ে স্বাধীনতার পর নারী শিক্ষার হাল ধরেন।

নিচে এমন কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করা হলো–

ক) বেগম ফজিলাতুন্নেছা জোহা
খ) প্রতিভা মৃৎসুদ্দি
গ) জাহ্নবী চৌধুরানী
ঘ) রাণী দিনমনি চৌধুরানী
ঙ) আকিকুননেছা
চ) কুমুদিনী মিত্র
ছ) ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী প্রমুখ [৫১]

---

[৫১] টাংগাইলের বিখ্যাত ব্যক্তি, বাংলাপেডিয়া।

এইসব মহীয়সী নারীরা সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজেরা শিক্ষার আলোয় নিজেদের আলোকিত করে সেই আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্যান্য নারীদের আলোকিত করতে। উপরের যে নামগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তারা নিজেরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারী শিক্ষার পথকে করেছেন উন্মুক্ত। সালাম জানাই এইসব নারীদের প্রতি।

*** মহিলাদের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ**

প্রথম দিকে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সে সব প্রতিষ্ঠানে শুধু ছেলেরাই পড়তো। সামাজিক কুসংস্কার পরিবারের অনিচ্ছা ও কঠোর পর্দা প্রথার কারণে নারীরা পুরুষের সাথে একই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করতো না। পরবর্তী সময়ে শুধু নারীর শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির কথা চিন্তা করে নারীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। যে ধারাটি বর্তমানেও চলমনা আছে। টাংগাইলের সেইসব নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

*** কুমুদিনী কলেজঃ**

দেশে নারী শিক্ষার বিস্তারে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ১৯৩৩ সালে তাঁর মায়ের নামে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক ছিল পরে ১৯৪৭ মালে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়।
কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কলেজের সকল ব্যয়ভার বহন করে।

বাংলাদেশের জনকল্যানকর সংস্থাগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম ও প্রাচীনতম। ট্রাস্টের নিবন্ধনকৃত নাম "কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড"। শিল্পপতি ও সমাজসেবক শহীদ রণদা প্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ১৯৪৭ সালে তাঁর মায়ের নামে এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করে থাকে। আর পি সাহার মা তার যখন ৭ বছর বয়স তখন বিনা চিকিৎসায় মারা যান। দারিদ্রের কারণে লেখাপড়া না করতে পারলেও তার ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ভাগ্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার মনেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি জনসেবায় কিছু করতে চান।

সে লক্ষেই তিনি তাঁর সকল সংস্থা ১৯৪৭ সালে একটি ট্রাস্টের অধীনে আনেন। উদ্দেশ্য ব্যবসার লভ্যাংশ অসহায় মানুষের সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। তিনি এই ট্রাস্টের নাম দেন "কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড"।

বর্তমানে কলেজটি সরকারি। এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত একটি কলেজ। ১৯৪৪ সালে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়।

১৯৫৯ সালে ময়মনসিংহে মুমিনুন্নেচ্ছা কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে এটি পাকিস্তানের একমাত্র মহিলা কলেজ ছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী, অনার্স মাস্টার্স সকল পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এ কলেজে আছে। মোট ২৩,০০০ ছাত্রী পড়ালেখা করে এ কলেজে।

টাংগাইলের "নারী শিক্ষার বাতিঘর" হিসেবে কাজ করছে কলেজটি।

*** ভারতেশ্বরী হোমস**

ভারতেশ্বরী হোমস মেয়েদের একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতেশ্বরী হোমস ঢাকা নগরী থেকে ৬৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং টাংগাইল জেলা সদর থেকে ৩০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে মির্জাপুর থানা সদরে অবস্থিত। নারীকে আপন ভাগ্য জয়ের অধিকার প্রদানের লক্ষ্যেই দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রপিতামতী ভারতেশ্বরী দেবীর নামে ভারতেশ্বরী হোমস প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েদের চরিত্রবান, সৎ ও আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা জাগ্রত করা। সংস্থাটি পারস্পরিক সহনশীলতা ও ত্যাদের মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরী করে সুস্থ সমাজ গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বণদা প্রসাদ সাহা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাই জাতির উন্নতির সোপান। যে সমাজের নারীরা অগ্রগামী নয় ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সে সমাজ কখনোই বিকশিত হতে পারে না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতেশ্বরী হোমস এ শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও শরীরচর্চা একটি অপরিহার্য বিষয়।

ভারতেশ্বরী হোমস বাংলাদেশের প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৬২ সাল থেকে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা খোলা হয়। ১৯৭৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং ১৯৮৩ সালে তা পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রীরা প্রতি সপ্তাহে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহন করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার শিক্ষাদান ছাড়াও আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব এবং আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা। ১৯৯৭ সালে ভারতেশ্বরী হোমস এ দেশের সর্ববৃহৎ শিশু কিশোর ও তরুণদের সংগঠন হিসেবে গার্ল-হন-স্কাউট প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫২]

*** বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়টিকে দ্বিমুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং এখানে বিজ্ঞান মানবিক শখায় শিক্ষা দেয়া হয়। ১৯৬৭ সালে এ বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি রাজস্ব থেকে ৮৩,৪০০.০০* টাকা ব্যয় করা হয়। বর্তমানে এটি একটি পূর্ণ সরকারি বিদ্যালয়।

*** ধনবাড়ী মহিলা কলেজঃ**

ধনবাড়ীর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর পরিত্যক্ত বাড়িতে নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে এই মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি ধনবাড়ী কলেজ নামে পরিচিত। ধনবাড়ী ও আশেপাশের নারী শিক্ষার তীর্থে পরিণত হয়েছে কলেজটি।

*** রাধারানী উচ্চ বিদ্যালয় গোপালপুরঃ**

গোপালপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাধারানী উচ্চ বিদ্যালয়। নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রতিষ্ঠানটি নারী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

---

[৫২] রণদা প্রসাদ সাহা: শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, ই বার্তা।

*** মেহেরুন্নেছা মহিলা কলেজ, গোপালপুরঃ**

গোপালপুর শহরের উপকণ্ঠে এই শিক্ষা আয়তনটি মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।

*** টাংগাইল কালেক্টরেট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজঃ**

টাংগাইল শহরে নারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে তরান্বিত করতে প্রতিষ্ঠিত হয় টাংগাইল কালেক্টরেট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। প্রথম থেকেই নারী শিক্ষায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে প্রতিষ্ঠানটি। পরবর্তীতে স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করা হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে কলেজটি অনন্য।

*** মধুপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ**

টাংগাইলের মধুপুর গড় অঞ্চলে নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর 'অমূল্য বাবু' নামক একজন ব্যক্তি মধুপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ ও কারিগরি বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে বিদ্যালয়টিতে।[৫৩]

*** কালামাঝি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মধুপুরঃ**

এধুপুর শহরের অদূরে কালামাঝি গ্রামে টাংগাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি। ৮০'র দশকে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় গ্রামে শিক্ষার দ্বীপ জ্বেলেছে।

*** পাকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঘাটাইলঃ**

ঘাটাইল থেকে ৬ কি. মি. দূরে পাকুটিয়া বাজার এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকুটিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বেশ নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটি। শুধু যে পাকুটিয়ার মেয়েরাই এই স্কুলে পড়ে তা নয়। অনেক দুর দুরান্ত থেকে মানুষ এখানে পড়তে আসে। এই গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়েই স্বাবলম্বী হয়েছে অনেক নারী।[৫৪]

---

[৫৩] মধুপুর বার্তা।

[৫৪] হাবিবা খাতুন, ১৬, জাগিরাচালা, মধুপুর, টাংগাইল।

৫.৭ মাদ্‌রাসা শিক্ষাঃ

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ধর্মকে এদেশের মানুষ সংস্কৃতি ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। ধর্মীয় শিক্ষা এদেশের মানুষের প্রথম পছন্দ। ছোট বেলায় বাচ্চারা মক্তবে হুজুরের কাছে আরবি শিখে লেখা পড়ার হাতে খড়ি ঘটায়। এছাড়া বাংলা প্রদেশে কলকাতা মাদ্‌রাসাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্‌রাসা মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রথম শিক্ষালয়। অর্থাৎ শুরু থেকেই মাদ্‌রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এর রেশ ধরে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে। ১৯৭২ সালের পরও মাদ্‌রাসা ব্যাপক হারে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সারাদেশে অনেক মাদ্‌রাসা রয়েছে যেগুলো ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত–

ক) আলিয়া মাদ্‌রাসা

খ) কওমী মাদ্‌রাসা।[৫৫]

ক) আলিয়া মাদ্‌রাসাঃ

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয়। মাদ্‌রাসাগুলো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং এই মাদ্‌রাসার ভবন নির্মাণ ও শিক্ষকদের বেতন (এমপিও) সরকার দিয়ে থাকে। এই মাদ্‌রাসা যেসব ডিগ্রী দেওয়া হয়–

ক) ইবতেদায়ী (পিএসসি)

খ) জুনিয়র দাখিল (জেএসসি)

গ) দাখিল (এসএসসি)

ঘ) আলিম (এইচএসসি)

ঙ) ফাজিল (অনার্স)

---

[৫৫] ফরিদী, আঃ হক, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা-৮৪, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৮৪।

চ) কামিল (মাস্টার্স)[৫৬]

এইসব মাদ্‌রাসা থেকে লাখো শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহন করছে।

*** খ্যাত নামা আলিয়া মাদরাসাঃ**

পুরো টাংগাইল জুড়ে অনেক খ্যাতনামা এবং প্রাচীন মাদ্‌রাসা আছে। যেগুলো যুগ যুগ ধরে টাংগাইলের মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষা দানের পাশাপাশি যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। নিচে এমন বিখ্যাত কতগুলো মাদ্‌রাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

*** করটিয়া রোকেয়া ফাজিল মাদ্‌রাসাঃ**

টাংগাইল জেলার সদর উপজেলার ৪নং করটিয়া ইউনিয়ন সদরে করটিয়া মৌজায় স্থানীয় জমিদার দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া) ১৯২৫ সালে রোকেয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৭]

*** মধুপুর আদর্শ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসাঃ**

স্বাধীনতার পর ধর্মীয় শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে এবং সাথে সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেরকম শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মধুপুরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় মধুপুর আদর্শ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা। ইফতেদায়ী হতে ডিগ্রী অর্থাৎ ফাজিল শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুব্যবস্থা আছে মাদ্‌রাসাটিতে। শুধু মধুপুরের শিক্ষার্থীরা নয়, সাথে সাথে বাইরের জেলা, উপজেলা থেকেও এখানে অনেকে পড়তে আসে। উত্তর টাংগাইলের প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা হলো এটি।[৫৮]

*** জটাবাড়ী ফাজিল মাদ্‌রাসাঃ**

১৯৬৮ সালে মধুপুর উপজেলার অদূরে জটাবাড়ী নামক গ্রামে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে একটি মাদ্‌রাসা। এই মাদরাসায় ১ম শ্রেণি অর্থাৎ ইবতেদায়ী শ্রেণি থেকে ফাজিল (ডিগ্রী) শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। খোলা মাঠ, পুকুর ও সুবিশাল বাগান ঘেরা এই মাদ্‌রাসা দেখতে যেমন মনোহর ঠিক তেমনি এর লেখাপড়ার মান। শুধু স্থানীয় শিক্ষার্থীরাই নয় বাইরের প্রচুর মানুষ এখানে লেখাপড়া করে।[৫৯]

---

[৫৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

[৫৭] টাংগাইলের মাদ্‌রাসা শিক্ষা, E Barta।

[৫৮] মধুপুর বার্তা (অনলাইন সংবাদপত্র, ২৪.৩.২০১৯)

[৫৯] আ: রশিদ, ২৫, জটাবাড়ী, মধুপুর, টাংগাইল।

*** গোপালপুর মাদ্‌রাসাঃ**

উত্তর টাংগাইলের সবচেয়ে ঐহিত্যবাহী, প্রাচীন এবং নামকরা মাদ্‌রাসা গোপালপুর দারুল উলুম কামিল (স্নাতক) মাদ্‌রাসা গোপালপুর গরুর হাটের পাশে এই মাদরাসা অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব কাল থেকে জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহু জ্ঞানী-গুণি ব্যক্তি এই মাদরাসায় পড়ালেখা করেছেন।[৬০]

*** গাংগাইর মাদ্‌রাসাঃ**

টাংগাইলের আরেকটি মাদ্‌রাসা হলো গাংগাইর দাখিল মাদরাসা। এটি মধুপুর উপকণ্ঠে অবস্থিত। প্রতিবছর ভাল ফলাফল করার দিক দিয়ে খ্যাতি আছে এই মাদ্‌রাসার।[৬১]

*** বীর বাসিন্দা ভোজ দত্ত দাখিল মাদ্‌রাসাঃ**

কালিহাতি উপজেলার বিখ্যাত একটি মাদ্‌রাসা হলো বীর বাসিন্দা ভোজদত্ত দাখিল (এস এস সি) মাদ্‌রাসা। কালিহাতির অন্যতম মাদ্‌রাসা এটি।

*** দেওপুর চকপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসাঃ**

দেওপুর চকপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা মাদ্‌রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য।

*** নাগরপুর থানা কেন্দ্রিয় ইসলামিয়া আলীম মাদ্‌রাসাঃ**

নাগরপুর থানার বিখ্যাত মাদরাসা কেন্দ্রিয় ইসলামিয়া আলিম (এইস এস সি) মাদ্‌রাসা।

*** সয়া দাখিল মাদরাসাঃ**

ধনবাড়ী উপজেলা থেকে অল্প দুরত্বে অবস্থিত সয়া দাখিল মাদ্‌রাসা। এটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা মাদরাসা। এটি এসএসসি সমপর্যায়ে মাদরাসা যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে জ্ঞান বিলিয়ে যাচ্ছে।[৬২]

---

[৬০] সাইফুল ইসলাম, ৩৩, গাংগাইর, মধুপুর, টাংগাইল।

[৬১] প্রাগুক্ত, ঐ।

[৬২] শরীফ হোসেন, ৩২ সয়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল।

*** আউলিয়াবাদ বাজার দাখিল মাদ্‌রাসাঃ**

সখিপুর উপজেলায় অবস্থিত আউলিয়াবাদ বাজার দাখিল (এসএসসি) মাদ্‌রাসা। মাদরাসা শিক্ষা প্রসারে এ মাদ্‌রাসার অবদান অনেক।

*** লোকের পাড়া ও এস ফাজিল মাদরাসাঃ**

লোকের পাড়া ও এস ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসাটি একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

*** পোড়াবাড়ী মাদ্‌রাসাঃ**

ঘাটাইলের পোড়াবাড়ি নামক স্থানে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন ও নামকরা মাদ্‌রাসা হলো পোড়াবাড়ী মাদ্‌রাসা। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে পাঠ গ্রহন করেছেন।[৬৩]

*** টাংগাইল কওমী মাদরাসাঃ**

কওম বা সমাজ কর্তৃক পরিচালিত মাদ্‌রাসাকে কওমী মাদ্‌রাসা বলে। বাংলাদেশের কওমী মাদ্‌রাসার মূল অনুপ্রেরণা আসে ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌রাসা থেকে। এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন শিক্ষক মন্ডলী। এই মাদ্‌রাসাসমূহ সম্পূর্ণ বেসরকারি।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, বার্মাসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্‌রাসা বিদ্যমান আছে।[৬৪]

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতুবি (র:) (১৮৩২-১৮৮০) এর নেতৃত্বে উত্তর ভারতের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে ১৮৬৬ সালের ৩০ মে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৫]

চট্রগ্রামের দারুল উলুম হাটহাজারী ঢাকার লালবাগ মাদ্‌রাসা বাংলাদেশের বিখ্যাত কওমী মাদ্‌রাসা।[৬৬]

---

[৬৩] নুরুল ইসলাম, ৩০, পোড়াবাড়ী, ঘাটাইল, টাংগাইল ।

[৬৪] ফরিদী, আবদুল হক, মাদরাসা শিক্ষায় বাংলাদেশ, পৃ. ১৬৪।

[৬৫] তানযীমুল মাদারিসিন আল কাওমিয়া বাংলাদেশ, এর নথিপত্র তালিকা থেকে সংগৃহীত।

*** টাংগাইলের খ্যাতনামা কওমী মাদ্‌রাসাঃ**

সমগ্র টাংগাইল জুড়েই আছে অসংখ্য কওমী মাদ্‌রাসা। যেখানে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও মানবিক মুল্যবোধ শিখছে। নিচে টাংগাইলের বিখ্যাত কওমী মাদ্‌রাসা সমূহের একটি তালিকা প্রদান করা হলো–[৬৭]

* জামিয়া নিজামিয়া দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামাবাদ বানূরগাছী মাদ্‌রাসা, মধুপুর।

* জামিয়া নিজামিয়া সিদ্দীকীয়া বরুরিয়া মাদ্‌রাসা, গোপালপুর।

* গোলাবাড়ী মহিলা মাদ্‌রাসা, মধুপুর।

* খাদিজাতুল কোবরা মহিলা মাদ্‌রাসা, টুনিয়াবাড়ী, মধুপুর।

* রাবেয়া বসরী (র) মহিলা মাদ্‌রাসা, টাংগাইল।

* মধুপুর হাটখোলা মাদ্‌রাসা, মধুপুর।

* জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ মাদরাসা, সদর, টাংগাইল।

* জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম ও এতিমখানা, টাংগাইল।

* জামিয়া এমদাদিয়া আরাবিয়া, ধনবাড়ী।

* জামিয়া ইবনে আবক্ষাস (রা) গোড়াকী, মির্জাপুর।

* পাছজোয়াইর জামিয়া খাতামুন নাবীয়্যীন মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা, কালিহাতী।

* হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মহিলা মাদ্‌রাসা, দেওলা, সদর থানা।

* হযরত ফাতেমা (রা) মহিলা কওমী মাদ্‌রাসা, হরিপুর, কালিহাতী।

* জামিয়া আয়েশা (রা) লিল বানাত, গোড়াকী, মির্জাপুর।

* জামিয়া দারুল জান্নাত কওমিয়া মহিলা মাদরাসা, গোলাবাড়ী, মধুপুর।[৬৮]

৫.৮ বিশেষ শিক্ষাঃ

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত-

---

[৬৬] মো: আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইতিহাস ও সমাজ জীবনে ইহার প্রভাব, পৃ. ৩৭১।

[৬৭] বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

[৬৮] www.Tangail.Com।

১. তাত্ত্বিক শিক্ষা

২. ব্যবহারিক শিক্ষা

ব্যবহারিক শিক্ষা মূলত কোন বিষয়ে বা প্রযুক্তির উপর হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা। অর্থাৎ হাতে-কলমে যে শিক্ষা কোন বিশেষ দিকে মানুষকে পারদর্শী করে তোলে। ঐ শিক্ষাকেই ব্যবহারিক শিক্ষা বা বিশেষ শিক্ষা বলে। এই বিশেষ শিক্ষার জন্য আছে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পারদর্শী শিক্ষক। টাংগাইলেও আছে এমন বিশেষ শিক্ষা লাভের কতগুলো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। নিচে আলোচনা করা হল–

*** মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও পযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়টি সন্তোষ জমিদার বাড়িতে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সন্তোষের জমিদারগণ দেশ ত্যাগ করেন। মাওলানা ভাসানী এই পরিত্যক্ত বাড়িতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। সন্তোষের সেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েলর পরিত্যক্ত জায়গায় মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৬৯]

বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯৯ সালে টাংগাইলের সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত হয়। নামকরণ করা হয় বাংলার কিংবদন্তি রাজনৈতিক নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে। মোট ৫৭ একর জমির উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত।

মোট ৫টি অনুষদের অধীনে ১৫টি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।[৭০]

সুন্দর, মনোরম ও ছাত্র রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা লাভ করতে আসে।

---

[৬৯] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৬৭।

[৭০] E barta.com, টাংগাইলের শিক্ষা (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

*** কুমুদিনী মহিলা মেডিকেল কলেজঃ**

প্রতিষ্ঠাতা রণদা প্রসাদ সাহার পৌত্র রাজীব সাহা। মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল সংলগ্ন অংশে প্রতিষ্ঠা করা হয় কুমুদিনী মহিলা মেডিকেল কলেজ। বাংলাদেশে এটাই একমাত্র মহিলাদের সংরক্ষিত মহিলা মেডিকেল কলেজ। রণদা প্রসাদ সাহার ইচ্ছা ছিল কুমুদিনী হাসপাতাল সংলগ্ন অংশে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা। রাজীব সাহা রণদা প্রসাদ সাহার সেই অভিলাস পূরণ করেছেন।[৭১]

*** টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজঃ**

টাংগাইল মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের টাংগাইল জেলায় অবস্থিত চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা দানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। সরাসরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়; যা বর্তমানে দেশের একটি অন্যতম প্রধান চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ১ বছর মেয়াদী হাতে-কলমে শিখনসহ (Internship) স্নাতক পর্যায়ের ৫ বছর মেয়াদি এম.বি.বি.এস. শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে; যাতে প্রতিবছর ৬৫ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়ে থাকে।[৭২]

*** বঙ্গবন্ধু টেক্সাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজঃ**

বঙ্গবন্ধু টেক্সাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একটি টেক্সাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যা বাংলাদেশের টাংগাইল জেলার কালিহাতিতে অবস্থিত। প্রশাসনিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কলেজ ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। [৭৩]

*** টাংগাইল পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটঃ**

---

[৭১] নারী শিক্ষা, টাংগাইল প্রতিদিন ১৭/০৮/১২।

[৭২] টাংগাইল প্রতিদিন (অনলাইন সংবাদপত্র, ২৩.৪.২০১৯)

[৭৩] নারী শিক্ষা, টাংগাইল প্রতিদিন ১৭/০৮/১২।

টাংগাইল পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট বাংলাদেশের টাংগাইল জেলার একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৯১ সালে স্থাপিত হয়। এই নীতিবাক্য ধারন করে তরুণদের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এটি একটি সরকারি পলিটেকনিক ইন্সিটিটিউট। এর সংক্ষিপ্ত নাম টিপিআই। এটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে অধিভুক্তি। এটি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বর্ষে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস শুরু হয় ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে পরবর্তীতে এখানে আরো ৪টি কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে মোট ৫টি টেকনোলজি নিয়ে চলছে টাংগাইল পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট। [৭৪]

উক্ত প্রতিষ্ঠানটি টাংগাইল এর নতুন বাসস্ট্যান্ড নামক জায়গা থেকে উত্তরে হেঁটে ৫ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত।

*** বিভাগসমূহ-**

* ইলেকট্রিক্যাল

* ইলেকট্রনিক্স

* কম্পিউটার

* টেলিকমিউনিকেশন

* কন্সট্রাকশন

* মেকানিক্যাল।

টাংগাইল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর ছাত্রদের জন্য ১টি এবং ছাত্রীদের জন্য ১টি আবাসিক ছাত্রাবাস রয়েছে। [৭৫]

*** ট্রমা নার্সিং ইনস্টিটিউট**

২০০৭ সালে ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রের ট্রমা মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এর অগ্রযাত্রা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধীনে ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষ হতে মাত্র ১৫ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির আত্মপ্রকাশ। এই স্বপ্নযাত্রার দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার সহযোগী হিসেবে পান একদল মেধাবী, দক্ষ ও অসম্ভব পরিশ্রমী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষকমণ্ডলী। কলেজটিতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা বিকাশ ও নৈতিক শিক্ষা

---

[৭৪] ঐ

[৭৫] জাতীয় তথ্য বাতায়ন, টাংগাইল জেলার স্বাস্থ্য সেবা, www.Tangail.com

লাভের সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে এ ধরনের প্রত্যয় নিয়েই কলেজটির যাত্রা শুরু হয়েছে। সব সময় রাজনীতি, ধুমপান ও সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশ বিরাজ করে। এ দীর্ঘ যাত্রা পথে সংযোজিত হয়েছে আরো ৭টি প্রতিষ্ঠান। সর্বোপরি ট্রমা সেন্টার মেডিকেল ইনিস্টিটিউট এর আওতায় রয়েছে (১) ট্রমা ইনিস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, (২) ট্রমা মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, (৩) শ্যামলী মেডিকেল ট্রেনিং স্কুল, (৪) টাংগাইল মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং, (৫) ঘাটাইল মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল। দেশে বর্তমানে দক্ষ, আদর্শবান মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ও টেকনোলজিষ্ট এর প্রয়োজন প্রকট। সঠিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত কল্পে উল্লেখিত দক্ষ জনবল তৈরীর দৃঢ় প্রত্যয় প্রতি বছর আমাদের পাঁচটি শাখা থেকে বের হচ্ছে দক্ষ মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ও টেকনোলজিষ্ট।[৭৬]

*** টাংগাইল নার্সিং ইন্সস্টিটিউট:**

টাংগাইলের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের পাশেই অবস্থিত টাংগাইল নাসিং ইন্সস্টিটিউট। ১৯৮৯ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর ৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় যাদের আদর্শ নার্স হয়ে উঠার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অন্যদিকে ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় যাদের ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হয়। টাংগাইলের প্রসূতি ও শিশু সেবায় এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অনেক।[৭৭]

*** মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট:**

টাংগাইল নার্সিং কলেজের পাশেই এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। এখানে স্বাস্থ্য সহকারীদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়। এখান থেকে ল্যাব ও অপারেশন থিয়েটার এর যোগ্য সহকারী তৈরি হয়। বাংলাদেশে এই পেশায় দক্ষ লোকের অভাব পূরণে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর।[৭৮]

*** বেসরকারি ম্যাটস:**

---

[৭৬] শিলা আহমেদ, ২২, পচিশা, মধুপুর, টাংগাইল।

[৭৭] প্রাগুক্ত, ঐ।

[৭৮] পূর্বোক্ত, ঐ।

সরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট এর পাশাপাশি টাংগাইলে গড়ে উঠেছে আরও ৪টি ম্যাটস। এগুলো এই বিশেষ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ অবদান রাখতে সচেষ্ট হচ্ছে।

ক) প্রফেসর সোহরাব উদ্দিন ম্যাটস্
খ) সুপ্রিম ম্যাটস্
গ) শাহজালাল ম্যাটস্
ঘ) ঘাটাইল ম্যাটস্।[৭৯]

*** পিটিআই, টাংগাইলঃ**

প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট – যা সংক্ষেপে পি টি আই। ১৯৫৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য এই ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। টাংগাইল জেলা শহরে অবস্থিত এই বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ নির্ভর প্রতিষ্ঠানটি জেলার প্রায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে। যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের পক্ষে কার্যকরী।[৮০]

*** যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ**

যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভিন্ন মেয়াদে বেকার যুবকদের বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এবং প্রশিক্ষণ শেষে দীর্ঘ মেয়াদে স্বল্প ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। লক্ষ্য বেকারকে কার্যকর মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টাংগাইল কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে টাংগাইলের চেহারা।[৮১]

*** মধুপুর কারিগরি মহাবিদ্যালয়ঃ**

মধুপুর উপজেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান বিতরণ করতে মধুপুরের অনতিদূরে রানিয়াদ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় রানিয়াদ বি এম কলেজ। তবে কলেজটির মূল নাম ফকির মাহবুব আনাম স্বপন কারিগরি মহাবিদ্যালয়।

---

[৭৯] ঐ।

[৮০] মো: আ: ছোবহান, ৫২,পচিশ, মধুপুর, টাংগাইল।

[৮১] নুরে-আলম, ২৫, মধুপুর, টাংগাইল।

কারিগরির মাধ্যমে পড়ালেখা শেখানো হয় এই প্রতিষ্ঠানে। এটি অত্যন্ত খ্যাতনামা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

*** মহেরা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারঃ**

১৮৯০ সালে স্পেনের কর্ডোভা নগরীর আদলে গড়ে তোলা হয় মহেরা জমিদার বাড়ি। ১৯৭২ সালে এই দৃষ্টিনন্দন বাড়িটিকে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৯০ সালে এটিকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে উন্নীত করা হয়।[৮২]

এখানে পুলিশকে বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অন্যতম পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এটি।

৫.৯ শিক্ষাবিদ ও কবি সাহিত্যিকদের পরিচিতিঃ

কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা নিজেরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে পরবর্তীতে অন্যদের শিক্ষা গ্রহনের জন্য হয়েছেন অনুপ্রেরণা। এই সকল নির্লোভ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় টাংগাইল আজ আলোকিত। কিছু কিছু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য লেখনীকে বেছে নিয়েছেন। যাদের ক্ষুরধার লেখনি এ অঞ্চলের তরুণ শিক্ষার্থীদের দিয়েছে অনুপ্রেরণা এবং প্রকৃত মুক্তির পথ। টাংগাইলবাসী ধন্য এই সব শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি।

নিচে প্রখ্যাত কিছু শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদান তুলে ধরা হলো-

*** সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)**

সৈয়দ নওয়াব আলী টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার ধনবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টাংগাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অন্যতম। সৈয়দ নওয়াব আলী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯০৬ থেকে ১৯১১

[৮২] ঐতিহাসিক মহেরা জমিদার বাড়ি, Banglanews 24.com।

সাল পর্যন্ত। বাংলা প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক সদস্য ছিলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। ভারতীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রথম রিফরম্ড কাউন্সিলের মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত। তিনি বঙ্গিয় কৃষি ও শিল্প বিভাগের দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং আমৃত্যু সে পদে বহাল থাকেন।

সৈয়দ নওয়াব আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০৫ সালে 'খান বাহাদুর' ১৯১১ সালে 'নবাব', ১৯১৮ সালে 'সি.আই.ই এবং ১৯২৪ সালে 'নবাব বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন।[৮৩]

*** রনদা প্রসাদ সাহা (১৮৬৯-১৯৭১)**

রনদা প্রসাদ সাহা সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও দানবীর ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে আহতদের সেবা শুশ্রূষা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে। ১৯১৬ সালে কমিশন র‍্যাংক দেওয়া হয়। পরে রনদা প্রসাদ সাহা লবণের ব্যবসা করে দুটি জাহাজ ও বহু বার্জের মালিক হয়েছিলেন। তিনি প্রপিতামহী ভারতেরশ্বরী দেবীর নামে মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস, মায়ের নামে মির্জাপুরে কুমুদিনি হাসপাতাল, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী মহিলা কলেজ এবং পিতার নামে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দানশীলতায় সন্তষ্ট হয়ে তৎকালিন ইংরেজ সরকার তাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। রনদা প্রসাদসাহা ১৯৭১ সালের ৭ই মে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৪]

---

[৮৩] আঃ রহিম, টাংগাইলের ইতিহাস, পৃ. ১৮৪।
[৮৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৬৮।

*** প্রিন্সিপাল বেগম ফজিলাতুন্নেছা (১৮৯৯-১৯৭৭)**

বেগম ফজিলাতুন্নেছা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে ১৯২৭ সালে প্রথম হয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট। এবং উপমহাদেশের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত থেকে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। কলকাতার বেথুন কলেজে বেগম ফজিলাতুন্নেছা অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৮৫]

*** মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৫)**

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা, মহান সংগঠক, জাতীয় মুক্তির পথ প্রদর্শক, ধর্মীয় কণ্ঠস্বর। ১৮৯৩ সালে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন। ১৮৯৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পীর সৈয়দ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর সাথে আসাম পৌঁছেন। ঐখানেই তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ১৯০৮ সালে তিনি আসামের কুখ্যাত 'লাইন প্রথার' বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। হজব্রত পালন করার পর তিনি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে দশ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ি জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসানচরে কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। তখন তার অনলবর্ষী ভাষণের জন্য ভাসানী নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে আসামের আন্দোলনের কারণে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে কারারুদ্ধ হন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি মজলুম মানুষের সাথে সহমর্মিতার কারণে কারাবরণ করেছেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে ঐতিহাসিক সম্মেলন করেন এবং এই সম্মেলনে তিনি স্বাধীনতার কথা প্রচ্ছন্নভাবে উচ্চারণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'হক কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মওলানা

---

[৮৫] ঐ, পৃ. ৬৯।

ভাসানী কাগমারিতে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে ‘মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। আসামের ধুবড়ি শহরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবিতে প্রতিষ্ঠা করেন মহিপুর হাজি মহসীন সরকারি কলেজ। এই রাজনৈতিক ব্যক্তি ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর বুধবার দিবাগত রাত ৮ টায় মৃত্যুবরণ করেন।[৮৬]

*** আবদুল হামিদ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৬৮)**

জমিদার, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী আইন পরিষদের স্পিকার ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভারত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ আমলে তিনি বাংলা প্রদেশ থেকে নিখিল ভারত শ্রম উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়াও প্রজাবৎসল জমিদার হিসেবে এলাকার তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি ১৯৫৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

*** আব্দুল করীম গজনবী (১৮৭২-১৯৩৯)**

দেলদুয়ারের খ্যাতিমান জমিদার। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা আফগানিস্থানের গজনী থেকে এসেছিলেন বলে জানা যায় এবং এ কারণে তারা গজনীন ও পরবর্তীতে গজনবী নামে পরিচিত হন। তিনি রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও লেখক ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালিতে। আবদুল করিম গজনবী ছিলেন সরকারিপন্থী রাজনীতিক। আবদুল করিম গজনবী ব্রিটিশ আমলে জাতীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রি ছিলেন, ১৯২৪ সালে বাংলা সরকারের কৃষি, বন ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রি হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ‘নওয়াব

[৮৬] সৈয়দ আবুল মকসুদ, ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ৬৮।

বাহাদুর' উপাধি পান। তিনি খেতাবেও ভূষিত হন। আবদুল করিম গজনবী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।[৮৭]

*** আবদুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩)**

আবদুল হালিম গজনবী ছিলেন আবদুল করিম গজনবীর ছোট ভাই। তিনি একজন হিতৈষী জমিদার এবং রাজনীতিকবিদ ছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসহ কলিকাতা সিটি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন।

আবদুল হালিম গজনবী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না বলে রাজনৈতিভাবে দুই ভাই দুই মেরুতে অবস্থান করেছেন। তাই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর ফুলার আবদুল করিম গজনবীকে "রাইট গজনবী" এবং আবদুল হালিম গজনবীকে "রং গজনবী" বলে আখ্যায়িত করেন। ব্রিটিশ আমলে ১৯২৬ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি 'স্যার' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। [৮৮]

*** ড. আলীম আল রাজী (১৯২৫-১৯৮৫ খ্রি.)**

টাংগাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা লাউহাটি গ্রামে ড. আলীম আল রাজীব জন্ম। আলীম আল রাজী আইনজীবি, সুপণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ইতিহাস ও আইন শাস্ত্রে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আলীম আল রাজী 'বার এ্যাট-ল' ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৩ সালে ঢাকা হাইকোর্ট আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে দেশে প্রথম আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তৎকালীন লিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) কলেজ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। আলীম আল রাজী সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মেম্বার ছিলেন। তিনি ঢাকা 'ল' কলেজ ও নগরপুর

---

[৮৭] টাংগাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তি, টি নিউজ ডট কম।

[৮৮] আলম, জাফর, স্মরণীয়-বরনীয়, পৃ. ৬৯।

ডিগ্রি কলেজ এবং লাউহাটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান করেন। আরাকানের পথে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইত্যাদি।[৮৯]

*** আবদুস সাত্তার (১৯২৮-)**

আবদুস সাত্তার ১৯২৮ সালে কালিহাতি উপজেলার গোলরায় জন্মগ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সম্পাদক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার দক্ষ। তিনি বহুদেশে ভ্রমণ করেছেন। প্রায় একশত গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বিশেষ করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বইগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন: আরন্য সংস্কৃতি, ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি।

*** আবদুল মান্নান (১৯২৯-২০০৫)**

আবদুল মান্নান দেশের নন্দিত রাজনীতিবিদ। স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ যাদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান রয়েছে আবদুল মান্নান তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৯২৯ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার যমুনা ও ধরেশ্বরী বিধৌত চরাঞ্চলের কাতুলী ইউনিয়নের গালুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে টাংগাইলের মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং পরবর্তীতে টাংগাইলের জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে আব্দুল মান্নান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু এবং কারারুদ্ধ কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভের পর আনুষ্ঠানিক পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহূত গোল টেবিল বৈঠকের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে টাংগাইল থেকে বিপুল ভোটে ‘এম এন এ’ নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় স্বাধীন

[৮৯] কামাল, মাহমুদ, টাংগাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী, পৃ. ৩৭।

বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি এবং পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেন। জননেতা আবদুল মান্নান মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল প্রবাসী সরকারের মন্ত্রি পরিষদের বৈঠকে আবদুল মান্নানকে মন্ত্রির পদমর্যাদায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সফলভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের একমাত্র মুখপাত্র জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে পুনরায় টাংগাইল সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৬ সালে তৃতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং একাধিকবার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা, তা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক সর্বোপরি দেশবাসীর কখনও ভোলার নয়।

তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত সাহসী ও নিয়ামক ভূমিকা পালন করতেন। রাজনৈতিক কলাকৌশল নির্ধারনে ও সংলাপে তার বিচক্ষণতা ছিল ঈর্ষণীয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় যুগপৎ আন্দোলনের লিঁয়াজো কমিটি সভার সভাপতিত্ব করেছেন তিনি। ৯০-এ স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। তিনি বাংলাদেশ ইনকামট্যাক্স ল'ইয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। একজন আদর্শ শিক্ষানুরাগী হিসেবে জননেতা আবদুল মান্নান বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। টাংগাইলের সন্তোষে অবস্থিত মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম। নারী শিক্ষার প্রতি জননেতা আবদুল মান্নানের ছিল বিশেষ আগ্রহ। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি টাংগাইলের প্রাণকেন্দ্র শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয় ও টাংগাইলের

দেলদুয়ার উপজেলার আতিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এছাড়া সিলিমপুরে পাকুল্লা হাই স্কুল চরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠা করেন। কাতুলী হাই স্কুল। স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন টাঙ্গাইল জেনারেলর হাসপাতাল। মির্জাপুরের মহেজ জমিদার বাড়িতে হাসপাতাল। মির্জাপুরের বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলেন টাংগাইল মাহফিল, যা বর্তমানে টাংগাইল জেলা সমিতি ঢাকা নামে পরিচিত। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০০৫ সালে ৪ঠা এপ্রিল ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৯০]

*** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (১৮৭১-১৯৩৬)**

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন করটিয়ার জমিদার। তিনি আটিয়ার চাঁদ বা চাঁদ মিয়া নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ওয়াজেদ আলি খান পন্নী ১৯২৬ সালে তার দাদা সা'দত আলি খান পন্নীর নামে করটিয়ার সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনামলে স্বরাজ এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ব্রিটিশ বিরোধ আন্দোলনের যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। আন্দোলন তাঁর অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়তার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর তেল চিত্রের নিচে লেখা আছে।– æOne who defeated the British". করটিয়াতে তিনি হাফেজ মাহামুদ আলী ইনিস্টিটিউশন এবং রোকেয়া হাই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্বে ওয়াজেদ আলি খান পন্নী তাঁর সমস্ত জমিদারি সমাজের হিতার্থে দান করেন।[৯১]

*** প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)**

প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহিম খাঁ ১৮৯৪ সালে বিরামদি ভূয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি করটিয়ার সা'দত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

---

[৯০] মাহমুদ, কামাল, টাংগাইলের বারো মনীষী, পৃ. ১২১।

[৯১] ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, E barta

প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি করটিয়া সাদ'ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপার ছিলেন। তিনি ১৯২৬-১৯৪৭ পর্যন্ত টানা উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার তিনিই একমাত্র মুসলিম প্রিন্সিপাল। এজন্য তিনি "প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ" নামেই পরিচিতি।[৯২]

তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ভূঞাপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইবরাহীম খাঁ কলেজ, ও মীরপুর বাঙলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৬৩ এবং একুশে পদক ১৯৭৭ লাভ করেন।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো–

বাতায়ন, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, জঙ্গী জীবন, হিরক হার, ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র ইত্যাদি।[৯৩]

*** ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)**

ড. আশরাফ সিদ্দিকী ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ কালিহাতি উপজেলার নাগবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোকবিজ্ঞানী। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে ফোকলোরের আধুনিক পঠন-পাঠন ও গবেষণার ধারা তিনিই সুচনা করেন। কর্ম জীবনে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা, বাংলা উন্নয়নের পরিচালক, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেস ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

---

[৯২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

[৯৩] সাহিত্যে টাংগাইল, পৃ. ৩৭।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন যে সব সাহিত্যিক আশরাফ সিদ্দিকী তাঁদের একজন। তিনি ৫০০ এর অধিক কবিতা রচনা করেছেন। গভীর গবেষণা করেছেন বাংলার লোক ঐতিহ্য নিয়ে। তিনি একাধারে ছোট গল্পকার, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, লোক সাহিত্যিক এবং শিশু সাহিত্যিক তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০)

সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩)

বিষকন্যা (১৯৫৫)

বৃক্ষ দাও, ছায়া নাও (১৯৮৪)

দাড়াও পথিক বর (১৯৯০)

সহস্র মুখের ভিড়ে (১৯৯৭)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ–

রাবেয়া আপা (১৯৬৫)

গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১)

শেষ নালিশ (১৯৯২)

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

লোক সাহিত্যের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো–

লোক সাহিত্য প্রথম খণ্ড (১৯৬৩)

রবীন্দ্র নাথের শান্তি নিকেতন (১৯৭৪)

কিবদন্তির বাংলা (১৯৭৫)

শুভ নববর্ষ (১৯৭৭)

লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮)

আবহমান বাংলা (১৯৮৭)

বাংলার মুখ (১৯৯৯)

বাংলাদেশের রূপকথা (১৯৯১)

লোক সাহিত্য ২য় খণ্ড।

শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদান–

রূপকথার রাজ্যে

বাণিজ্যতে যাবো আমি

অসি বাজে ঝনঝন

ছড়ার মেলা

আমার দেশের রুপ কাহিনী

হিংহের মামা ভোম্বল দাস।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলো হলো-

শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০)

আরশীনগর (১৯৮৮)

গুনীন (১৯৮৯)[৯৪]

বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি মোট ৩৬টি পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তাঁর জীবন ও কীর্তি নিয়ে নির্মিত হয়েছে–

'জীবন ও সংস্কৃতির জলছবি' নামক প্রামান্য চিত্র।

বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪)

রিডার্স ডাইজেস্ট পুরস্কার (১৯৬৪)

ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬)

একুশে পদক (১৯৮৮) লাভ করেন।

*** ড. আলীম আল রাজী (১৯২৫-১৯৮৫)**

টাংগাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটি গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি সুপণ্ডিত, লেখক ও আইনজীবী। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ইতিহাস ও আইন শাস্ত্রে

[৯৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৭১।

পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে। তিনি 'বার এ্যাট-ল' করে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দেশে প্রথম আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তান কলেজ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ঢাকা 'ল' কলেজ, নাগপুর ডিগ্রী কলেজ ও লাউহাটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
'আরাকানের পথে' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।[৯৫]

*** আবদুস সাত্তার (১৯২৮-)**

আবদুস সাত্তার ১৯২৮ সালে কালিহাতি উপজেলার গোলরায় জন্মগ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সম্পাদক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার দক্ষ। তিনি বহুদেশে ভ্রমণ করেছেন। প্রায় একশত গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বিশেষ করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বইগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন: আরন্য সংস্কৃতি, ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি।[৯৬]

*** আল মুজাহিদী (১৯৪৩-)**

১লা জানুয়ারি ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন প্রথিতযশা এই কবি। "ষাটের দশকের" কবি হিসেবে পরিচিত আল-মুজাহিদী তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলো হলো–
'পৃথিবীর ধুলো', 'সৌর জোনাকী', 'আল-মুজাহিদীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সন্ধ্যার বৃষ্টি', 'কলের বন্দীতে', 'পাখির পৃথিবী', 'আলবাট্রাস', 'ভঙ্গুর গোলাপগ, 'কাঁদো হিরোশিমা কাঁদো নাগাসাটিক', 'পালকী চলে দুলকী তালে'

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলো হলো–

---

[৯৫] বিখ্যাত ব্যক্তি, টাংগাইল, wikipedia
[৯৬] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭.০৮.২০১৬।

'প্রথম প্রেম', 'চাঁদ ও চিরকুট', 'লাল বাতির হরিণ, 'আলোর পাখিটা', 'রুরোলি রোদ্দুর', 'ছুটির ছুটি', 'খোকার আকাশ', 'খোকার যুদ্ধ' প্রভৃতি।[৯৭]

তাঁর বিখ্যাত ছোট গল্পগুলো হলো–

'প্রপঞ্চের পাখি', 'বাতাবরণ', 'ভরা কটাল মরা কটালের চাঁদ' প্রভৃতি।

শিশু সাহিত্যে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। যেমন-

'হালুম হুলুম', 'তালপাতার সেপাই', 'শেকল কাটে খাচার পাখি', 'সোনার মাটি রুপোর মাটি', 'ইস্টিশনের হুইসেল' প্রভৃতি।

এছাড়াও প্রবন্ধ, গবেষণা গ্রন্থ ও অনুবাদ সাহিত্যে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

*** কুশল ভৌমিক**

আধুনিক বাংলা কবিতাকে টাংগাইলের যে কবি দিয়েছেন নতুন মাত্রা তিনি হলেন কবি কুশল ভৌমিক। আপাদমস্তক একজন খাঁটি কবি হলেন কুশল ভৌমিক। তরুণ এই কবি মূলত প্রেম বিষয়ক কবিতা বেশি লিখেন। মেধা ও মননের বিকাশ ঘটিয়ে তিনি রচনা করে চলেছেন একের পর এক কবিতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই হলো–

'উল্টো হলে কাটছি সাঁতার', 'মৃত্তিকায় ধরে রাখি সবটুকু' হলো অন্যতম।[৯৮]

[৯৭] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)
[৯৮] বাংলাপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশিষ্ট জনের অবদান

সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ার মূল কারিগর হলো মানুষ। সভ্যতায় যা কিছু অবদান তা মনুষ্য সৃষ্টি। পৃথিবী বহু মানুষের আবাস হলেও সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে অবদান রেখেছেন অল্প কিছু মানুষ। ঢাকার উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ টাংগাইল। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির পেছনেও আছে অল্প কিছু মানুষের শ্রম, ত্যাগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ঠিক তেমনি কয়েকজন কৃতি সন্তানের কথা আলোচনা করবো এই পর্বে–

*** ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (১৮৭১-১৯৩৬)**

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন করটিয়ার জমিদার। তিনি আটিয়ার চাঁদ বা চাঁদ মিয়া নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ওয়াজেদ আলি খান পন্নী ১৯২৬ সালে তার দাদা সা'দত আলি খান পন্নীর নামে করটিয়ার সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনামলে স্বরাজ এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ব্রিটিশ বিরোধ আন্দোলনের যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। আন্দোলন তাঁর অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়তার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত তাঁর তেল চিত্রের নিচে লেখা আছে।– æOne who defeated the British''. করটিয়াতে তিনি হাফেজ মাহামুদ আলী ইনিস্টিটিউশন এবং রোকেয়া হাই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্বে ওয়াজেদ আলি খান পন্নী তাঁর সমস্ত জমিদারি সমাজের হিতার্থে দান করেন।[১]

*** মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন (১৮৩২-১৯০৮)**

মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন ১৮৩২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর টাংগাইল সদর উপজেলার সুরুজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের মুর্শিদাবাদ,

[১] কামাল, মাহমুদ, টাংগাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী, পৃ. ১২০।

এলাহাবাদ, জৈনপুর, বিহার, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্থানের দেশ বরেন্য বিখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদের নিকট থেকে ইলমে শরীয়ত ও ইল্‌মে মারেফাত বিদ্যা আয়ত্ব করেন। মৌলভি মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ বাংলায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া বোখারী শরীফ অনুবাদ করে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'আখবারে এছলামিয়া' পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া মৌলভী মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলো – জোব্দাতুল মাসায়েল [১৮৯২], এনসাফ [১৮৯২], এজবাতে আসেরেজ্জোহর [১৮৮৭], ফতোয়ায়ে আলমগীরি [১৮৯২] কালামাতুল কোফর [১৮৯৭]।

*** সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)**

সৈয়দ নওয়াব আলী টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলার ধনবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টাংগাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অন্যতম। সৈয়দ নওয়াব আলী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত। বাংলা প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক সদস্য ছিলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। ভারতীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রথম রিফরম্‌ড কাউন্সিলের মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত। তিনি বঙ্গিয় কৃষি ও শিল্প বিভাগের দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি বেঙ্গল এ্যাকজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং আমৃত্যু সে পদে বহাল থাকেন।[২] সৈয়দ নওয়াব আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক

[২] Banglapedia, সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

১৯০৫ সালে 'খান বাহাদুর' ১৯১১ সালে 'নবাব', ১৯১৮ সালে 'সি.আই.ই এবং ১৯২৪ সালে 'নবাব বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন।[৩]

*** রনদা প্রসাদ সাহা (১৮৬৯-১৯৭১)**

রনদা প্রসাদ সাহা সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী ও দানবীর ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরে' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে আহতদের সেবা শুশ্রূষা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে। ১৯১৬ সালে কমিশন র‍্যাংক দেওয়া হয়। পরে রনদা প্রসাদ সাহা লবণের ব্যবসা করে দুটি জাহাজ ও বহু বার্জের মালিক হয়েছিলেন। তিনি প্রপিতামহী ভারতেরশ্বরী দেবীর নামে মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস, মায়ের নামে মির্জাপুরে কুমুদিনি হাসপাতাল, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী মহিলা কলেজ এবং পিতার নামে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দানশীলতায় সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালিন ইংরেজ সরকার তাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। রনদা প্রসাদসাহা ১৯৭১ সালের ৭ই মে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

*** প্রিন্সিপাল বেগম ফজিলাতুন্নেছা (১৮৯৯-১৯৭৭)**

বেগম ফজিলাতুন্নেছা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে ১৯২৭ সালে প্রথম হয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট। এবং উপমহাদেশের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেত থেকে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। কলকাতার বেথুন কলেজে বেগম ফজিলাতুন্নেছা অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫]

---

[৩] পূর্বোক্ত, ঐ, পৃ. ১২৩।

[৪] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৩৬।

[৫] ঐ, পৃ. ৩৮।

*** হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭)**

হাতেম আলী খান বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কৃষক নেতা ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে এম.এ. পাস করেন। হাতেম আলী খান গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের একত্রিত করে তিনি জমিদারদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি 'ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি বিপ্লবী দলও গঠন করেছিলেন। হাতেম আলী খান সমস্ত জীবন নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি কমরেড মনি সিংহ ও বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মোজাফফর আহমদের আদর্শের অনুসারি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে এমপি হয়েছিলেন।[৬]

*** মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৫)**

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা, মহান সংগঠক, জাতীয় মুক্তির পথ প্রদর্শক, ধর্মীয় কণ্ঠস্বর। ১৮৯৩ সালে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন। ১৮৯৭ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পীর সৈয়দ নাসির উদ্দিন বোগদাদীর সাথে আসাম পৌঁছেন। ঐখানেই তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ১৯০৮ সালে তিনি আসামের কুখ্যাত 'লাইন প্রথার' বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। হজব্রত পালন করার পর তিনি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে দশ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ি জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসানচরে কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। তখন তার অনলবর্ষী ভাষণের জন্য ভাসানী নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে আসামের আন্দোলনের কারণে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে কারারুদ্ধ হন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি মজলুম মানুষের সাথে সহমর্মিতার কারণে কারাবরণ করেছেন। ১৯৫৭

[৬] বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

সালে কাগমারিতে ঐতিহাসিক সম্মেলন করেন এবং এই সম্মেলনে তিনি স্বাধীনতার কথা প্রচ্ছন্নভাবে উচ্চারণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'হক কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মওলানা ভাসানী কাগমারিতে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলীর নামে 'মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। আসামের ধুবড়ি শহরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবিতে প্রতিষ্ঠা করেন মহিপুর হাজি মহসীন সরকারি কলেজ। এই রাজনৈতিক ব্যক্তি ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর বুধবার দিবাগত রাত ৮ টায় মৃত্যুবরণ করেন।[৭]

*** আবদুল হামিদ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৬৮)**

জমিদার, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী আইন পরিষদের স্পিকার ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভারত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশ আমলে তিনি বাংলা প্রদেশ থেকে নিখিল ভারত শ্রম উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়াও প্রজাবৎসল জমিদার হিসেবে এলাকার তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি ১৯৫৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

*** ড. আলীম আল রাজী (১৯২৫-১৯৮৫ খ্রি.)**

টাংগাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলা লাউহাটি গ্রামে ড. আলীম আল রাজীব জন্ম। আলীম আল রাজী আইনজীবি, সুপণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ইতিহাস ও আইন শাস্ত্রে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আলীম আল রাজী 'বার এ্যাট-ল' ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৩ সালে ঢাকা হাইকোর্ট আইন ব্যবসা শুরু করেন।

---

[৭] খান, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সৌরভে-গৌরবে টাংগাইল, পৃ. ১৬৪।

১৯৫৭ সালে দেশে প্রথম আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তৎকালীন লিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) কলেজ শিক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। আলীম আল রাজী সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মেম্বার ছিলেন। তিনি ঢাকা 'ল' কলেজ ও নগরপুর ডিগ্রি কলেজ এবং লাউহাটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান করেন। আরাকানের পথে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইত্যাদি।[৮]

*** আব্দুল করীম গজনবী (১৮৭২-১৯৩৯)**

দেলদুয়ারের খ্যাতিমান জমিদার। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা আফগানিস্থানের গজনী থেকে এসেছিলেন বলে জানা যায় এবং এ কারণে তারা গজনীর ও পরবর্তীতে গজনবী নামে পরিচিত হন। তিনি রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও লেখক ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালিতে। আবদুল করিম গজনবী ছিলেন সরকারিপন্থী রাজনীতিক। আবদুল করিম গজনবী ব্রিটিশ আমলে জাতীয় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রি ছিলেন, ১৯২৪ সালে বাংলা সরকারের কৃষি, বন ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রি হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধি পান। তিনি খেতাবেও ভূষিত হন। আবদুল করিম গজনবী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।[৯]

*** আবদুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩)**

আবদুল হালিম গজনবী ছিলেন আবদুল করিম গজনবীর ছোট ভাই। তিনি একজন হিতৈষী জমিদার এবং রাজনীতিকবিদ ছিলেন। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসহ কলিকাতা সিটি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন।

---

[৮] বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৬৮।

[৯] শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে টাংগাইল, জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

আবদুল হালিম গজনবী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না বলে রাজনৈতিভাবে দুই ভাই দুই মেরুতে অবস্থান করেছেন। তাই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর ফুলার আবদুল করিম গজনবীকে "রাইট গজনবী" এবং আবদুল হালিম গজনবীকে "রং গজনবী" বলে আখ্যায়িত করেন। ব্রিটিশ আমলে ১৯২৬ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি 'স্যার' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।[১০]

*** ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)**

ড. আশরাফ সিদ্দিকী ১৯২৭ সালে টাংগাইলের কালিহাতি উপজেলার নাগবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক বিজ্ঞানী। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে ফোকলোরের আধুনিক পঠন-পাঠন ও গবেষণার ধারার তিনি সূচনা করেন। কর্মজীবনে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা, বাংলা উন্নয়নের পরিচালক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেস ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আশরাফ সিদ্দিকী বহু গ্রন্থের রচয়িতা। লোকসাহিত্য তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১১]

*** আবদুস সাত্তার (১৯২৮-)**

আবদুস সাত্তার ১৯২৮ সালে কালিহাতি উপজেলার গোলরায় জন্মগ্রহণ করেন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সম্পাদক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার দক্ষ। তিনি বহুদেশে ভ্রমণ করেছেন। প্রায় একশত গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বিশেষ করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক

---

[১০] www.Tangail.com

[১১] বাংাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, পৃ. ৩৭।

বইগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন: আরন্য সংস্কৃতি, ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি।[১২]

*** আবদুল মান্নান (১৯২৯-২০০৫)**

আবদুল মান্নান দেশের নন্দিত রাজনীতিবিদ। স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ যাদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান রয়েছে আবদুল মান্নান তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৯২৯ সালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার যমুনা ও ধলেশ্বরী বিধৌত চরাঞ্চলের কাতুলী ইউনিয়নের গালুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে টাংগাইলের মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং পরবর্তীতে টাংগাইলের জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে আব্দুল মান্নান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু এবং কারারুদ্ধ কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভের পর আনুষ্ঠানিক পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আহত গোল টেবিল বৈঠকের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে টাংগাইল থেকে বিপুল ভোটে এম এন এ নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি এবং পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেন। জননেতা আবদুল মান্নান মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল প্রবাসী সরকারের মন্ত্রি পরিষদের বৈঠকে আবদুল মান্নানকে মন্ত্রির পদমর্যাদায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সফলভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

পরিচালনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের একমাত্র মুখপাত্র জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে পুনরায় টাংগাইল সদর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৬ সালে তৃতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং একাধিকবার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা, তা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক সর্বোপরি দেশবাসীর কখনও ভোলার নয়।

তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত সাহসী ও নিয়ামক ভূমিকা পালন করতেন। রাজনৈতিক কলাকৌশল নির্ধারনে ও সংলাপে তার বিচক্ষণতা ছিল ঈর্ষণীয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় যুগপৎ আন্দোলনের লিঁয়াজো কমিটি সভার সভাপতিত্ব করেছেন তিনি। ৯০-এ স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে এবং ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। তিনি বাংলাদেশ ইনকামট্যাক্স ল'ইয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। একজন আদর্শ শিক্ষানুরাগী হিসেবে জননেতা আবদুল মান্নান বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। টাংগাইলের সন্তোষে অবস্থিত মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অপরিসীম। নারী শিক্ষার প্রতি জননেতা আবদুল মান্নানের ছিল বিশেষ আগ্রহ। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি টাংগাইলের প্রাণকেন্দ্র শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয় ও টাংগাইলের দেলদুয়ার উপজেলার আতিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এছাড়া সিলিমপুরে পাকুল্লা হাই স্কুল চরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠা করেন। কাতুলী হাই স্কুল। স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন টাঙ্গাইল জেনারেলর হাসপাতাল। মির্জাপুরের মহেড়া জমিদার বাড়িতে হাসপাতাল। মির্জাপুরের বাংলাদেশের দ্বিতীয়

বৃহত্তম পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলেন টাংগাইল মাহফিল, যা বর্তমানে টাংগাইল জেলা সমিতি ঢাকা নামে পরিচিত। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০০৫ সালে ৪ঠা এপ্রিল ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৩]

*** ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯০১-১৯৯১)**

টাংগাইল জেলার মির্জাপুর থানার বানিযারা গ্রামে ১৯০১ সারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপঠিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগ নিয়ে ১৯২৪ সালে পাশ করেন। তিনি ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৮-৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি দেশ ও বিদেশের বহু পত্রিকায় বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বহু বই প্রকাশ করেন এর মধ্যে, Early Arabic odes. ঢাকা, কিতাব আল রুমুয, দামেস্ক, কিতাবুল মারিফাত হাদিস অন্যতম। ১৯৯১ সালে তিনি ওফাত লাভ করেন।[১৪]

*** মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ (১৮৮৭-১৯৭৬)**

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ ১৮৮৭ সালে দাইন্যা, সদর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথশ শ্রেণিতে প্রথম হন। পরে ঐ কলেজেরই সংস্কৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের সমস্ত শাখায় এবং বৌদ্ধধর্মে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার তাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেয়। ১৯৪৭ সারে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. ১৯৬৪ সালে 'পদ্মভূষণ' ১৯৬৫ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার সাহিত্য বিশারদ এবং

---

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।

[১৪] প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতী তাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন। তিনি দর্শন ও সাধনা বিষয়ে বহু বহু গ্রন্থের রচয়িতা।[১৫]

*** পি.সি সরকার (১৯১৩-১৯৭১)**

পি.সি সরকার ১৯১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি টাংগাইলের আশেকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম প্রতুল চন্দ্র সরকার। আমেরিকার, সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানসহ বিভিন্ন দেশে জাদু প্রদর্শন করে তিনি বিপুল সুনাম অর্জন করেন। পি.সি সরকার জাদু বিদ্যায় দুইবার নোবেল পুরস্কার বলে খ্যাত "দি ফিনিক্স অ্যাওয়ার্ড" লাভ করেন। পি.সি সরকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'জাদু সম্রাট' উপাধি লাভ করেন। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশে তিনি জাপানে গিয়ে জাদু প্রদর্শন করেন। আজাদ হিন্দু ফৌজকে সাহায্য করেন। পি.সি সরকার ১৯৫৭ সালে লন্ডনে বিবিসি টেলিভিশনে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে তরুণী দ্বিখণ্ডিত করার খেলাটি প্রদর্শন করেন। তাঁর খেলার মধ্যে শূন্যে ঝুলন্ত কংকাল, এক্স-রে চক্ষুর খেলা, জ্যান্ত হাতি অদৃশ্য করা, মটর গাড়ি অদৃশ্য করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার পি.সি সরকারকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৬]

*** আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৭)**

আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯২১ সালে ৩১ জানুয়ারি টাংগাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার নাগবাড়ি গ্রামের জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: আব্দুল হামিদ চৌধুরী মাতা: শামসুন নেছা চৌধুরী। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আইনজীবি, রাজনীতিবিদ, কূটনিতিক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাস করেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত

---

[১৫] পূর্বোক্ত, ঐ পৃ. ৪১।

[১৬] www.Tangail.com

হন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ইস্তফা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠন আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ও জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।[১৭]

*** শামসুল হক (১৯৯২৩-১৯৬৩ আনুমানিক)**

শামসুল হক করটিয়ার সা'দত কলেজে ছাত্র সংসদের প্রথম ভিপি। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবলীগ' এর নেতা ছিলেন। ১৯৪৯ সারে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে টাংগাইলের প্রাদেশিক উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী করটিয়ার জমিদার খুররাম খান পন্নীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শামসুল হক রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮]

*** রফিক আজাদ (১৯৪১-)**

কবি রফিক আজাদ ১৯৪১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি টাংগাইল জেলার ঘাটাইল থানার গুনী গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সলিম উদ্দিন খান ছিলেন একজন প্রকৃত সমাজসেবক এবং মা রাবেয়া খান ছিলেন আদর্শ গৃহিনী। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। প্রকৃতার্থে তারা ছিলেন তিন ভাই দুই বোন। ২২ ফেব্রুয়ারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র রফিক ভাষা শহিদের স্মরণের বাবা-মায়ের কঠিন শাসন অস্বীকার করে খালি পায়ে মিছিল করেন। ভাষার প্রতি এই ভালোবাসা পরবর্তী জীবনে তাকে তৈরি করেছিল একজন কবি হিসেবে, আদর্শ মানুষ হিসেবে।

---

[১৭] E barta, আবু সাইদ চৌধুরী

[১৮] টাংগাইল প্রতিদিন, স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

১৯৫৬ সালে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় একবার বাবার হাতে মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ির থেকে। উদ্দেশ্য, পি.সি. সরকারের কাছে ম্যাজিক শেখা। ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়িতে পাঠান। কৈশোর লাঠি খেলা শিখতেন নিকটাত্মীয় দেলু নামক একজনের কাছে। তিনি সম্পর্কে রফিক আজাদের দাদা। দেলু দাদা ছিলেন পাক্কা লাঠিয়াল। গ্রামে নানা কিংবদন্তীর প্রচলন ছিল তার নামে। সলিম উদ্দিনের চেয়ে তিনি বয়সে বড় হলেও গা-গতর দেখলে পালোয়ান বলেই মনে হতো। দেলু দাদা খুব আদর করতেন রফিক আজাদকে বাড়িতে শিক্ষা দিতেন লাঠি খেলা। এছাড়া গুনী গ্রামেই পাশেই মনিদহ গ্রাম। এখানকার ষাট শতাংশ অধিবাসী ছিল নিম্নশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতার, ধোপা, দর্জি, চাষা ইত্যাদি। এই সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই ছিল রফিক আজাদের শৈশব-কৈশোরের বন্ধু। সাধুটী মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করে ভর্তি হলেন কালিহাতি রামগতি শ্রীগোবিন্দ হাই ইংলিশ স্কুলের নবম শ্রেণিতে। বাড়ি থেকে প্রায় তিন-চার মাইল দূরত্বে স্কুল। কালিহাতি সংলগ্ন গ্রাম হামিদপুরে এক দরিদ্র গেরস্থের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে তিনি পড়াশোনো করেন। হামিদপুরে আগের মতো আর সেই বিধিনিষেধ নেই। কালিহাতি হাই স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সতীর্থ মাঈন উদ্দিন আহমদের সাথে। সে ছিল ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবং অত্যন্ত মেধাবী। সাহিত্য পাঠে আগ্রহ ছিল তার। এই মাঈনই ছিল রফিক আজাদের আড্ডার প্রথম শুরু। হামিদপুরে তার সঙ্গে শুরু হয় তুখোর আড্ডা। তার মুখেই প্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনেন। দিবা-রাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি উপন্যাসের উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হন। মাঈন একদিন সন্ধ্যাবেলা ফটিকজানি নদীর তীরে ঘেঁষে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে বরিন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি পুরো আবৃতি করে শুনিয়েছিলেন তাকে। সেই কবিতা শুনে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন কিশোর রফিক আজাদ। অবাধ স্বাধীনতা, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় পড়ে নবম শ্রেণিতে ভালোভাবে পাশ করতে পারলেন না। আড্ডা প্রিয়

রফিক আজাদ। মাঈনও প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে চলে আসে। আড্ডার অন্য বন্ধুদের অনেকেই একাধিক বিষয়ে ফেল করে বসল। অবশেষে ব্রাহ্মনশাসন হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরিক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন।

তিনি বাংলা একাডেমির মাসিক সাহিত্য পত্রিকা উত্তরাধিকার এর সম্পাদক ছিলেন। রোববার পত্রিকাতেও রফিক আজাদ নিজের নাম উহ্য রেখে সম্পাদনার কাজ করেছেন। তিনি টাংগাইলের মওলানা মুহাম্মদ আলীর কাজের বাংলা প্রভাষক ছিলেন। রফিক আজাদের প্রেমের কবিতার মধ্যে নারীপ্রেমের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে রফিক আজাদ ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। [১৯]

*** মামুনুর রশীদ (১৯৪৭-)**

মামুনুর রশীদ ১৯৪৭ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি টাংগাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার পাইকড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মঞ্চ আন্দোলনের পথিকৃত। তার নাট্যকর্মে প্রখর সমাজ সচেতনতা লক্ষণীয়। শ্রেণিসংগ্রাম তার নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। তিনি টিভির জন্যও অসংখ্য নাটক লিখেছেন এবং অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে, শ্রেণিসংগ্রাম, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার আদায়ের নানা আন্দোলন নিয়ে নাটক রচনা ও নাট্য পরিবেশনা বাংলাদেশের নাট্য জগতে মামুনুর রশীদকে একটা আলাদা স্থান করে দিয়েছে। মামুনুর রশীদ এর জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারি। লিপইয়ার হওয়ার দিনটি ৪ বচর পর পর আসে।

১৯৬৭ সালে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে টেলিভিশনের জন্য নাটক লিখতে শুরু করেন যার বিষয়বস্তু ছিল মূলত পারিবারিক। সে সময়ে কমেডি নাটকও তিনি লিখতেন। নাট্যশিল্পের প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসা শুরু হয় টাংগাইলে তার নিজ গ্রামে যাত্রা ও লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের সূত্র ধরে। তার যাত্রার অভিনয়

---

[১৯] বারো মনীষী, টিনিউজ।

অভিজ্ঞতা তার নাট্যভাবনাকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং জড়িত হন স্বাধীনতার বাংলাা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে। সেই সময়টাও তার নাট্যচর্চার প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৭২ সালে কলকাতা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ ফিরে তিনি তৈরি করে তার আরন্যক নাট্যদল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম হলো– ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, ইবলিশ, এখানে নোঙ্গর, গিনিপিগ, জয় জয়ন্তী, সংক্রান্তি, রাড়াঙ্গ সুন্দরী, এখানের নোঙ্গর, ইতি আমার বোন, অর্পন, পুত্রদায়, অলসপুর ইত্যাদি। নাট্যজন মামুনুর রশীদ বাংলা একাডেমি, একুশে পদক, আলাউল সাহিত্য পুরস্কার ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি সত্যেন সেন সম্মাননা পদকে ভূষিত হয়েছেন এবং পশ্চিম বাংলায়ও বেশ কয়েকটি পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে।

*** আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (১৯৪৭-বর্তমান)**

টাংগাইলের গর্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। তিনি ১৯৪৭ সালে সখিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সফিউদ্দিন সিদ্দিকী। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর ঝাপিয়ে পড়লে তিনিই প্রথম ব্যক্তি পর্যায় থেকে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার দুঃসাহস দেখান। ১৬০০০-১৭০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করেন। তবে তিনি প্রায় ৫০,০০০ সৈন্যকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দান করেন। তার যুদ্ধ কৌশল ছিল সম্মুখ ও গেরিলা পদ্ধতির। পাক বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি প্রচুর অস্ত্র হস্তগত করেন। যা যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যমুনা নদীতে অস্ত্র বোঝাই পাক বাহিনীর জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। সখিপুরের যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁর গঠিত কাদেরিয়া বাহিনীর অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ফলে ১১ ডিসেম্বর টাংগাইল শত্রুমুক্ত হয়। এরপর তিনি ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে যান এবং ঢাকায় পাক-বাহিনীকে অনেকটা ঘেরাও করে ফেলেন। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর যে আত্মসমর্পনের মাহেন্দ্রক্ষণ ঐ সময় তিনি

Dhaka University Institutional Repository

রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। অসামান্য বীরত্বের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক একমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি হিসেবে 'বীর উত্তম' উপাধি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। পরবর্তীতে 'কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে এম পি নির্বাচিত হন একাধিক বার। বর্তমানেও তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়। স্বপ্ন দেখেন ক্ষুধা মুক্ত স্বাধীন সোনার বাংলার।[২০]

*** শাহজাহান সিরাজ (১৯৪৩-বর্তমান)**

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ছাত্রনেতা, শাহজাহান সিরাজ ১৯৪৩ সালে কালিহাতি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন তিনি। ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলন করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি মুক্তিবাহিনীর অন্যতম কমান্ডার ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। কয়েকবার এম পি সহ হয়েছিলেন মন্ত্রীও।[২১]

*** খন্দকার আবদুল বাতেন**

মানিকগঞ্জের কৃতি সন্তান, বীরমুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধের মহান সংগঠক। তিনি ৪০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা নিয়ে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন। তার বাহিনীকে তিনি ২১টি কোম্পানীতে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনা করে জয় ছিনিয়ে আনেন। তাই আমরা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। [২২]

*** প্রতিভা মুৎসুদ্দি (১৯৩৫-বর্তমান)**

তিনি একজন ভাষা সংগ্রামী ও শিক্ষাবদি শিক্ষা থেকে অবদানের জন্য তিনি ২০০২ সালে একুশে পদক লাভ করেন।[২৩]

---

[২০] ইসলাম, মুফাখখারুল, টাংগাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস, পৃ. ৫৭।

[২১] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৭.০৮.২০১৫।

[২২] Wikipedia (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[২৩] Banglanews.24.com

Dhaka University Institutional Repository

*** দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য**

তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের রিসার্চ ফেলো।

*** খন্দকার আসাদুজ্জামান**

মুজিবনগর সরকারের সচিব ছিলেন খন্দকার আসাদুজ্জামান।

*** অমৃতলাল সরকার (১৮৮৯-১৯৭১)**

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও বিপ্লবী অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন অমৃতলাল সরকার। তিনি মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার জন্মদাতা।[২৪]

*** সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী (১৯১০-৮১)**

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ছোট ছেলে সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি ধনবাড়ীর উন্নয়নের রূপকার।[২৫]

*** ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯০১-১৯৯১)**

টাংগাইল জেলার মির্জাপুর থানার বানিযারা গ্রামে ১৯০১ সারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগ নিয়ে ১৯২৪ সালে পাশ করেন। তিনি ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৮-৫৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি দেশ ও বিদেশের বহু পত্রিকায় বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বহু বই প্রকাশ করেন এর মধ্যে, Early Arabic odes. ঢাকা, কিতাব আল রুমুয,

[২৪] Banglanews.24.com, টাংগাইল জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ২০.১.২০১৯
[২৫] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

দামেস্ক, কিতাবুল মারিফাত হাদিস অন্যতম। ১৯৯১ সালে তিনি ওফাত লাভ করেন।[২৬]

*** দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৬)**

বাংলা ভাষার রূপকথার প্রখ্যাত রচয়িতা এবং সংগ্রাহক। তিনি ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করলেও তার পুরো জীবন কেটেছে টাংগাইলে। তিনি একজন রূপকথা বিজ্ঞানী। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহিত ও রচিত গ্রন্থগুলো হলো–

- ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭)
- ঠাকুর দাদার ঝুলি (১৯০৯)
- ঠান দিদির থলে (১৯০৯)
- দাদা মশাইয়ের থলে (১৯১৩)
- চারু ও হারু
- ফাস্ট বয়
- লাস্ট বয়
- বাংলার ব্রতকথা
- সবল চন্ডী
- কিশোরের মন প্রভৃতি।

তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৭]

---

[২৬] প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, জাতিয় তথ্য বাতায়ন।

[২৭] সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

*** দেওয়ান লোকমান ফকির**

তিনি বিখ্যাত গীতিকার, সুরকার, লোকগীতি গায়ক, বাউল। তিনি বহুগান লিখে সুরারোপ করে নিজের কণ্ঠে গেয়েছেন। মহান এই সাধক ভূঞাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[২৮]

*** রজনীকান্ত গুহ (১৮৬৭-১৯৪৫)**

রজনীকান্ত গুহ শিক্ষাবিদ, সুপণ্ডিত ও লেখক। তিনি ১৮৬৭ সালে তিনি ঘাটাইলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাশ করেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ অনুবাদ গ্রন্থ–

- সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস
- আন্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা
- মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ
- সক্রেটিস।

তিনি ১৯৪৫ সালে মারা যান।[২৯]

*** প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ [১৮৯৪-১৯৭৮]**

প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহিম খাঁ ১৮৯৪ সালে বিরামদি ভূয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি করটিয়ার সা'দত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। সে সময়ে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় তিনিই একমাত্র মুসলিম প্রিন্সিপাল। এজন্য তিনি 'প্রিন্সিপাল খাঁ' বলে খ্যাত ছিলেন। শিক্ষাবিস্তার সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবামূলক কাজে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। তাছাড়া তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তান গনপরিষদের সদস্য ছিলেন।

---

[২৮] উইকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত, www.Tangail.com)

[২৯] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ কলেজ ও মীরপুর বাংলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩) ও 'একুশে পদক' (১৯৭৭) লাভ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম– বাতায়ন, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, বঙ্গী জীবন, হিরক হার প্রভৃতি। ১৯৭৮ সালে তিনি মারা যায়।[৩০]

[৩০] E barta, (টাংগাইলের ইতিহাস, ২০.২.২০১৯)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

টাংগাইল জেলা বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল যখন পানিতে নিমজ্জিত ছিল ঠিক তখন যে কয়টি অঞ্চল মাথা উঁচু করে ভেসে ছিল বর্তমান টাংগাইল তাদের মধ্যে অন্যতম। অর্থাৎ এই অঞ্চলে মানব বসতি ও সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীনকালে টাংগাইলের মধুপুর রাজা ভবদত্তের রাজ্যের অংশ ছিল। চীনা পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাং' তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বঙ্গভূমিকে যে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন তার ২য় ভাগে পড়েছে বর্তমান টাংগাইল জেলা। ইতিহাসবিদদের তথ্যমতে এই জেলা পাল ও সেন রাজাদের দ্বারাও শাসিত হয়েছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলের সভ্যতার ইতিহাস যে প্রাচীন তার প্রমাণ আমরা এখান থেকেই পাই। শুধু যে প্রাচীন যুগে এই জেলা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই নয়। মধ্যযুগেও টাংগাইল ছিল উজ্জল।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলা বিজয়ের পর সমূদয় অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ফিরোজ শাহ ও ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ও এই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মুঘল শাসনের সময় টাংগাইল ছিল বার ভূঁইয়াদের দখলে। যদিও তাঁরা সেটা বেশি দিন ধরে রাখতে পারে নি। মধ্যযুগে টাংগাইল বহু শাসকের অধীনে শাসিত হয়েছে। এই অঞ্চলে এসেছেন বহু পরাক্রমশালী শাসক ও বীরযোদ্ধা।

মোঘল আমলের রাজস্ব কালেক্টর মির্জা হুসেনের নামে মির্জাপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ১৪০৯ সালে নবাব আলী বর্দি খানে দৌহিত্র মির্জা শওকত জং বাহাদুর নৌ-বিহারে পাটনা থেকে ঢাকায় আসেন। নদী-নালা, খাল-বিল ও সবুজের সামরোহে

Dhaka University Institutional Repository

মুগ্ধ হয়ে তিনি এখানে রাত্রি যাপন করেন। তাই বংশাই-লৌহজং বিধৌত এই অঞ্চলটির নাম হয় মির্জাপুর। মোঘল আমলে দরবেশের বেশ ধারনকারী জনৈক আফগান গোপাল শাহ নাম ধারন করে এই স্থানে এসে আস্তানা গাড়েন। তার নাম অনুসারে গোপালপুর উপজেলার নামকরণ করা হয়।

সুলতানি আমলের জমিদার ধনপতি সিংহ এর নামানুসারে টাংগাইলের ধনবাড়ী উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। আর দেলদুয়ার উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত সুফি-দরবেশের গানের শব্দ থেকে। এরকম ঘটনাই প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগেও টাংগাইল ছিল উজ্জ্বল।

আধুনিককালেও টাংগাইল কম গৌরবমন্ডিত নয়। বর্তমানে সোডিয়াম লাইটে উজ্জল আলোতে ঝাঁ চকচকে টাংগাইল জেলা। এই জেলা উত্তর ঢাকার অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ। যা দিনে দিনে শিল্প নগরীতে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, কি নেই এখানে? যমুনা বহুমুখি সেতু (বঙ্গবন্ধু সেতু) নির্মিত হওয়ায় উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের ঢাকা যাওয়ার দুয়ারে পরিণত হয়েছে এই জেলা। টাংগাইল বর্তমানে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক নগরী। টাংগাইল শহর মানুষের হাঁক-ডাকে সব সময় সরগরম। এই যেন অন্য এক দুনিয়া, নতুন এক জগৎ।

যমুনা, ধলেশ্বরী, ঝিনাই, লৌহজং, বংশী, বৈরান সহ অসংখ্য নদ-নদী, খাল বিল, বিধৌত এই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এখানকার মানুষের জীবন প্রণালী, বাসগৃহ, পোশাক, খাদ্য, জীবিকা ইত্যাদিকে প্রভাবান্বিত করেছে। এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই জনপদের মানুষের মন ও মননের উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি, জেলার ভূ-প্রকৃতিই এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিকে নির্মাণ করেছে, সমৃদ্ধ করেছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, আদি অস্ট্রলয়েড যা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভেড্ডিড, মঙ্গোলয়েড, অ্যালপাইন প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাঙ্গালি জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। টাংগাইলে

Dhaka University Institutional Repository

বাসরত জনগোষ্ঠীও এর ব্যতিক্রম নয়। পূর্বে মানুষ আদিম প্রকৃতির জীবন যাপন করতো। সকল স্থানে মানুষের বসবাস ছিল না। যোগাযোগ, পানির উৎস, বন, খাদ্য প্রাপ্যতা ও আবহাওয়া বিবেচনায় মানুষ বসবাসের স্থান নির্বাচন করতো। আগুনের ব্যবহার, চাকা আবিস্কার, কৃষি কাজ ও পশুপালন এই চারটি বিষয় মানব সভ্যতায় এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, পশুপালন ও কৃষিকাজ জানা একদল মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই বসতি স্থাপন করে। প্রাচীন টাংগাইলের বিভিন্ন নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। সেখান থেকেই উৎপত্তি গ্রামীণ সভ্যতার। এরপরই মূলত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর আগমন ঘটতে থাকে এই অঞ্চলে। টাংগাইলের উত্তরাঞ্চলে ভারত থেকে আগমন করে গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসরত গারো জনগোষ্ঠী যারা এখনো এ অঞ্চলে বসবাস করছে। আর এভাবেই সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমায় নানা আদিম জাতি, উপজাতি, বর্ণ, শ্রেণি ও বিচিত্র নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে এখানকার চিরায়ত সমাজ ব্যবস্থা।

টাংগাইলে মূলত প্রধান দুইটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বাস মুসলিম ও হিন্দু। জনসংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরপর আসে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম। আছে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও প্রকৃতির পুজারি গারো সম্প্রদায়। ধর্ম মানুষের জীবন প্রণালীকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করে। আর তাই এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন পদ্ধতিও বেঁধে দিয়ে তাদের পছন্দের ধর্ম। বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ না থাকায় এবং বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকায় নবজাতক ও প্রসূতির মৃত্যু হিন্দু সমাজের নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই এদের জনসংখ্যা মুসলিম সমাজের ন্যায় বৃদ্ধি পূর্বেও পায়নি এখনো পাচ্ছে না। ফলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের কিছু কিছু লোকাচার ও রীতি পৃথক। পোশাক একই শুধু ধর্মীয় পোশাকে পার্থক্য বিদ্যমান। সামান্য পার্থক্য খাদ্যাভাস ও বিবাহ রীতিতে। এই জেলার ৭৫% মানুষের জীবিকা হলো কৃষি। তাই অধিকাংশ মানুষ গ্রামেই বাস

Dhaka University Institutional Repository

করে। তবে সভ্যতা, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের নিরিখে এমন মানুষ শহরমুখি এবং মানুষের শহরমুখি স্রোত ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এছাড়া কৃষিকাজ ছেড়ে এখন মানুষ চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য পেশার দিকে ঝুঁকছেন। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে নগরকেন্দ্রিক জীবন।

মধ্যযুগের অবক্ষয়ের কালেও টাংগাইল জেলার দেশীয় সনাতন শিক্ষার একটি বিস্তৃতিধারা বিদ্যমান ছিল। তবে সময় উপযোগী ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে প্রাচীন ধারার টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা ক্রমাগতভাবে ক্ষীণতর হতে থাকে। অবশেষে ২০ শতকের অর্ধভাগেই তা বিলুপ্তির পথে চলে যায় এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। গবেষণাকারে জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্‌রাসা নারী ও বিশেষ শিক্ষার উন্নতি ঘটে। বর্তমানেও শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে উর্ধ্বমুখী। ঢাকার পার্শ্ববর্তী এই জেলা সকল শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে। শিক্ষার এই হার বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জেলায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার, মুদ্রণযন্ত্র, সভাসমিতি ও সংগঠন আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পূর্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ই বেশি এগিয়ে ছিল কারণ তখন উপার্জনের পরিবর্তে অর্থ খরচ করে শিক্ষা গ্রহণ করাটাকে অনেকে বিলাসিতা মনে করত। তাই অপেক্ষাকৃত ধনাঢ্য শ্রেণির সন্তানরাই শিক্ষা গ্রহণ করতো। তৎকালীন সময়ে অর্থসম্পদ ও জমিদারীতে হিন্দুরাই এগিয়ে ছিল। তাই এই সম্প্রদায়ই লেখাপড়ায় এগিয়ে ছিল। অপরদিকে মুসলমানরা ছিল রক্ষণশীল। কিছু গোঁড়া প্রকৃতির আলেমদের জন্য মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করতে অনাগ্রহী হয়। ফলে দীর্ঘ দিন মুসলমানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাগ্রহী ছিল। পরবর্তীতে হিন্দুদের দেখে মুসলমানরা শিক্ষায় কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে বেশি আগ্রহী হয় যখন তারা চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের দেখে, কিছুটা অনুপ্রেরণায় এবং জীবিকার তাগিদ থেকেই এই অঞ্চলে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ শুরু। তার পর থেকে আর এই সম্প্রদায়কে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। টপটপ করে এই সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা পার হতে থাকে একটার পর একটা শিক্ষার গন্ডি এবং অতি অল্প সময়েই এই হার হিন্দুদের ছাড়িয়ে যায়। গবেষণাকারে দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই শিক্ষায় উন্নতি ঘটেছে। ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনেক কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবি, ডাক্তার, শিক্ষক প্রমুখদের সৃষ্টি হয়। যারা নানাভাবে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জেলার অধিবাসীদের পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিতি হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং একই সাথে তাদের পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে অধিবাসীদের কর্মসংস্থানেরও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে জেলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতিতে এখানকার অধিবাসীগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং এর মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। সর্বোপরি, আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে মেলার অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টাংগাইল জেলার সাধারণ মানুষ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে পার্শ্ববর্তী জেলার আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার বেশ লক্ষ্যণীয়। তবে ভাষাতত্ত্ববিদদের

Dhaka University Institutional Repository

দাবি টাংগাইলের আঞ্চলিক ভাষা অনেকটা প্রমিত ভাষার কাছাকাছি এবং অন্যান্য ভাষার মত এতটা দুর্বোধ্য নয়।

গবেষণাকালে দেখা যায় যে, এখানকার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চিন্তা ও চেতনায় তৎকালীন মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কথাই অধিকতর ফুটে উঠেছে। কবি সাহিত্যিক তাদের লেখনিতে সামাজিক কুপ্রথাগুলোর বিরুদ্ধে লিখেছেন তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান সামাজিক ভেদ প্রসঙ্গ, নারীদের অশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির কথা এখানকার সাহিত্যকগণ বারংবার বলেছেন। গবেষণাকারে এখানকার সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। মাতৃভাষারুপে বাংলার মর্যাদার প্রশ্নে একমত ও অটল ছিলেন; জাতীয় জীবনে ও সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশে সার্বজনীন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

টাংগাইল মূলত গ্রামীণ জনপদ। অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি দিয়ে সকলের বাড়ি-ঘর নির্মিত। এক্ষেত্রে বাঁশ, ছন, চাটাই, মাটি পাঠ খড়ি, টিন দিয়ে কোথাও কোথাও ইট দিয়ে নির্মিত দো-চালা বা চারচালা বাড়ি-ঘর চোখে পড়ে। তবে উত্তর টাংগাইলের মধুপুর বনাঞ্চলের সকল বাড়িঘর মাটি দিয়ে তৈরি। সভ্যতার বিকাশে ও আর্থিক উন্নতির ফলে ইদানিং ইটের বাড়ি প্রায়ই চোখে পড়ে।

টাংগাইলের গ্রামগুলো যেন এক একটা আনন্দ পল্লী। সবগুলো বাড়িই একটার সাথে একটা লাগানো। যেন সকলে মিলেই একটা পরিবার। এখানে এখনো একান্নবতী পরিবার লক্ষ্য করা যায়। যেটা অন্য এলাকায় বা শহরে পাওয়া যায় না। সবুজ মাঠের ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তা আর রাস্তার দুই ধারে গড়ে উঠেছে বাড়ি ঘর। বাড়ির সামনে কৃষি কাজ করার জন্য ফাঁকা পরিস্কার জায়গা থাকে 'বাহির বাড়ি' বলা হয়

Dhaka University Institutional Repository

আর বাড়ির ভেতর গৃহস্থালী কাজ করার জন্য পাঁকা জায়গা যাকে 'উঠান' বলা হয়। সচরাচর রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষগুলো পাশাপাশি বাড়িতে অবস্থান করে।

গবেষণাকালে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত এ জেলার মানুষেরও প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। ভাত হিসেবে আমন ও বোরোর মোটা চালই বেশি প্রচলিত। চালের দাম বেশি হলে পূর্বে মানুষ গম, চিনা, কাউনের ভাত খেত। তবে এখন অবশ্য গম, চিনা, কাউনের চেয়ে চালের দামই কম। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় পরিবার নিয়ে তিন বেলা ভাত খেতে খুব সমস্যা হয় না কারো।

টাংগাইল জেলার মানুষ সাধারণত সকাল ও রাতে গরম ভাত খায়। এক্ষেত্রে সব চেয়ে ভাল রান্নাটা হয় রাতে। আর সকালের খাবারের অবশিষ্টাংশ খায় দুপুরে। এই খাবারকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় না। গরমের দিনে পান্তা ভাত আর শীতের দিনে ঠান্ডা ভাতই সাধারণত টাংগাইলের মানুষ খেয়ে থাকে।

সকালের রয়ে যাওয়া তরকারি, ভর্তা অথবা মরিচ-পেঁয়াজ ভর্তা করে দুপুরের খাবার সেরে নেয় সবাই। শহর এলাকায় বিভিন্ন পেশাজীবী বিশেষ করে হিন্দু পরিবার রুটি, পরোটা, লুচি, ভাজি, মিষ্টি, সবজি ও চা দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে থাকেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে মাংস খাওযার প্রচলন কিছুটা কম। এক্ষেত্রে গরুর মাংস আত্মীয়স্বজন আসলে এবং ঈদের মধ্যেই তারা বেশি খায়। তবে বাড়িতে হাঁস, মুরগী পালনের সুবিধার্থে হাঁস, মুরগীর মাংস অপেক্ষাকৃত একটু বেশি খেয়ে থাকে। অধিকাংশ পরিবারে গরুপালিত হয় তাই তারা গরুর দুধ সবসময় খেয়ে থাকে। ধনীদের সখের খাবার বা আতিথেয়তার খাদ্য তালিকাতে থাকে কোরমা, পোলাও, বিরিয়ানি, জর্দা, পরোটা, লুচি, হালুয়া, ফিরনি, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি। সারা বছর সাধারণ মানুষ সাধাসিধা খাবার খেলেও ঈদের মধ্যে ভাল খাবার খেয়ে থাকে। সেমাই, পায়েস, পোলাও, খিচুড়ি, মাংস প্রভৃতি খেয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সময়কালে দেখা যায় টাংগাইল জেলার মানুষ পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই লুঙ্গি পরিধান করে। পূর্বে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ধূতি পরিধান করতো তবে বর্তমানে তারা লুঙ্গি পড়তেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। অল্প বয়স্ক ছেলেরা বাহারি রং এর লুঙ্গি পড়লেও যারা একটু বয়স্ক তাদের পছন্দ সাদা লুঙ্গি। লুঙ্গি ছাড়াও বয়স্ক ব্যক্তিরা ফতুয়া, পাঞ্জাবি, টুপি এবং একটা গামছা কাধের উপর সব সময় রাখেন। ধর্মীয় উৎসবে পাঞ্জাবির সাথে পাজামা পরিধান করেন।

লুঙ্গি, গেঞ্জি আর গামছা সাধারণ মানুষের পোশাক। শীতকাল ছাড়া গরীব ও কর্মজীবি মানুষ অন্য কোন পোশাক পরিধান করে না। শীতকালে গেঞ্জি, শার্ট, সুয়েটার, চাদর, মাফলার পরিধান করে। বয়স্ক হিন্দুরা ধূতি পরিধান করে তবে বাকী পোশাক মুসলমানদের মতই। সকল সম্প্রদায়ের নারীরাই শাড়ি পরিধান করে। অর্থাৎ শাড়ি, ছায়া (পেটিকোট), ব্লাউজ পরিধান করে। হিন্দু নারীরা সিঁদুর দেয়। বাইরে বের হওয়ার সময় মুসলিম নারীরা বোরখা ও চাদর পরিধান করে যা হিন্দুরা পড়ে না। পূর্বে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে স্যান্ডেল বা জুতা পড়ায় প্রচলন তেমন ছিল না। তবে বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও আর্থিক সংগতির কারণে সকলেই স্যান্ডেল বা জুতা পড়ে থাকে। বর্তমানে গ্রামের মানুষও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে পূর্বের চেয়ে অনেক সচেতন এবং এসেছে নানা রকম বৈচিত্র।

গবেষণাকালে এ অঞ্চলে নানা সামাজিক উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঈদ। মুসলিম সম্প্রদায় তথা পুরো টাংগাইলের সবচেয়ে আনন্দঘন উৎসব হলো ঈদ। ঈদ দুইটি। ঈদ উল ফিতর বা রোজার ঈদ আর ঈদ উল আজহা বা কুরবানীর ঈদ। এই দুই দিন মুসলিম সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে। ঈদ উপলক্ষে বাড়ি-ঘর পরিপাটি করে। পুরাতন কাপড় পরিষ্কার করে। নতুন কাপড় ক্রয় করে এবং বছরের সবচেয়ে সেরা খাবারটা দুই ঈদের দিন মুসলমানরা খাওয়ার চেষ্টা করে। ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবগুলো হলো

Dhaka University Institutional Repository

শবে বরাত, মহরম, ঈদে মিলাদুন্নবী। শবে বরাত হলো ভাগ্য রজনী। এই দিন মুসলমান সম্প্রদায় নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী করেন। রাতে ভাল খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেন। দিনের বেলা কেউ কেউ রোজা রাখেন। এছাড়া অনেকটা ধর্মীয় মেজাজেই মহানবীর (স.) জন্ম ও মৃত্যু দিন অর্থাৎ 'ঈদে মেলাদুন্নবী' উদ্‌যাপন করেন। বেদনার আঙ্গীকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে পালিত হয় পবিত্র 'মুহররম'।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবগুলো অধিক জাঁকজমকপূর্ণ। 'দুর্গাপুজা' হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎস। প্রতি বছর আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পুজা ৬ দিন ব্যাপী উদ্‌যাপিত হয়। পুজা উপলক্ষে হিন্দু প্রধান গ্রাম ও মন্দির প্রাঙ্গনে বসে আনন্দ মেলা। পুজা ছাপিয়ে এ মেলা যেন সকল সম্প্রদায়ের। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য উৎসবগুলো হলো– লক্ষ্মীপুজা, কালিপুজা, কার্তিকপুজা, বাসন্তীপুজা, রথ যাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, রাস যাত্রা, পুষ্পদোল। এই উৎসবগুলোও ঝাঁকঝমকতার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। বসে মেলাও।

এছাড়া সব সম্প্রদায়ের জন্যও একক কতগুলো উৎসব আছে যেমন নববর্ষ, নবান্ন, পিঠা-পার্বন, নৌকা বাইচ ইত্যাদি।

পহেলা বৈশাখে নতুন বর্ষকে সাদরে বরণ করে নেওয়ার জন্য থাকে সব পর্যায়ের মানুষের নানামুখি আয়োজন। ঐ দিন দোকানিরা পুরোনো হিসাব দেখে বকেয়া আদায় করে নতুন খাতায় নতুনভাবে হিসাব চালু করে এবং সাধ্যমত মিষ্টিমুখ করায়। এই বিশেষ উৎসবটি হালখাতা নামে পরিচিত। এছাড়া নতুন ফসল উঠাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে বাড়িতে হয় ভাল খাবারের আয়োজন থাকে নবান্ন উৎসব বলে অভিহিত করা হয়। মৌসুমের নির্দিষ্ট সময় নৌকাবাইচ, ঘোড়া দৌড়ের মাধ্যমেও গ্রামীণ জনপদের মানুষ আনন্দ লাভ করার চেষ্টা করে।

গবেষণাকালে এখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল সমৃদ্ধ। এখানে নাগরিকমণ্ডলে আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা যেমন হয়েছে ঠিক তেমনি বিপুল

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা আর হাসিকান্নার মূর্ত প্রতীক হয়ে বিস্তৃত ছিল বাউল গান, জারি গান, ধুয়া গান, মেয়েলি গীত, কাওয়ালী, নাচারি, ভাটিয়ালী, বিরহগীত, পালা গান, কবিগান প্রভৃতি লোক সঙ্গীত। এ অঞ্চলের জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও সমাজ সচেতনতা হিসেবে নাটক ও যাত্রার প্রসার ঘটেছিল। এখানকার প্রচলিত ছড়া, ধারা প্রবাদগুলোর মধ্য দিয়ে এ জনপদবাসীর সামজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানা বিষয়ের প্রতিফলন ছিল লক্ষণীয়। ঐতিহ্যবাহী জনপদ হিসেবে লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও টাংগাইল ছিল সমৃদ্ধ।

গবেষণাকালে লক্ষ্য করা যায় টাংগাইল হলো সংবাদপত্র প্রকাশের দিক হতে উত্তর ঢাকার শীর্ষ নগরী। একে 'সচেতন সংবাদ পাঠকদের নগরীও' বলা যায়। মজলুমের কণ্ঠস্বর, বংশী, মফস্বল, দেশকথা, লোককথা, আজকের টেলিগ্রাম, প্রগতির আলো, নাগরিক কথা প্রভৃতি হলো বিখ্যাত সংবাদপত্র। আছে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক সংবাদপত্র ও প্রকাশনা।

টাংগাইলের রয়েছে নানান লোক প্রযুক্তি যার সাহায্যে গ্রামীণ সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এই প্রযুক্তি মানুষের নিজের উদ্ভাবিত। কৃষি সম্পর্কিত ও গৃহস্থালীর কাজে এই প্রযুক্তি বেশি ব্যবহৃত হয়। লোক প্রযুক্তি যেন গ্রামীণ জীবনেরই অংশ।

যমুনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই জেলায় পানির প্রাপ্যতা বেশি হওয়ায় টাংগাইল প্রাচীন কাল হতেই রত্নগর্ভা অর্থাৎ শস্যপ্রদায়ী। কি হয় না এ জেলায়। দু হাত ভরে শস্য প্রদান করে সর্বদাই কৃষকের মুখে হাসি ফোটায় এ মাটি। মাটির প্রতি কৃষকেরও যত্ন ও মমতার কমতি নেই। ঠিক যেন নিজের সন্তান। ধান, গম, সরিষা, কলা, আনারস, আদা, হলুদ, কচু, কাঁঠাল, আখ, আলুসহ প্রায় সকল শস্যই হয় টাংগাইলের মাটিতে। যা এর কৃষি অর্থনীতিতে দিয়েছে প্রাণ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আমার গবেষণাকালে এ ঐহিত্যবাহী জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে বলা যায় হাজার বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে উঠা এ জেলা আজকে সত্যিকার অর্থেই সমৃদ্ধশালী। বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ। বর্তমান গবেষকের দ্বারা "টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি"র যে গবেষণার সূত্রপাত হলো গবেষক আশাবাদ ব্যক্ত করছেন ভবিষ্যতে দেশ-বিদেশের আরো অনেক গবেষক এর উপর গবেষণা করবেন এতে করে টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আরো অনেক তথ্য ও উপাত্ত আমাদের সামনে দৃশ্যমান হবে। যার ফলে "টাংগাইল জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি" আরো উজ্জল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ

১. অজিত কুমার ঘোষ, ড. *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস*, কলিকাতা : লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২

২. আইয়োব, আলী আহমেদ খান, *গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী*, শোভা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

৩. আবদুর রহীম, খন্দকার, টাংগাইলের ইতিহাস (তৃতীয় বর্ধিত প্রকাশ)

৪. আবদুল করিম মিয়া, ড. মোঃ *টাংগাইল অঞ্চলের বাউল গান : স্বরূপ ও দর্শন*, বাংলা একাডেমি-২০০৯

৫. আবদুর রহিম, ড. মুহাম্মদ ও *অন্যান্য*, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬

৬. আবদুস সাত্তার, ড. *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

৭. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০০

৮. আবদুস সাত্তার, অনুবাদ : মোস্তফা হারুন, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০

৯. আলম, জাফর, *স্মরণীয়-বরণীয়*, আহমেদ পাবলিশিং, ঢাকা-২০০৩

১০. আহমেদ, তোফায়েল, আটিয়ার চাঁদ, টাংগাইল, ১৯৯১

১১. আশরাফ, খোন্দকার আলী, *সংবাদ সম্পাদনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

১২. আব্দুলাহ আল-মাসুম, মোঃ, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮

১৩. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* ঢাকা : বর্নায়ন, ২০০২

১৪. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ২০০৭

১৫. আহমদ, মইন উদ্দিন, *বাসাইল নামের উপজেলা*, বটমূল, ঢাকা-২০০৬

১৬. আব্দুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষায় বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

১৭. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বর্নায়ন, ২০০২

১৮. আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩

১৯. *ঊনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ – সাময়িক পত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

২০. কামাল, মাহমুদ, *টাংগাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

২১. খান, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, *সৌরভে, গৌরবে টাংগাইল*, ছায়ানীড় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

২২. খান মাহবুব, মাহমুদ কামাল, আলম তালুকদার সম্পাদিত, *টাংগাইল জেলার স্থান, নাম, বিচিত্রা*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা ২০০৮

২৩. খান মাহবুব, *টাংগাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৯

২৪. তরফদার মামুন, *লোকসাহিত্যে টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

২৫. তরফদার, মামুন, *লোক সাহিত্যে টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, গতিধারা প্রকাশীন, বাংলাবাজার, ঢাকা-২০০৯

২৬. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭

২৭. দে, তপন কুমার, *মুক্তিযুদ্ধে টাংগাইল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

২৮. নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব গাজী, *টাংগাইলের হাজার বছরের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা-২০১১

২৯. নুরুজ্জামান মোহাম্মদ, *'বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য'* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৭

৩০. বাকের মুহাম্মদ (সম্পা) *টাংগাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ১৯৯৭

৩১. বেগম, ড. আয়েশা, *টাংগাইলের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, ২০০০

৩২. *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭

৩৩. *বাংলার ইতিহাস : ১২০০-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ*, ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯

৩৪. মুসা আনসারী, *ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২

৩৫. *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

৩৬. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

৩৭. যাকারিয়া, আ, ক, ম, *টাংগাইল জেলার পুরাকীর্তি*, টাংগাইল, ১৯৯৭

৩৮. যমুনাথ সরকার, *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলিকাতা : এন. সি পাবলিকেশন, ১৯৮৫

৩৯. রহিম, খন্দকার আবদুল; *টাংগাইলের ইতিহাস*, যমুনা প্রকাশনী, টাংগাইল, ১৯৭৭

৪০. রহমান, মোঃ লুৎফর, *টাংগাইল জেলার লেখক অভিধান*, টাংগাইল, ২০০২

৪১. লুৎফর রহমান, মোঃ, *ঘাটাইলের গুণীজন*, ছায়ানীড় প্রকাশনী, টাংগাইল, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

৪২. শামসুজ্জামান খান (সম্পা) *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬

৪৩. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি,* টাংগাইল জেলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০১৪

৪৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড,* ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩

৪৫. সেলিম, ইসমাইল হোসেন, *শতবর্ষের শতকথা*, টাংগাইল পৌরসভা, ২০০২

৪৬. সিদ্দিকী, কাদের, *স্বাধীনতা '৭১*, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

৪৭. হক, মোঃ আয়নাল, উপজাতিদের ইতিহাস ও জীবনধারা, কৌশিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

৪৮. হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

৪৯. হায়দার জুলফিকার, *ঘাটাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* জলসা প্রকাশনী, ভূঞাপুর, টাংগাইল-২০০২

৫০. হায়দার, জুলফিকার, *টাংগাইলের রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ,* এ্যাডর্ন, ঢাকা, ২০০৮

২. অভিসন্দর্ভ

(ক) এম ফিল অভিসন্দর্ভ

১. আতিকুর রহমান, মোঃ, *বাংলাদেশে তৃনমূল সাংবাদিকতার উদ্ভব ও বিকাশ,* অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮

২. মনিরুজ্জামান, *সাংস্কৃতিক জনপদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহের ভৌগোলিক সমীক্ষা,* অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

৩. মুহাম্মদ মাছুদুর রহমান, 'বগুড়া জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৪৭-২০০০), এম ফিল থিসিস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭

(খ) পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ

১. কামরুল আহসান, মোহাম্মদ, '*বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলেম সমাজের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯৫)* অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢা.বি, ২০০৮

২. রুহুল আমীন, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)* অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢা. বি, ১৯৯৬

৩. শামসুন নাহার, *বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে সংবাদ সাময়িক পত্রের ভূমিকা (১৯০৬-১৯৪৭)*, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

৩. গেজেটিয়ার, রিপোর্ট ও প্রবন্ধ

১. আল বেরুনি, মোঃ সোহেল, *নওয়াব আলী : শিক্ষা ও সমাজ সেবা*, ২০০২

২. ইউসুফ, সাজেদা, ধনবাড়ীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৪০৫ বাং

৩. ইসলাম মুফাখখারুল, টাংগাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১১ বর্ষ, ১৯৯৭

৪. খান, নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার টাংগাইল, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯০

৫. বাকের, মোহাম্মদ, টাংগাইলের রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাস, ১৯৯৭

৬. বাহার, মোঃ হবিবুল্লাহ : *মুক্তিযুদ্ধে টাংগাইল জেলা*, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৮৯

৮. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, টাংগাইল, ১৯৯০

৯. মোমেন, সরকার নুরুল, টাংগাইলের উপজাতি গারো সম্প্রদায়, ১৯৯৭

৪. জরিপ (বাংলা)

১. উন্নয়ন পরিকল্পনায় টাংগাইল জেলা, জেলা পরিষদ, ১৯৭০-৭১

২. উন্নয়ন পকিল্পনায় টাংগাইল জেলা, জেলা পরিষদ, ১৯৭৫-৭৬

৫. পত্র পত্রিকা-সাময়িকী

১. আখবারে ইসলামিয়া, টাংগাইল, ১৮৯২

২. ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারি ১৯৬৯, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫

৩. ইত্তেফাক, ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯, ২১ মে ১৯৮১, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

৪. পূর্বাকাশ, ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮

৫. প্রথম আলো, ১ মে ১৯৯৮, ১ আগস্ট, ২০১৭

৬. ফাল্গুনী, ২০০২, ২০০৪, ২০০৭

৭. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৭ মে ১৯৯৭, ৫ আগস্ট ২০১৭

৮. টাংগাইল প্রতিদিন, ৫ ডিসেম্বর ২০১৩, ৬ মে ২০১৫

৯. সংগ্রাম, ১৫ মে ১৯৬৯, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৪

১০. হিতকরী, টাংগাইল , ২১ মে ১৯৭২

৬. আদমশুমারী

* আদমশুমারী ২০০১

* আদমশুমারী ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

৭. ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম

১. ইউকিপিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত)

২. ই বার্তা কম

৩. জাতীয় তথ্য বাতায়ন

৪. টাংগাইল প্রতিদিন

৫. টি নিউজ বিডি

৬. বাংলা পিডিয়া (অন লাইন সংস্করণ থেকে তথ্য গৃহীত)

৮. English Books

১. Abdul Karim, *History of Bengal, Mughal Period, vol. i* ও *ii,* Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1995

২. Adams William, C, *History of the Rivers in the Gangetic Delta 1750-1918,* Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1919

৩. Akanda, S.A (ed), *Students in Modern Bengal, Institute of Bangladesh Studies,* Rajshahi University, 1981

৪. Amin, Sonia Nishat, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal 1876-1939,* New York : E.J. Brill, 1996.

৫. Islam, M.M, *Bengal Agriculture, 1920-1986,* Cambridge : Cambridge University press, 1978

৬. Jafar, S.M, *Education in Muslim India 1000-1800 A.D,* Delhi : Idarahi Adabiyat, 1973

Dhaka University Institutional Repository

৭. Majumder, R.C, *History of the Modern Bengal, Part-I,* Kolkata, G, Bharadwang and Co., 1978

৮. Sarker, Jadu Math, *The History of Bengal,* vol. II, Dhaka; 1972

৯. Sirajul Islam, *Rural History of Bangladesh : A Source Study*, Dhaka : Titu Islam, 1977

৯. Gazetteer

* Latif, M.A., *Bangladesh District Gazetteer,* Tangail, 1983.

১০. Survey

১. *Census of Agriculture,* Tangail, 2008

২. *District Census Report,* Tangail, 1971

৩. *District Census Report*, Tangail, 1974

৪. *Final RS Report* 1984

৫. *Statistical Digest of Bangladesh,* 1979

১১. Encyclopedia

১. *Dictionary of Education,* Edited, New York : McGraw Hill Book Company, Inc. 1959

২. *Encyclopedia of Britanica,* vol. viv

৩. *Encyclopedia of Social Science,* vol. ix-x, New York : The Macmillan Col., 1959 A.D

৪. *Encyclopedia of Religion and Ethics,* vol. v, edited, New York: T and T Clark, 1981

Dhaka University Institutional Repository

৫. *Government of Bengal, Report on the Publish Instruction of Bengal 1904-1905,* Kolkata: Bengal Secretariat Press, 1905, (here after report on education)

৬. Khan Tahawar Ali (ed.), Biographical encyclopedia of Pakistan, Lahore : Institute of Historical Research, 1965-66

৭. The New Oxford Encyclopedia Dictionary, Oxford : Oxford University Press, 1983, S.D.

১২. Website-

www.bdnew.24.com

www.edu.gov.com

www.E barta

www.facebook.com

www.Goggle.com

www.Tangail.com

www.Tangail.gov.com

www.Tangail protidin

www.Tnews.com

Dhaka University Institutional Repository